জীবন ও মানুষ
ব্যাংক ও ব্যাংকিং
রবিউল হোসেন
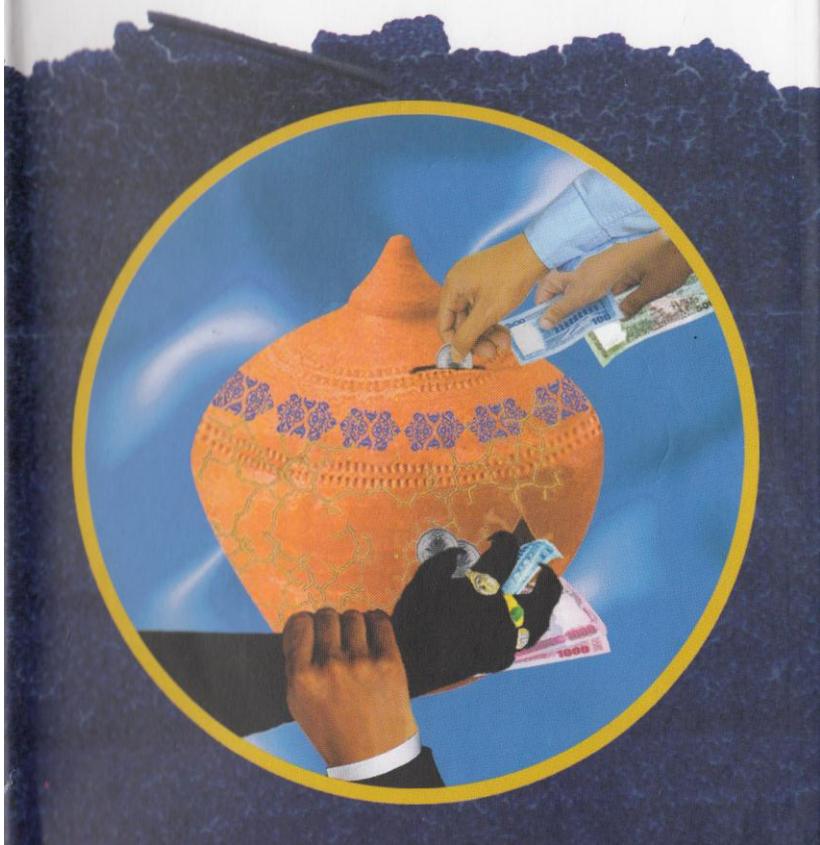
প্রাত্যহিক চলা-বলার নিয়মাচার উন্নত বিশ্বে শেখানো হয় প্রাথমিক বিদ্যাপীঠ থেকে- যা আমরা শিখি বিচ্ছিন্নভাবে। তাই যারা এসব নিয়ম-কানুন জানেন তাদের পর্যালোচনার জন্য এবং যাদের জানায় ঘাটতি রয়েছে তাদের চাহিদা মেটাতে এই বই।

জীবন ও মানুষ
ব্যাংক ও ব্যাংকিং

(পরিবার এবং অফিস পরিচালনা সহায়ক)

An aid to Family &
Office Management

রবিউল হোসেন

সাবেক এমডি, সোনালী ব্যাংক
এবং
সাবেক কনসালট্যান্ট, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ

আগামী প্রকাশনী

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল

স্বত্ব রবিউল হোসেন

স্টেক হোল্ডার মার্কেন্টাইল ব্যাংক ফাউন্ডেশন

মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য: ৪০০.০০ টাকা

Jibon O Manush : Bank O Banking :: An Aid to Family
& Office Management : by Rabiul Hussain,
Former MD Sonali Bank. E-mail: rabiulhussain45@gmail.com
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
E-mail: info@agameeprakashani-bd.com

First Printing : February 2013

Price: Tk. 400.00 / US $ 15 only

ISBN 978 984 04 1516 8

ই- বুক সংক্রান্ত তথ্য

মূল বইটিকে পিডিএফ ই- বুকে রুপান্তরে সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
মোঃ ময়েজুল ইসলাম, অনুষদ সদস্য, জনতা ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
E-mail: moezul@gmail.com

All headings of this PDF E-Book is converted to Unicode Bangla
for easy browse & navigation through corresponding pages.
This E-Book is best viewed in E-Book Readers Apps like
ezPDF Reader, Mantano Reader Premium, Radaee PDF Reader, etc.

Can be viewed in PC using Adobe Acrobat Reader 9.0 or above.

উৎসর্গ

'কুয়াশার ভালোবাসায় যেমন শিশিরের জনম,
সূর্যের ভালোবাসায় যেমন শিশিরের মরণ
তেমনি মায়ের ভালোবাসায় আমার জনম,
হোক না কাজের ভালোবাসায় আমার মরণ।'

তাই, আমার স্বর্গীয় মায়ের আজীবন ত্যাগের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র সৃষ্টি তাঁর নামেই উৎসর্গ করলাম।

জীবন ও মানুষ : ব্যাংক ও ব্যাংকিং

প্রাক- কথন

বই লিখতে অনেক মেধা, দক্ষতা, শ্রম ও ধৈর্য লাগে। এসব আমার কখনই ছিল বলে মনে হয় না। আবার নিজের খরচে বই ছাপিয়ে সেই বই ঘুরে ঘুরে বিক্রি করার (Push Sale) বাড়তি বিড়ম্বনা আমার বই লেখার অনীহাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। অপরদিকে, বইয়ের মূল্য পাওয়া নিয়ে লেখকের সঙ্গে প্রকাশকদের টানাপড়েন (শোনা কথা, সত্য নাও হতে পারে) এবং সর্বোপরি ইন্টারনেট এবং বিবিধ কারণে বই বা Hard Copy পড়ার প্রতি শোচনীয় জাতীয় অনাগ্রহ আমার বই লেখার উদ্যমকে আরও দমিয়ে দিয়েছিল। যদিও বই লেখার জন্য অনুপ্রেরণাই বলি আর অনুরোধই বলি, তা আমি পেয়ে আসছিলাম অনেকের কাছ থেকে। তাই একদিকে অনীহা, অপরদিকে অনুপ্রেরণা, এই দ্বিমুখী চাপের মধ্যে থেকেও মাঝেমধ্যে আমার দুয়েকটি লেখা সাময়িকীতে বেরিয়েছে এবং তা সমাদর পেয়েছে বলে শুনেছি, আমাকেও কেউ কেউ ফোনে জানিয়েছে। তাতে মনে হয়েছে, আমার লেখার ধারার অনুকূলে কিছু মানুষের আন্তরিক আগ্রহের সাড়া আছে। এই ক্ষীণ অনুভবই আমাকে এখন সাহস জুগিয়েছে লিখতে। তাই তো আমি সুহৃদ পাঠককুলের সম্মুখে হাজির হয়েছি বাস্তবতার প্লাটফর্মে, আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভাবনা এবং অনুশীলনের মিলন ঘটিয়ে এই বইয়ের পাতায় রং-তুলির আঁচড়ে তা উপস্থাপনার প্রয়াস নিয়ে।

আসলে আমি লেখক নই। লেখা আমার নেশা নয়, পেশাও না। লেখক যারা, তারা তো চিন্তার গহিন সাগরে ডুব দিয়ে তার অতল তল থেকে আবেগময় ভাব এবং ভাষার মুক্তা কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে মালা গাঁথেন অনুরাগের। তাদের লেখার সুর পাঠক-জীবনের লয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের অনুভূতিকে পুলকিত করে রোমাঞ্চের অনুভব দিয়ে। তাদের হৃদয় ভরে যায় ওইসব লেখায়। তাই তো মানুষ লুফে নেয় সে লেখা। সাধারণত প্রেম বিষয়ক লেখাতেই এমন সাড়া বেশি মেলে। আমার লেখায়ও প্রেম আছে। তবে যৌবন-যুগলের Romantic প্রেম নয়। সে প্রেম সৃজনশীল এবং মানবিক। যাকে ইংরেজিতে বলে Platonic Love (নিষ্কাম প্রেম)।

অধিকাংশ মানুষ জানে কোনটি ভালো এবং কোনটি খারাপ। খারাপের ফল ভালো হয় না, তাও জানে। জেনেও ভালো হওয়ার পথ-নির্দেশনা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার হুকুম, রাসূলের (সা.) বাণী বা উপদেশ; কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, গবেষকের জীবনলব্ধ মর্মবাণী ও দর্শন এবং সুবচন ইত্যাদিকে নির্বাসনে দিয়ে তাদের কেউ কেউ উন্মত্ত হয়, খারাপ এমনকি বিধ্বংসী কাজ করতে, যা অনুচিত। আমার লেখার ভিত্তিই এখানে। আমি বিশ্বাস করেছি, নিঃস্বার্থ এবং একনিষ্ঠ হয়ে ভালো কাজ করলে একদিন তার যথার্থ মূল্যায়ন হতে বাধ্য।

জানামতে, মানুষের মাথায় (টাক মাথা বাদে) কতটি চুল থাকে, তা আজ পর্যন্ত কেউ গুনতে পারেনি। আল্লাহ্ যদি কাউকে ওপরে ওঠাতে চান, তাহলে তার মাথার ওই অগুনতি চুলের মধ্য থেকে মাত্র একটি চুল ধরে তাকে ওপরে টানবেন, অপরদিকে কোটি কোটি মানুষ তাকে নিচের দিকে টেনে ধরলেও তারা তার ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারবে না। এটাই তো ভালো মানুষের পরম পাওয়া। তাই তো ভালো হয়ে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে অধিক ভালো কাজ করার আগ্রহের আসক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনে, সুবচনের সমর্থনে, বাস্তব উদাহরণ খাড়া করে, ছোট ছোট উপাখ্যানে আমি এই বই রচনা করেছি ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ করে। যাতে একটু পড়া, তারপর একটু পড়া, তারপর আরও একটু পড়া এবং এভাবেই সম্পূর্ণ বইটি পড়ে শেষ করে ফেলার তীব্র বাসনা তাড়িত করে পাঠকের মনকে। প্রতিটি উপাখ্যানের মধ্যেই মেসেজ আছে, যা অনুসরণ করলে উপকারে আসতে বাধ্য।

বইটি যারা মনোযোগ দিয়ে পড়বেন আমার বিশ্বাস, তাদের ভালো লাগবে এবং তারা তাদের বাস্তব জীবনে, বিশেষ করে পারিবারিক এবং কর্মপরিসরে এই বইয়ের দর্শনের প্রয়োগ ঘটাতে আগ্রহী হবেন। কারণ মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনে, দৈনন্দিন চলনে-বলনে, শালীন হতে, গ্রহণযোগ্য হতে, সাহসী হতে চলা-বলার কৌশল এবং টেবিল ম্যানারসহ যা যা করা আবশ্যক তার সব অনুশাসনই আমি এই বইয়ে সুচারুরূপে সংযোজন করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। অন্যভাবে বলা যায়, বাসায় বা বাড়িতে, কাজের অঙ্গনে, দফতরে, বিশেষ করে ব্যাংকে, কারখানায়, সামাজিক সমাবেশে, সভা-সমিতি ইত্যাদি সব জায়গায়ই প্রোটোকল থাকে। সেইসব প্রোটোকল মেনে চলার জন্য সময়ের এবং জগৎ-সংসারের দর্শনের চলতি ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো অতি সহজ, সাবলীল এবং বোধগম্য ভাষায় ধারাবাহিকভাবে গুছিয়ে এক জায়গায় করে এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি, বইটি Family Management ও Office Management-এর কার্যকরী সহায়ক হিসেবে পাঠকের মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হবে এবং এটা তাদের কাজে আসবে।

এই বইয়ের **বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ (খরচ বাদে) Philanthropic** (জনহিতকর) **কাজে ব্যয়িত হবে**। যাতে অন্তত একটি হলেও অচল মানুষ সচল এবং স্বাবলম্বী হয়ে তার পরাজয়ের জ্বালাকে বিজয়ের মালা দিয়ে বরণ করে সে তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, যুগের জন্য, জগতের জন্য কাজ করে যেতে পারে এবং তাতে পাঠকের এই বই কেনার বিনিয়োগ কাজে লাগে, ছাইদানিতে না যায় বাসি ছাইয়ের মতো।

তৃপ্ত পাঠককুলের অনাবিল আনন্দের মাঝে আমার স্মৃতি জাগরূক হয়ে থাকুক - এই প্রত্যাশা করি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

রবিউল হোসেন
২৬ নভেম্বর, ২০১২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইয়ের কাজে অনেক সুহৃদয় ব্যক্তি আমাকে নানাভাবে যথেষ্ট সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। অকপটে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, তাদের সহযোগিতা না পেলে আমার একার পক্ষে এই দুঃসাধ্য কাজ কিছুতেই করা সম্ভব হতো না। তাই ওই শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে কিছু মানুষের বিশেষ অবদানের কথা স্মরণ না করলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হবে। সে কারণে তাদের কাছে বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই নিজের মতো করে :

পৃষ্ঠপোষকতার জন্য

মার্কেন্টাইল ব্যাংক-বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে বোর্ডের শ্রদ্ধাভাজন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল জলিল এমপি-এর অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা আমাকে অসীম সাহসী এবং যারপরনাই উৎসাহী করেছে এই বই লিখতে। তাই তাদের সেইসব অমূল্য সহযোগিতার কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না, কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করব আজীবন।

অনুপ্রেরণার জন্য

প্রকৃতির শিক্ষা, কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মর্মবাণী এবং সুবচন আমাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস না দিলে এই বই লিখতে আমার কলম এগোত না। তাই তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লেখার উপাদানের জন্য

মানুষের সৃজনী ক্ষমতা কার্যকর করার বাধা দূর করতে আমার নিঃস্বার্থ প্রাণপণ সৎ চেষ্টায় এবং স্বচ্ছ কর্মকাণ্ডে যেসব মানুষ আমাকে সমর্থন না দিয়ে বরং অসহযোগিতা এবং গোপন বিরোধিতা করেছেন, শত্রুতা করে পরিবেশের শৃঙ্খলা ভেঙে দেয়ার অশুভ প্রয়াস চালিয়েছেন, তাদের সেইসব কর্মকাণ্ডই তাদের অজান্তে আমার এই লেখার বলিষ্ঠ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আমাকে দুঃসহ মনোকষ্ট না দিলে আমি এই লেখার ব্যাপারে হয়তো সিরিয়াস হতাম না। ফলে বই লেখাও হতো না। তাই এই লেখার কৃতিত্ব আমার একার নয়, ওইসব পরশ্রীকাতর এবং নেতিবাচক মানুষেরও। অতএব, তাদের প্রতি প্রাণ খুলে প্রসন্ন হতে না পারলেও কৃতজ্ঞ না হয়ে পারছি না।

পরামর্শের জন্য

সময়ে সময়ে অনেকে এই লেখার অংশবিশেষ পড়ে বা শুনে যেসব পরামর্শ দিয়েছেন, তা এই লেখার মান বাড়িয়েছে। তাই সেইসব উদার ব্যক্তিত্বের অকৃপণ সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মতামত এবং কারিগরি সহায়তার জন্য

সর্বোপরি বলতেই হয়, এই বই লেখার অনুকূলে কারিগরি সহায়তা এবং অহরহ পরামর্শ আমি লাগাতার পেয়ে এসেছি, আমার বর্তমান কর্মস্থল অর্থাৎ মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সব কর্মচারী/কর্মকর্তার কাছ থেকে। বিশেষ করে, তরফদার সুশীল কুমার, এভিপি (ফ্যাকাল্টি)-এর তৎপরতা অবিরাম সফরসঙ্গী হয়ে আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজিএম জনাব এম.এ. খালেকের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

তাই তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে রইলাম আজীবন।

লেখক

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জীবন, মানুষ, ট্রেনিং, ব্যাংক ও ব্যাংকিং

১৩-৪৮

১. জীবন কী? ১৩
২. নিজেকে বড় ভাবার কুফল ১৫
৩. ট্রেনিং কী এবং কেন ট্রেনিং প্রয়োজন ১৫
৪. ট্রেনিং বাস্তবায়নে করণীয় ১৬
৫. অধস্তনদের ওপর নজর রাখার সুফল ১৭
৬. প্রতিষ্ঠানের অবয়ব/কাঠামো ১৮
৭. ব্যাংক কী, ব্যাংকিং কী ১৯
৮. কেন টাকা ব্যাংকে রাখবেন ২০
৯. ব্যাংকের মৌলিক কাজকর্ম ২১
১০. চাকরি কী? ২৪
১১. কর্মীর গুরুত্ব কাজে ২৫
১২. অপচয় ও তা রোধের উপায় ২৬
১৩. আইন, রুল ইত্যাদি ২৬
১৪. আইনের আওতা ৩০
১৫. আইন কেন কীভাবে মানতে হবে ৩২
১৬. শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিত্ব ৩৩
১৭. স্বাতন্ত্র্য বনাম সমাজ ৩৪
১৮. বোনাস কেন কমে বাড়ে ৩৫
১৯. আবেগ- বিবেক সংঘাত ৩৬
২০. ক্ষমা বনাম প্রতিশোধ ৩৬
২১. অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের অবদান ৩৭
২২. কাজের ভালো- মন্দ বাছাবাছি ৩৭
২৩. ভালো কাজ করার উপায় ৩৮
২৪. কোনো কাজই ছোট নয় ৪০
২৫. কাজ হালনাগাদ রাখার উপায় ৪১
২৬. নীতির কঠোরতা ঝুঁকি কমায় ৪১
২৭. Attitude, Attires and Cleanliness ৪২
২৮. প্রতিষ্ঠান চালাতে করণীয় ৪৫
২৯. যৌক্তিক কথার যথাযথ মূল্যায়ন ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মের স্তরভেদে কর্মীর দায়িত্ব

৪৯-৮১

১. কাজ এবং কাজের দর্শন ৪৯
২. কর্মক্ষমতা ৫১
৩. কর্মীর দায়িত্ব ৫৩
৪. বসের বা ঊর্ধ্বতনের কর্তব্য ৫৪
৫. সময়ানুবর্তিতা ৫৭
৬. সময় ব্যবস্থাপনা ৫৭
৭. কাজে ফাঁকি দেয়ার খেসারত ৫৮
৮. কর্তব্যপরায়ণতা / দায়িত্বশীলতা ৫৯
৯. শ্রম ও পারিশ্রমিকের হিসাব ৬০
১০. কাজে ভুল না করা ৬১
১১. ভুলের মাশুল ৬২
১২. মনকে বিভক্ত করা ৬২
১৩. স্বার্থ সংঘাত ৬৪
১৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের দৈনন্দিক কাজ ৬৫
১৫. ফাইলিং করা ও রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি ৬৭
১৬. অফিস সামগ্রী ক্রয় ৬৯
১৭. অকেজো জিনিসের সুষ্ঠু ব্যবহার ৬৯
১৮. যা করা উচিত নয় (বিধিনিষেধ) ৬৯
১৯. টেলিফোন ব্যবহার ৭০
২০. গোপনীয়তা রক্ষা ৭১
২১. অফিসের ভাবমূর্তি ৭২
২২. অফিসে নীরবতা পালন ৭৩
২৩. ছুটি নেয়া ৭৩
২৪. কাজে বিলম্ব ৭৩
২৫. আয় গোপন না করা ৭৪
২৬. বেশি কথা/মিথ্যা কথা ৭৭
২৭. আয় কম, দায় বেশি ৭৮
২৮. অতি প্রশংসার কুফল ৭৯
২৯. খারাপ হওয়ার কারণ ও প্রতিকার ৮০

তৃতীয় অধ্যায়

আচার-আচরণ, নম্রতা-ভদ্রতা এবং আদর্শ (Etiquette, Manner)

৮২-১০২

১. আচরণ ৮২
২. প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ ৮৩
৩. দাফতরিক পোশাক- পরিচ্ছদ (Dress Code) ৮৫
৪. অফিস আচরণ ৮৬
৫. ওয়াশ/রেস্ট রুম ব্যবহার ৯০
৬. খাওয়ার নিয়মাবলি (Table Manner) ৯১
৭. লিফট ব্যবহারে করণীয় ৯৫
৮. কাজ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা ৯৬
৯. নামে নয় আচরণে পরিচয় ৯৭
১০. বড়দের মর্যাদা ৯৮
১১. আলাপচারিতা ৯৯
১২. অডিটের ওপর ট্রেনিং ৯৯
১৩. মিটিংয়ে অযথা কথা বলা অনাচার ১০১
১৪. অধস্তনদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ ১০৪
১৫. উদ্বুদ্ধকরণ ১০৬
১৬. কথা এবং মেজাজ ১০৭
১৭. বক্তাকে সম্মান না দেওয়া ১০৮
১৮. শিক্ষাজীবন বনাম চাকরিজীবন ১০৯

চতুর্থ অধ্যায়

সমালোচনা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা

১১৩-১৩৮

১. তর্জনী উঁচিয়ে খারাপ বলা ১১৩
২. চাটুকারিতা ১১৪
৩. পশ্চাতে পরচর্চা/পরনিন্দা ১১৫
৪. কোনো মানুষই খারাপ নয় ১১৮
৫. কানকথা খারাপ ১১৮
৬. ধূর্ত বন্ধু অপেক্ষা বোকা শত্রু ভালো ১১৯
৭. সেবা, মৌলিক অধিকার ১২০
৮. গণতন্ত্রমনা ১২১
৯. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ১২২
১০. তদবির/ধরপাকড় ১২২
১১. শাসন ও সোহাগ ১২৩
১২. সৌরভ ও গৌরব ১২৪
১৩. প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ১২৫
১৪. জনবল বনাম জনশক্তি ১২৬
১৫. চাকরি মজবুত করার কৌশল ১২৬
১৬. পুরনোকে ছাড়া নতুনকে ধরা ১২৮
১৭. সততা ও তার উপকারিতা ১২৯
১৮. দুনিয়া স্বল্পস্থায়ী, জীবন ক্ষণস্থায়ী ১৩০
১৯. চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ১৩১
২০. রাতারাতি বড় হওয়া ১৩২
২১. সন্তান বাবার চেয়ে বড় হবে ১৩৩
২২. কাজে এবং পারিশ্রমিকে সমতা ১৩৪
২৩. কর্মবিমুখদের প্রতিক্রিয়া ১৩৫
২৪. কম কথা বেশি কাজ ১৩৬
২৫. প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবা ১৩৭
২৬. অপরিকল্পিত ব্যবসা ধ্বংসাত্মক ১৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

জীবন প্রবাহ

১৩৯-১৯৮

১. খাওয়ার উপকারিতা/অপকারিতা ১৩৯
২. অনিয়ম অঘটন ঘটায় ১৪০
৩. নিজে শিখুন অন্যকে শেখান ১৪১
৪. শিক্ষা বনাম শিক্ষাগুরু ১৪৩
৫. আত্মপ্রবঞ্চনা মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ বানায় ১৪৪
৬. কারও চাপে নয় নিজ তাগিদে কাজ করা ১৪৬
(ক) ক্ষমতার চাপ বা Power Pressure ১৪৬
(খ) নৈতিক চাপ বা Moral Pressure ১৪৭
(গ) আর্থিক চাপ বা Financial Pressure ১৪৯
৭. স্মৃতির ব্যবহার ১৫০
৮. সমস্যা এড়ানো মানে বাড়ানো ১৫১
৯. সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায় ১৫২
১০. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ১৫৩
১১. জিদ ক্ষতিকর ১৫৩
১২. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ১৫৫
১৩. পোশাক নয় মনুষ্যত্বে মানুষ ১৫৬
১৪. গিফট/টিপ্সের অশুভ প্রভাব ১৫৬
১৫. আত্মসাৎ কাহিনী ১৫৮
১৬. গৃহকর্তা বনাম গৃহকর্ত্রী ১৬০
১৭. মরীচিকা প্রভাব ১৬১
১৮. ঠিকানা বিভ্রাট ১৬২
১৯. ভুল ধারণা মানে ভুল সিদ্ধান্ত ১৬৪
২০. গোছানো কথা ভুলে যাওয়া ১৬৬
২১. অন্যায় করা ও মাফ চাওয়া ১৬৭
২২. জিনিস আদান- প্রদানের নিয়ম ১৬৮
২৩. সমঝোতা সমস্যা সমাধানের উপায় ১৭০
২৪. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে ১৭১
২৫. গৃহপরিচারিকা সমাচার ১৭২
২৬. হীনম্মন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা ১৭৫
২৭. শক্তের ভক্ত নরমের যম ১৭৭
২৮. চাকরিতে কাজ বাছাবাছি ১৭৯
২৯. গাধার পিঠে ঘোড়ার জিন ১৮২
৩০. প্রতিবেশী সমাচার ১৮৪
৩১. আয় করা সহজ না ব্যয় করা সহজ ১৮৬
৩২. বেহিসাবি বেওকুফি ১৮৭
৩৩. মাকাল ফল ওপরে লাল ভেতরে কালো ১৮৮
৩৪. প্রবাস প্রবাহ ১৯১
৩৫. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ১৯৫
৩৬. উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট ১৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিন্দা-লাশের আত্মকাহিনী ১৯৯-২২২

প্রথম অধ্যায়

জীবন, মানুষ, ট্রেনিং, ব্যাংক ও ব্যাংকিং

১. জীবন কী?

জীবন একটা অনুভব- যার সত্তা আছে কিন্তু অবয়ব নেই, যা এগিয়ে চলে, পেছায় না। যার গতি আছে, প্রকৃতি আছে কিন্তু আকৃতি নেই। আমার মতে, জীবন একটি শক্তি, অদৃশ্য শক্তি। জীবন মানে দৌড়। জীবন মানে লড়াই। ভয় না পাওয়ার লড়াই। দায়িত্ব না এড়ানোর লড়াই। জীবন কখনও ভাঙে, কখনও মচকায়, আবার কখনও ভাঙে ও গড়ে নদীর কূলের মতো; যেমন– 'একূল ভাঙে, ওকূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা।' আসলে, ভাঙা-গড়া জীবনেরও একটি খেলা। এই খেলার গুঁটি জীব। জীবনের অবস্থান, সর্বত্র সচল এবং সক্রিয়। আবার কখনও কখনও তা নিষ্ক্রিয়ও হয়ে পড়ে এবং ধুঁকে ধুঁকে চলে। ঠেলে চালাতে হয়, বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তখন, জীবন হয়ে ওঠে খুবই দুর্বিষহ। আবার জীবন চঞ্চল চপলা হরিণীর মতো। আসলে জীবনকে অনুভব দিয়ে ছোঁয়া যায়, কিন্তু হাত দিয়ে ধরা যায় না। জীবন কখনও কখনও ফানুসের মতো, ইথারে ভাসে। জীবন যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। দুনিয়া এবং জীবন চলে সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণে। মানুষের জীবন বিচিত্র।

যদি প্রশ্ন করা হয়, জীবন কিসের জন্য, কেউ বলবে **জীবন ধারণের জন্য,** কেউ বলবে **জীবন যাপনের জন্য**, কেউ বলবে **জীবন ভোগের জন্য,** আবার কেউ বলবে **জীবন ত্যাগের জন্য**। কোন্‌টা সঠিক? এ প্রশ্নের জবাব জটিল। এক এক মানুষ জীবনকে এক এক ভাবে নেয়, পায়, পরিস্থিতির কারণে, পরিবেশের প্রভাবের কারণে। তাই তো জীবন সম্পর্কে মানুষের এমন ভিন্ন ধারণা, যা সবই ক্ষেত্রবিশেষে সঠিক।

এসব ভাবতে ভাবতে, বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ভূপেন হাজারিকার গানটির কথা মনে পড়ে যায়। তার এই গান জীবনের একটি নির্দিষ্ট পথ সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। যেমন– 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?' গানের এ দু'টি লাইন জীবনের মূল্যবোধকে একনিষ্ঠভাবে

সহানুভূতির আকুল আবেদন দিয়ে বেঁধে ফেলেছে মনের সঙ্গে। একে অপরকে সহযোগিতা করার আবহ ইঙ্গিত রয়েছে তাতে। এ গানের লেখক, তার অতি মূল্যবান ও উদার দার্শনিক চিন্তা, চেতনা, অনুভব এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গানটি রচনা করেছেন। এ গানের আবেদন মগ্ন শ্রোতার হৃদয়কে নাড়া দেয়, দোলা দেয়। কেউ যখন অনুরাগী হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে গানটি শুনবেন, আমার বিশ্বাস, তিনি তখন পৃথিবীর সব হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যা পাপ-তাপ ভুলে যাবেন। হারিয়ে যাবেন আপন মনের গভীর ভুবনে, স্নিগ্ধ মানসিকতার সতেজ তরুতলে। অবশ্যই, তার মন নরম হবে, দুর্বল হবে, ভালো মানসিকতার ছোঁয়া তাকে আকৃষ্ট করবে। ক্ষণিকের জন্য হলেও তিনি পরোপকারের কথা ভাববেন। স্বার্থের, পরশ্রীকাতরতার প্রশ্রয় তখন তার মন থেকে সরে দাঁড়াবে। তখন সবকিছুই তার কাছে ভালো মনে হবে। ভালো করতে ইচ্ছে হবে। আসলে স্বার্থপরতা ভুলে, লোভ-হিংসাকে দমন করে, অন্যের উপকারের জন্য ভাবলে শান্তি পাওয়া যায়, স্বস্তি পাওয়া যায় এবং সেখানেই প্রকৃত সুখ।

অপরদিকে, ভালোবাসা-বঞ্চিত এক নারী বা ব্যর্থ প্রেমে দিশেহারা যুবতী, জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে নিজেকে অসহায় ভাবতে পারেন। সুখ তার কাছে অর্থহীন একটা নিরস শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। এবং তখন তার কাছে সবকিছুই নেতিবাচক মনে হয়। ভারতের সুকণ্ঠী গায়িকা আরতী মুখোপাধ্যায়ের একটি গানের কলি একথা প্রমাণ করে। যেমন– 'কেউ বলে ফাল্গুন, কেউ বলে পলাশের মাস, আমি বলি আমার সর্বনাশ। কেউ বলে দখিনা, কেউ বলে মাতাল বাতাস, আমি বলি আমার দীর্ঘশ্বাস।' এই গানের কথা এবং এর লয়, স্নেহ-বঞ্চিত, ভালোবাসা-উপেক্ষিত একজন বিধ্বস্ত নারীর, প্রতিবাদী আর্তনাদের করুণ মূর্ছনা। ওই গান অনেক শ্রোতাকে হয়তো মুগ্ধতা দিয়েছে আমার মতো। কিন্তু পারেনি ওই গীতিকার এবং গায়িকাকে স্বস্তি দিতে। তাই তো তিনি পারছেন না সবকিছুকে ইতিবাচক হিসেবে নিতে। কারণ, তার মন না পাওয়ার ব্যথায় কাতর, হারানোর বেদনায় ভরপুর। এটা উপলব্ধির ব্যাপার, অনুভবের ব্যাপার।

অতএব, জীবন মানে উপলব্ধি। সৎ জীবনযাপন মানে নির্ভেজাল পরোপকারের নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার প্রতিবিম্ব। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, এভাবে ভাবলে যা পাওয়া যায় তাই তো ঢের। তাই নিষ্ঠুর বিধ্বস্ত অতীতের বিষাক্ত ছোবলে পুনরায় আক্রান্ত না হয়ে এবং তাতে হতাশ না হয়ে, সব গ্লানি, বেদনা ঝেড়ে-মুছে ফেলে, ভুলে গিয়ে, আবার নতুন করে ক্লিন শ্লেটে লেখা শুরু করার নামও জীবন। আসুন, তাই করি। ভালো কাজ করে মান বাড়াই, কীর্তি কুড়াই এবং জীবন জুড়াই। এমন করতে পারলে যারা আজ আপনাকে কটাক্ষ করছে, আগামীকাল তারা আপনার নতুন কীর্তি দেখে হয় যন্ত্রণায় জ্বলবে, না হয় চাটুকারের অভিনয়ে উল্লাসে ফুলবে। আপনার ব্যাপারে হয়তো তখন অনেকে

সবকিছু ইতিবাচকভাবে নিতে শিখবে, নেবে এবং করবে। আপনি তাদের আদর্শ হবেন। অতএব, জীবন মানে পরাজয় নয়, জয়। এটাই চরম সত্য কথা, এবং এটাই জীবনে পরম পাওয়া।

২. নিজেকে বড় ভাবার কুফল

মানুষের একটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে বড় ভাবা এবং অন্যে তাকে বড় ভাবুক বা বলুক তা যে কোনো মূল্যে আদায় করা। এরূপ স্বার্থপর মানুষের কাছে, ঠগ-তোষামোদকারীদের সাত খুন মাফ। কারও অনুরোধ পেলেই, ওই স্বার্থপর ব্যক্তি গর্বে গলে যান। শত অপরাধ করে কেউ প্রথমেই তার কাছে গেলে তিনি ন্যায়-অন্যায় না দেখে তাকেই সাপোর্ট করেন। এতে অনাচার হয়, অন্যায়কারী প্রশ্রয় পায় এবং তার ভিক্‌টিমরা অন্যায্যভাবে কষ্ট পায়। যে বস্ বা অগ্রজ এরূপ করেন, তিনি দুর্বল চিত্ত। নিজের যোগ্যতার ওপর তার আস্থা কম, তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। তার চিন্তা-চেতনা সর্বতো কল্যাণকর হয় না। এতে তার চতুর অধস্তনরা তার ওপর সুযোগ নেন। ফলে তার অফিস অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়। তাই কোনো বস বা অধস্তন কারোরই এরূপ ঠেলাগাড়ির মতো ঠেলা খেয়ে চলা উচিত নয়। সব সময় সবারই উচিত নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করে মেরুদণ্ড সোজা করে নিয়ম অনুযায়ী সঠিক কাজ করা, নিরপেক্ষ হয়ে চলা। নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে পারলেই ভালো মানুষ এবং ভালো বস্ হওয়া যায়। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ অর্থাৎ **ভোগে সুখ নেই, ত্যাগে সুখ** এই আদর্শই নিরপেক্ষতার প্রতীক। নিরপেক্ষ হতে হলে নিয়ম-কানুন জানতে হয়, মানতে হয়। ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কাজই এসব নিয়ম-কানুন শেখানো এবং সেগুলো মানার জন্য ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সব অংশগ্রহণকারীকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. ট্রেনিং কী এবং কেন ট্রেনিং প্রয়োজন

ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্রই হচ্ছে Devotion বা মগ্নতা সৃষ্টি। শুনতে মগ্নতা, শিখতে মগ্নতা এবং তা করতে মগ্নতা। অন্যভাবে বলা যায়, শোনার কৌশল, শোনানোর কৌশল, শেখার কৌশল, শেখানোর কৌশল, প্রয়োগ এবং গ্রহণের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুশীলনের নামই ট্রেনিং।

আবার প্রয়োজনের তাগিদে কোনো মানুষ বা প্রাণীকে নিজের এবং অপরের কাজের উপযোগী করে তোলার শিক্ষা দেওয়ার নামও ট্রেনিং। ট্রেনিংকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১) নৈতিকতার ট্রেনিং ২) কাজ করার ট্রেনিং। ট্রেনিং প্রশিক্ষণার্থীদের Attitude পরিবর্তন করে, কাজ শেখায়, দক্ষতা বাড়ায়, জ্ঞান বাড়ায়, কাজ করার ক্ষমতা বাড়ায়। বড়দের দেখে ছোটরা এবং একজনকে দেখে

অপরজন শেখে- সেটাও একটা ট্রেনিং। মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপের বা অবস্থানের পরিবর্তনের মাধ্যমের নামও ট্রেনিং। সবার জীবনের প্রথম ট্রেনিং গুরু মা-বাবা। পরবর্তীকালে জীবনের বা বয়সের ধারাবাহিকতায় সবাই উন্মুক্তভাবে যেখানে যা দেখে, তাই শেখে। এভাবেই পর্যায়ক্রমে জুনিয়ররা সিনিয়রদের স্থান দখল করে। এটা ব্যবহারিক ট্রেনিং। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ম-আচারের আওতায় শৃঙ্খলার সঙ্গে সব ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়। আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে যেখানে ট্রেনিং দেয়া হয়, সেই স্থানকেই মূলত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বা ট্রেনিং সেন্টার বা ট্রেনিং একাডেমি বা স্টাফ কলেজ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

৪. ট্রেনিং বাস্তবায়নে করণীয়

কাউকে ক'দিন ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দিলেই পূর্ণ ট্রেনিং হয় না। ট্রেনিংকে পরিপূর্ণ করতে প্রয়োজন হয় তার বাস্তবায়ন। ট্রেনিংয়ের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে ট্রেনিংয়ের পরপরই ট্রেনিং অনুযায়ী ট্রেনি বা প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে ট্রেনিংয়ের আদলে কাজ করানো আবশ্যক, যাকে বলে Post Training Utilization এবং তাদের কাজ তদারক করার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ট্রেনিংয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক কাজের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা না গেলে ট্রেনিং ফলপ্রসূ হবে না। মানুষের গেট-আপ, আউটফিট, ভাবধারা পরিবর্তন করতে, দক্ষতা বাড়াতে ট্রেনিং এক অপরিহার্য মাধ্যম। যেমন জুনিয়রদের সঠিক ট্রেনিং না দেয়া হলে তারা কাজ ঠিকমতো বুঝবেন না, করতেও পারবেন না। তার দায়ভার বড়দেরই বহন করতে হবে।

ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ট্রেনিংয়ের আদলে কাজ করানো না হলে তারা ট্রেনিংয়ের বিষয়বস্তু ভুলে যায় এবং তার কুফল ঊর্ধ্বতনদেরই পোহাতে হয়। তাই ঊর্ধ্বতনদের উচিত মূল কাজের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহকর্মীদের ট্রেনিং দেয়া এবং ট্রেনিং অনুযায়ী বিভিন্ন ডেস্কে Job Rotation করিয়ে কাজ করানো এবং তাদের কাজ তদারক করা। যেসব প্রতিষ্ঠানে এরূপ হয় না, সেখানে ট্রেনিং প্রহসনে পরিণত হয়, Cost Effective হয় না। এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়।

ট্রেনিংয়ের কাজ খুবই কঠিন। কারণ, একটি মানুষ জন্ম থেকে যেভাবে ভেবে এবং করে অভ্যস্ত হয়েছে, তার ওই আজন্ম অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো আদৌ সহজ কাজ নয়। মানুষ অভ্যাসের দাস। উভয় পক্ষের (ট্রেনিং দাতা এবং ট্রেনিং গ্রহীতা) সমন্বিত আন্তরিকতাই কেবল ট্রেনিংয়ের উদ্যোগকে সফল করতে পারে। ট্রেনিং না থাকলে মানুষ নিজের খুশিমতো চলে। সে কারণেই শৃঙ্খলা ভাঙে।

একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে :

ধরা যাক, কোনো একটি দফতরে একটি মাত্র ওয়াশ রুম আছে, যেটা ৩-৪ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শেয়ার করেন। সেখানে একটা সাবান দেওয়া থাকে এবং

২টি সাবানে ৪ জনের কমপক্ষে এক মাস চলে যায়। অথচ যদি ৪ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাদ্দ অনুযায়ী অধিযাচন দিয়ে প্রতি মাসে, প্রতিজনের জন্য ৪টি করে টয়লেট সাবান সরবরাহ নেন, তাহলে প্রতি মাসে ১৪টি (১৬-২) সাবান যায় কোথায়? যাওয়ার দুটো পথ থাকতে পারে। এক, বস্ ওই সাবান বাসায় নিয়ে যেতে পারেন (অবিশ্বাস্য) অথবা বস্ খেয়াল না করলে বসের অধস্তনরা তা উধাও করে দিয়ে ব্যক্তিগত ফায়দা লুটতে পারেন (বিশ্বাস করা কষ্টকর)। এসব অনুমান ঠিক না হলে, মাসে ১৪টি সাবানের অপচয় হচ্ছে, এটা তো সঠিক। উপযুক্ত ট্রেনিং দেয়া না হলে, মালামালের সঠিক ব্যবহারের ওপর সুষ্ঠু তদারক না থাকলে এটা হবেই। এরূপ কাজ ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন উভয়কেই অসৎ বানাতে পারে। একবার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেলে মানুষ লোভে পড়ে পরবর্তীতে বড় চুরি বা আত্মসাৎ করতে সাহসী হয়ে যায়। যেমন– কচুগাছ কাটার মহড়া দিতে দিতে কেউ মানুষ জবাই করার সাহস অর্জন করতে পারে। তবে পাপ বাপকে ছাড়ে না। খারাপ কাজের ফল তাদেরকে ভোগ করতেই হয় বা হবে একদিন না একদিন। তাই মনোযোগ সহকারে ট্রেনিং নেয়া এবং সে মোতাবেক কাজ করা উচিত। কারণ ট্রেনিং মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ায়। মার্জিত বানায়, Perfect হতে শেখায়। তাই ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই।

৫. অধস্তনদের ওপর নজর রাখার সুফল

অফিস সময়কে সঠিকভাবে ভালো কাজে লাগাতে এবং এর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অফিস-সামগ্রীর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে একে অপরের অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন-অধস্তনদের এবং অধস্তন-ঊর্ধ্বতনদের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন। যাতে কাজ সুন্দরভাবে হয়। একে সহযোগিতা বলা যায়। প্রকৃত নজরদারি না থাকলে প্রথমে উপেক্ষা, পরে অবজ্ঞা করলে তা মানুষের আচরণ ও নীতিবোধকে আক্রমণ করে। যেমন– বসকে স্বেচ্ছাচারী বানায় এবং অধস্তনকে বেয়াদব, অতিলোভী ও দুঃসাহসী বানায়। বসের নৈতিকতা অধস্তনদের চরিত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। আবার অধস্তনদের ভালো নৈতিকতাও বসের উপকারে আসতে পারে। তাই নজরদারি সফলভাবে করতে পারলে ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তনদের মধ্যে সুষ্ঠু সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা চরিত্র স্খলনের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে। এটা না করলে হ-য-ব-র-ল (যাকে ইংরেজিতে বলে MESS) হবে এবং এর জন্য দায়ী হবেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ক্রাইমের মূল সূতিকাগার এখানেই।

তাই ঊর্ধ্বতনদের উচিত, যোগ্যতা অনুযায়ী অধস্তনদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করা, সেই দায়িত্ব পালনে তাদেরকে প্রয়োজনে হাতে-নাতে দেখিয়ে সহযোগিতা করা এবং তীব্র ও তীক্ষ্ণ নজরদারির মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ওই কাজ আদায়

করে নেয়া। হুকুম দিয়ে, চোখ বন্ধ করে বা অন্ধবিশ্বাস করে বসে থাকলে বা প্রত্যাশা করলে কাজ হবে না। কাজ করাতে হলে নিজে তার সঙ্গে করতে হবে।

জামানা পাল্টে গেছে। সততা আজ ভূলুণ্ঠিত। স্বাধীনতার অপব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খলা বাড়ছে দিন দিন। যে যার মতো চলতে চায়, কেউ কাউকে মানে না বা মানতে চায় না। তাই নিজেদের সংযমী হয়ে, কঠোর হয়ে, নিঃস্বার্থ হয়ে, নিজ পরিবারে এবং নিজের কাজের অঙ্গনে যথার্থ অভিভাবক হিসেবে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হবে। তাহলেই ভালো কিছু করার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যাবে।

৬. প্রতিষ্ঠানের অবয়ব/কাঠামো

প্রতিষ্ঠানের অবয়ব বা কাঠামো নির্ভর করে তার কাজের পরিধি, গুণ এবং মানের ওপর। একাধিক লোক অভিন্ন দর্শনে একমত হয়ে একযোগে কাজ করার প্রয়োজন এবং তা মেটানোর জন্য আয়োজন বা উদ্যোগের আক্ষরিক সমন্বয়ের নামই প্রশিক্ষণ। প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কর্মবিন্যাসের মাধ্যমে কর্মীদের দায়িত্ব বিভাজন করে দেয়া অতীব গুরুত্বপর্ণ। বিষয়টি পরিষ্কার করতে একটি ব্যাংকের কাজের কাঠামো-বিন্যাস সংক্ষিপ্তভাবে নিম্ন ছকে দেখানো হলো :
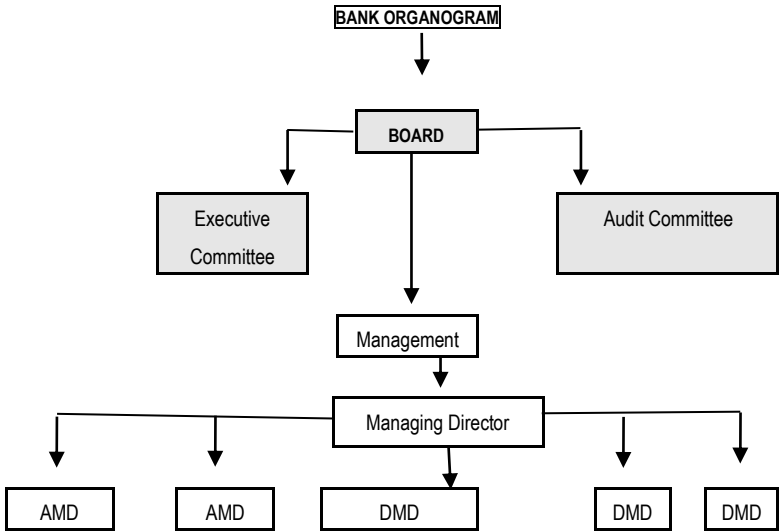
উপরোক্ত ডায়াগ্রাম হতে দেখা যায় যে, বোর্ড সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তাকে সাহায্য করে তার দুই কমিটি। এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং অডিট কমিটি।

বোর্ড পলিসি দেয় এবং ম্যানেজমেন্ট ওই পলিসি বাস্তবায়ন করে। অপরদিকে ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের পলিসি বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে অধস্তনদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে।

এভাবে প্রত্যেক ডিএমডির নিয়ন্ত্রণে আবার একাধিক ডিভিশন এবং ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণে ডিপার্টমেন্ট থাকে। শাখার সব কাজকর্ম সেকশনভেদে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ওপরে দেখানো অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী, সবার দায়িত্ব স্তরভেদে বিভাজন করে অফিস অর্ডার বা ডিউটি লিস্টের (যেখানে কাজের বর্ণনা দেয়া থাকে) আওতায় তা সম্পাদন করা হয়। এর সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে, **দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ** - এই প্রবাদ সত্য প্রমাণিত হবে। প্রতি স্তরের কাজ সঠিকভাবে হলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হতে বাধ্য এবং তাতে নিজের উন্নতিও অবধারিত।

যে ব্যক্তি কাজ করতে চান এবং করেন তার কাছেই কাজ বেশি যায়। কারণ, তিনি বেশি কর্তব্যপরায়ণ বলে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। এতে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মনের জোর এবং প্রসারতা বাড়ে। তিনি আরও বেশি কাজ করেন, করে আনন্দ পান, এটা তার সৎ স্বভাব এবং এতে তিনি কাজ করার বাড়তি ফলও লাভ করেন। যেমন, তিনিই শেষমেশ প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত উন্নততর অবস্থানের দায়িত্ব পান, প্রতিষ্ঠানে টিকে যান এবং মানবিক ও মানসিক দিক থেকেও ভালো থাকেন। কর্মবিমুখ লোকেরা তাকে কলুর বলদ ভাবলেও তাতে তার কিছু এসে-যায় না। এটাই চরম সত্য এবং সৎ কর্মী হিসেবে তার পরম প্রাপ্তি। ভালো মানুষ বা কারও ভালো কাজের বিরুদ্ধাচরণ করা অনুচিত, এতে অশান্তি বা দুর্ভোগ বাড়ে। তাই ভালো কাজে সহযোগিতা করা উচিত, নীরব থেকে হলেও।

৭. ব্যাংক কী, ব্যাংকিং কী

আভিধানিক অর্থে 'Bank is a Public Institution for Custody & Investment of Money' আসলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানুষ এবং ব্যাংক কেন্দ্রিক। তাই নিজের স্বার্থেই ব্যাংক সম্পর্কে সব মানুষেরই ন্যূনতম ধারণা থাকা আবশ্যক এবং ব্যাংক তথা অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য জানা প্রয়োজন। না জানা থাকলে আমরা অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের ধোঁকায় পড়ে নিজের কষ্টার্জিত সম্পদকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব। তাই ব্যাংকের প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্ব দিয়ে টানা হয়েছে।

ব্যাংক একটি ব্যবসায়িক তথা সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান। তবে এটা অন্য সব ব্যবসায়ের মতো দ্রব্য বা বস্তু কেনা-বেচার ব্যবসা নয়। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, ব্যাংক সেবা বিক্রি বা প্রদান করে থাকে। এরা কোম্পানি আইন এবং ব্যাংক-কোম্পানি আইনের আওতায় চলে। ব্যাংকিং কার্যক্রম ক্ষতিকর মহাজনি

কারবারের বিকল্প। ব্যাংক, বাহ্যত, একশ্রেণীর মানুষের অর্থাৎ সামর্থবানদের সঞ্চিত বা উদ্বৃত্ত টাকা অপেক্ষাকৃত কম সুদ প্রদানের শর্তে রক্ষক হিসেবে নিরাপদে জমা রাখে এবং অপর গ্রুপের অর্থাৎ উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রয়োজনে, পুঁজি হিসেবে, ওই টাকার সিংহভাগ, অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে বিধিবদ্ধ নিয়ম-আচারের আওতায়, তাদের কাছে লগ্নি করে বা ঋণ দিয়ে থাকে। সুদের এই ব্যবধানটাই ব্যাংকের আয়- যাকে ব্যাংকিং পরিভাষায় স্প্রেড (Spread) বলা হয় এবং তা দিয়েই ব্যাংকের পরিচালন-ব্যয় মেটানো হয়। আয়-ব্যয়ের এই ব্যবধানকে মোট (Gross) মুনাফা বলে এবং এই মুনাফা হতেই ব্যাংক সরকারকে ট্যাক্স দেয়, যা সরকার দেশ ও জনগণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করে। অবশিষ্ট মুনাফা হতে কর্মীদের বোনাস এবং মালিকদের ইক্যুইটির বিপরীতে লভ্যাংশ দেয়া হয়। মনে রাখতে হবে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্যারান্টি বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু অ-ব্যাংকের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়। তারা কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় তারা অনেক সময় লোভে পড়ে জনগণের সঙ্গে প্রতারণামূলক কাজে লিপ্ত হয়। যেমন, অতীতে প্রচুর লোক লোভের বশবর্তী হয়ে কাজল ব্যাংক, যুবক বা ডেসটিনি ইত্যাদি নামের অনেক প্রতিষ্ঠানের ধোঁকায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এজন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কারণ, ওইসব অ-ব্যাংক যেভাবে বর্ধিত ও আকর্ষণীয় হারে মুনাফার অফার দেয়, কোনো নিয়মিত ব্যবসা থেকে সেই হারে আয় করা সম্ভব নয়। তারপরও অনেকে তাদের ধোঁকায় পড়ে বোকা হয়ে যায়। শুধু লোভে পড়ে নির্বোধের মতো তাদের কষ্টার্জিত শেষ সম্বল জমা রাখে সেখানে। অবশেষে সব হারায়। কারণ, ওইসব গ্রাহক তাদের ক্ষতি পোষাতে সরকারি কোনো Protection পায় না। অপরদিকে, সব ধোঁকাবাজ প্রতিষ্ঠানও অধিকাংশ সময় ওই টাকা সরিয়ে ফেলে নিজেদের লাভের জন্য। যাকে ফান্ড সাইফুনিং বলা হয়।

৮. কেন টাকা ব্যাংকে রাখবেন

শিরোনামের প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, **চঞ্চল টাকা অঞ্চলে বেঁধো না,** ব্যাংকে রেখে নিরাপদ থাকো, স্বচ্ছ থাকো। কারণ টাকা হাতে থাকলেই খরচ হয়ে কমে যায়, ব্যাংকে রাখলে তা বাড়ে সঞ্চিত হয়ে। সঞ্চয় থাকলে দুর্দিনে মুশকিলে পড়তে হয় না এবং তা অশান্তি দূর করে, অসুখ কমায়, বিপদ সামলায়।

আবার ব্যাংকে না রেখে টাকা ঘরে রাখলে বেহিসাবি খরচ হয়ে যেতে পারে এবং তাতে স্বভাব ও চরিত্র নষ্ট হয়। চোর-ডাকাতের ভয়, চাকর-চাকরানীর ভয় থাকে, যা বিপজ্জনক এবং সে টাকা থেকে কোনো আয় হয় না, যা অলাভজনক।

লাভের লোভে উদ্বৃত্ত টাকা ব্যবসায় খাটালে ঘুম হারাম হয়। কারণ, ব্যবসা ২৪ ঘণ্টার কাজ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অদক্ষতা বা নিজের ভুলের কারণে ব্যবসায়ে মার খেলে নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়, জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, সমাজ-সংসারে কোনো ঠাঁই মেলে না। কেউ বিশ্বাস করে না।

ব্যাংকে টাকা রেখে তার গোপনীয়তা রক্ষা করা না গেলে, কেউ টাকা ধার চেয়ে না পেলে তা শত্রুতা বাড়ায়, জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। আবার সেই ভয়ে টাকা ধার দিলে, তা ফেরত না পাওয়ার কষ্ট এবং আদায় করার বিপদ-ঝুঁকি থাকে। তাই ব্যাংকে টাকা রেখে, তা না উঠিয়ে, তার থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট আয় করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপন করা বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, এতে শুধু নিয়মিত ব্যয় মেটানোই নয়, বরং জমানো টাকার বিপরীতে সাধারণ ঋণের তুলনায় কম সুদে ঋণ নিয়ে জরুরি বিশেষ প্রয়োজনও মিটিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়।

আবারও বলি, আপনার জমানো টাকা ব্যাংকে রাখলে তা নিরাপদ থাকে এবং বাড়ে। ব্যাংক আপনার টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করে, যা থেকে আপনাকে সুদ দেয়, নিজের খরচ মেটায়, মালিকদের ডিভিডেন্ড দেয় এবং সরকারকে ট্যাক্স দেয়। সরকার সেই টাকা দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণে কাজে লাগায়। আবার, ব্যাংক যখন গ্রাহকের টাকা খাটায়, তখন দুভাবে কর্মসংস্থান হয়। যেমন– ব্যাংকে লোক সরাসরি চাকরি পায়। অপরদিকে, ব্যাংক থেকে ঋণপ্রাপ্ত ফার্মে বা কোম্পানিতে বিভিন্ন স্তরের লোকজন যোগ্যতা অনুসারে চাকরি পায়। তাই ব্যাংকে টাকা রাখা শুধু নিজের জন্য নয়, পরিবারের জন্য, দেশের এবং সমাজের জন্য ও জাতির জন্য। তাই অন্য কোথাও নয়, টাকা ব্যাংকে রাখুন।

৯. ব্যাংকের মৌলিক কাজকর্ম

আগে বলেছি আবার এখনও বলছি, টাকা-পয়সা লেনদেনের এবং নিরাপদে রাখার সহজ ও নির্ভরযোগ্য স্থান হচ্ছে তফসিলি ব্যাংক। তাই ব্যাংকের কাজকর্মের ওপর জনগণের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হলে, যারা ব্যাংকে কাজ করে ব্যাংকিং-এর ওপর তাদের মৌলিক ধারণা থাকা দরকার। এটা যার থাকবে, তিনি প্রথম দর্শনেই মানুষের কাছে গুরুত্ব পাবেন। গ্রাহকের সঙ্গে ভালো বা ব্যাংকার-সুলভ আচরণ না করলে একদিকে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হবে, অপরদিকে ব্যবসা হারাতে হবে। তাই তো, গ্রাহক ব্যাংকারদের প্রভু, যা সবাই জানেন। আমাদের বিরুদ্ধে গ্রাহকের অভিযোগ শিরোধার্য। তবে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আমাদের বা ব্যাংকের কোনো অভিযোগ বাঞ্ছনীয় নয় (মারাত্মক কিছু না ঘটলে)। কারণ, তারা সেবা বা ভালো

ব্যবহার না পেয়ে ব্যাংক ছেড়ে চলে গেলে প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকের জন্য সেটা ক্ষতিকর হবে। তাই সাধারণ মানুষকে এবং ব্যাংক-কর্মীদেরকে ব্যাংকের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দিতেই নিম্নবর্ণিত তথ্য তুলে ধরা হলো :

ক) ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক (একটি ব্যাংকের তথ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়া হলো) :

ব্যাংকের সঙ্গে গ্রাহকের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় হিসাব খোলার মাধ্যমে, যার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় যোগসূত্র (পরিবর্তনীয়) নিম্নরূপ :

হিসাবের ধরন (এক বা একাধিক নামে)	প্রাথমিক জমা (ন্যূনতম টাকা)	সুদের হার	মেয়াদকাল	হিসাব খোলার কাগজপত্রাদি
চলতি	১,০০০.০০	০%	চলমান	সংশ্লিষ্ট ফরমে বিবৃত
সঞ্চয়ী	৫০০.০০	৬%	চলমান	
মেয়াদি	১০,০০০.০০	১২.৫%	১ - ১২ মাস	

এছাড়া, আরও অনেক প্রকার ব্যাংক হিসাব আছে যা পরে, ধীরে ধীরে জানলেও চলতে পারে।

খ) স্কিম ডিপোজিট

ব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের স্কিম ডিপোজিট চালু আছে। যেমন–

Double Benefit Deposit Scheme (DBDS) : ৫$\frac{১}{২}$ বছরে দ্বিগুণ হবে।(ন্যূনতম এককালীন জমা ১,০০,০০০.০০ টাকা)।

Family Maintenance Deposit Scheme : ৩ অথবা ৫ বছর মেয়াদি (কমপক্ষে ১,০০,০০০.০০ টাকা)।

Special Savings Scheme (Tripple S) : ১০ বছরে তিন গুণ হবে (কমপক্ষে ৫০,০০০.০০ টাকা)।

Deposit Pension Scheme (DPS) : মাসিক জমা ২৫০.০০ টাকা থেকে ২৫,০০০.০০ টাকা হারে ৩, ৫ ও ১০ বছরের জন্য।

Super Benefit Deposit Scheme (SBDS) : কমপক্ষে ১,০০,০০০.০০ টাকা এক বছরের জন্য, মাসিক নীট মুনাফা ১,০০০.০০ টাকা।

গ) বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংক্রান্ত

আজকাল বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের প্রক্রিয়া অনেক সহজ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত বা দেশ থেকে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিজস্ব এজেন্সির মাধ্যমে রেমিট্যান্স করে টাকা আনার সুযোগ আছে। বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের টাকা বেনিফিশিয়ারির যে কোনো ব্যাংকের হিসাবে ঢাকার মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় এবং ঢাকার বাইরে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা করার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি চালু হওয়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অধিকতর সহজ উপায়ে এবং দ্রুততার সঙ্গে টাকা পাঠানো যায়। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে রেমিট্যান্স করে টাকা পাঠানো প্রেরকের জন্য নিরাপদ এবং ব্যাংকের ও দেশের জন্য তা কল্যাণকর। অনলাইনের সাহায্যে আন্তশাখা রেমিট্যান্স সুবিধাও মিনিটের মধ্যেই পাওয়া যায়।

ঘ) ভিসা কার্ড

ক্রেডিট ডুয়াল কার্ড (দেশি ও বৈদেশিক মুদ্রায়) ডেবিট কার্ড এবং প্রি-পেইড কার্ডের মাধ্যমে নগদ টাকা ওঠানো যায় আবার কার্ডের সাহায্যে নির্ধারিত দোকানে কেনাকাটাও করা যায়। ডেবিট কার্ড হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রেখে অবশিষ্ট টাকা এবং ক্রেডিট কার্ডের হিসাবে অনুমোদিত ঋণসীমা পর্যন্ত টাকা ওঠানো যায়। ব্যাংকের নিজস্ব এটিএম-এ কার্ড দিয়ে টাকা তুললে বা নির্ধারিত কিছু দোকানে কার্ড দিয়ে কেনাকাটা করলে অধিকাংশ ব্যাংকে কোনো ফি বা চার্জ দিতে হয় না এবং ব্যাংক ভেদে এক দিনে ৪ থেকে ৬ বারে প্রতিবারে ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা এবং সর্বমোট এক লক্ষ টাকা ওঠানো যায়। তবে চুক্তিবদ্ধ অন্য ব্যাংকের এটিএম হতে টাকা ওঠালে প্রতি উত্তোলনে ব্যাংকভেদে ১০ থেকে ১৫০ টাকা ফি দিতে হয়। সাবধান, আপনার কার্ডের পিন নম্বর কাউকে জানতে দেবেন না। কারণ, এটাও টাকা, তবে প্লাস্টিক টাকা। টাকা দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।

ঙ) ব্যাংকের নেটওয়ার্ক

ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেয়া, অপরদিকে ব্যাংকের কাছ থেকে সহজতর উপায়ে সেবা নেয়া, ব্যাংক এবং কাস্টমার উভয়ের জন্য ভালো এবং এটা পরস্পরের ব্যবসায়িক অধিকার। ব্যাংকের সংখ্যা যত বাড়বে, গ্রাহকের এবং সমাজের আর্থিক কর্মকাণ্ড তত সহজ হবে। তবে একই জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত একাধিক ব্যাংক হলে অনৈতিক প্রতিযোগিতা হয় এবং তাতে ব্যাংকের

আয় কমে, দায় এবং সম্পদ ঝুঁকিপূর্ণ হয়, যা জনগণের নৈতিকতায় স্খলন ঘটায়। এতে Over Financing হয় যা Dangerous. কারণ এটা মানুষকে প্রতারক এবং বেহিসাবি বানায়, কুপথে চালিত করে এবং তাতে দেশের অর্থনীতি এবং মানুষ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ব্যাংক সব সময়ই চেষ্টা করে Profit Motive সহনীয় মাত্রায় রেখে এর নেটওয়ার্ক, জনবল ইত্যাদি সুসংহতভাবে বৃদ্ধি করতে। এবং ব্যাংকের বা প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীরই উচিত, এসব বিষয়ে হালনাগাদ সম্যক ধারণা রাখা এবং বর্ণিত আদর্শকে (Ethics) মান্য করে Professional হিসেবে কাজ করা।

ব্যাংকারদের সততা ও ন্যায়ের প্রতি একনিষ্ঠতা গ্রাহক ও মালিকপক্ষকে সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন জীবন পরিচালনায় সহায়তা দিতে পারে এবং তাতে ব্যাংকাররাও ভালো থাকতে পারে। অপরদিকে, ব্যাংকারের সরলতা, উদাসীনতা, অসততা, অদক্ষতা ইত্যাদি সমাজ এবং দেশকে সহজে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে এবং তাতে ব্যাংকাররাও বিপদ এড়াতে পারেন না। অর্থের কারণেই এসব হয়। কারণ **অর্থই অনর্থের মূল**।

১০. চাকরি কী?

কোনো কাজ কর্তার হুকুম বা দফতরের নিয়মের আওতায় পরিচালনা করার নামই চাকরি। নিয়মের আওতায় চলার ক্ষেত্রে কর্মী স্বাধীন হতে পারে। তবে নিয়মের বাইরে চলার ক্ষেত্রে সবাই পরাধীন। কার কাছে পরাধীন? জবাবদিহিতা এবং আইনের কাছে, নিয়মের কাছে। কারণ, আইন, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি করা হয় তা মানার জন্য, ভাঙার জন্য নয়। এবং যিনি নিয়মাচার মেনে চলেন তিনিই সৎ মানুষ, সৎ চাকরিজীবী, যেহেতু চাকরি করেই তিনি জীবিকা অর্জন করে থাকেন। তাই নিজের পরিবার ও দেশের জনগণের মঙ্গলের জন্য সততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিয়মাচার মেনে চাকরি বা কাজ করা উচিত।

কাজের গুণগত মানের প্রয়োজনে, যোগ্যতার ভেদাভেদে, কাজের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয় এবং সে মোতাবেক বিভিন্ন হারে পারিশ্রমিকও নির্ধারিত হয়ে থাকে। কর্মীর এই স্তরবিন্যাসের আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের বিভিন্ন মাত্রার এবং যোগ্যতার লোকবলকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থান করা। যাতে একদিকে বেকারত্ব হ্রাস পায়, অন্যদিকে ক্রাইম কমে। তাই চিন্তা করে মেধা খাটিয়ে কর্ম সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অফিসের কাজ নয়, যে কোনো উৎপাদন বা সেবামূলক কাজ সৃষ্টি এবং তাতে লোকবল নিয়োগের দায়িত্ব সব বিবেকবান লোককেই নিতে হবে। তাহলেই সমাজ এবং দেশ উপকৃত হবে, উন্নত হবে। অপরদিকে, কর্মীর দায়িত্ব হচ্ছে শ্রম দিয়ে, প্রত্যয় নিয়ে, সেই প্রত্যয় পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ করা, যাতে ওই প্রতিষ্ঠানে তার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

যাকে বলে Contribution Value এবং ধীরে ধীরে তা অন্য প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে যায়, যাকে বলে Transfer Value। পরিচ্ছন্ন জীবন পরিচালনার জন্য সৎ কাজের বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, চাকরি পাওয়া কঠিন হলেও তা ভালোভাবে টিকিয়ে রাখা আরও কঠিন কাজ।

১১. কর্মীর গুরুত্ব কাজে

সুচিন্তিতভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, স্তর নির্বিশেষে সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কাজের 'শিকড় থেকে শিখরের' পুরো জায়গায় নিয়োজিত কর্মীবাহিনীর মধ্যে Top এবং Bottom এ দুটি স্তরের কর্মীরাই আমার বিবেচনায় অধিক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, Top ব্যক্তির সুষ্ঠু পরিকল্পনার মূল সহায়ক শক্তি হচ্ছে Bottom ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। যেমন, অফিসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফাইল ইত্যাদি ঠিক না থাকলে বসের মেজাজ ঠিক থাকে না, তার কাজ পিছিয়ে যায়। তাই এসব ঠিক রাখার দায়িত্ব নিম্নস্তরের কর্মীদের। বর্ণিত দুই স্তরের সফল সংযোগ মধ্যস্তরের কাজের প্রক্রিয়া এবং তার পরিচালনাকে সক্রিয় করে। আবার মধ্যস্তরের কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে Bottom স্তরের নিয়ত সহযোগিতাও অপরিহার্য। তাই Bottom লাইনের লোকেরা Top & Mid লাইনের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দাবি করে। সবার উচিত Bottom লাইনের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া। প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করে এবং মিলেমিশে অর্থাৎ 'United we stand, divided we fall' এই সূত্র মেনে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানের ভালো হতে বাধ্য এবং তাতে সবারই উপকার হতে পারে।

একজন বরেণ্য লেখকের উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যেমন– **সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল যদি মুখেই রক্ত সঞ্চার করা হয়, তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।** তাই ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সবসময় একতরফাভাবে অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বতনকে মূল্যায়ন করা এবং অধস্তনদেরকে উপেক্ষা করে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত নয়। অযথা ধমক না দিয়ে সহমর্মিতার সঙ্গে কাছে টেনে তাদেরকে নিয়েই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা উত্তম। একে অপরের দায়িত্ব বুঝতে হবে এবং যথাযথভাবে সে দায়িত্ব কর্তব্য জ্ঞান করে পালন করতে হবে। অপরপক্ষে, কোনো অবস্থাতেই অধস্তনদেরও উচিত হবে না ঊর্ধ্বতনদেরকে অবমাননা করা তাদের কথা না মানা। মনে রাখতে হবে, কারও সঙ্গে অশালীন আচরণ করা অন্যায়। তাই কেউ এরূপ করবেন না। এটাই আমাদের পরামর্শ এবং প্রত্যাশা। মনে রাখতে হবে, কাজকে ভালোবাসলে, কর্ম সম্পাদনে নিরপেক্ষ হতে পারলে এবং সততার সঙ্গে ভালো কাজে পরিমিত শ্রম দিলে তার ফল ভালো হয় এবং তাতে সেই প্রতিষ্ঠানে ওই কর্মীর গুরুত্বও বাড়ে।

১২. অপচয় ও তা রোধের উপায়

পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়া এবং সতর্কতার অভাবেই আমাদের নিয়ত ব্যবহার্য জিনিসের অপব্যবহার বা অপচয় হয়ে থাকে এবং তাতে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়ে। এতে প্রতিষ্ঠানের অনেক ক্ষতি হয়, কর্মীদেরও। তাই শুধু ব্যবসা বাড়িয়েই আয় বৃদ্ধি নয়, অপচয় রোধের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচন করেও আয় বাড়ানো যায়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পন্থা। অতএব, ব্যয় সংকোচনের দিকে সবারই সুতীক্ষ্ণ নজর দেয়া দরকার।

অফিস-সময়ে নিজেকে অফিসের কাজে ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বন্ধ করা গেলে অফিসের ক্ষতি রোধ করা সম্ভব। এছাড়া, কর্মস্থলের লাইট, ফ্যান, এসি, পানি, স্টেশনারি ইত্যাদি অপচয় করা উচিত নয়। বাড়িতে কি আমরা এরূপ করি? প্রতিষ্ঠানকে প্রথম সংসার এবং পারিবারিক সংসারকে দ্বিতীয় সংসার ভাবতে হবে। কারণ, অফিসের (প্রথম সংসারের) টাকাতেই দ্বিতীয় সংসার (পরিবার) চলে। নিজেকে Employee নয়, Employer ভাবতে পারলে কাজের প্রতি Serious হওয়া যাবে এবং এতে তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি হবে না। নিজের জিনিস কেউ কাউকে সহজে দেয় না। যা হোক, ধীরে ধীরে এটি অভ্যাসে এবং স্বভাবে পরিণত হবে এবং চলতে থাকবে আপন গতিতে। মানুষ অভ্যাসের দাস- এরূপ ভাবনা এবং প্রতিজ্ঞা মনে নিলে, পরবর্তীতে তা আমাদের নিজেদের বাড়ির বা বাসার (দ্বিতীয় পরিবারের) সবাইকে প্রভাবিত করবে। তাতে কাজের প্রতি সবাই যত্নবান হবেন এবং কেউ কোথাও ঠেকবেন না, ঠকাতেও পারবেন না। অপরদিকে, ফাঁকিবাজ হলে পৃথিবীর কোথাও ঠাঁই পাবেন না। একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হবে। মনে রাখতে হবে, কোন জিনিসের এবং সময়ের অযৌক্তিক ব্যবহার বা অপব্যবহারই অপচয়। সুস্থ মনের দৃঢ়তা দিয়ে এটাকে রোধ করতে হবে।

১৩. আইন, রুল ইত্যাদি

আইন, নিয়ম-কানুন বা রুল ইত্যাদি করা হয় একটি দেশ ও তার জনগণ তথা পরিবেশের প্রয়োজনে, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং মানুষের কর্মের নিশ্চিত ফলাফল টার্গেট অনুযায়ী লাভ করার জন্য। এছাড়া আইন, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি করা হয় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যও। কর্মের ফল কম হলে বা আদৌ না হলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তথা কর্মীর অবস্থান টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য।

পুনরায় বলি, ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠান চলে বিধিবদ্ধ আইন এবং নিয়মের আওতায়। কর্মকাণ্ডের গতি, প্রকৃতি সুশৃঙ্খল রাখতে নিয়ম-কানুনের আবশ্যকতা অপরিহার্য। আইন-কানুনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন- ১) **সাধারণ আইন**

২) **কোম্পানি আইন** এবং

৩) **ব্যাংক কোম্পানি আইন**।

সব আইনই সংসদে প্রণীত এবং গৃহীত হয় জনপ্রতিনিধি বা সম্মানীয় এমপিদের দ্বারা।

১) **সাধারণ আইন :** এই আইনের তিনটি সুনির্দিষ্ট গতিপথ আছে। যথা–

ক) সিভিল খ) ফৌজদারি (ক্রিমিনাল) গ) অর্থঋণ আদালত

সিভিল আইন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসূত্রী তবে তা সার্বজনীন এবং এটা সভ্যতার ধারক ও বাহক। অন্যদিকে, ফৌজদারি/ক্রিমিনাল আইন, ক্রাইম বা পাপ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শান্তি বা স্বস্তির অনুঘটক।

অর্থঋণ আদালত আইন ঋণ আদায়ের সহায়ক শক্তি।

ওপরের সব আইন সমাজের এবং ইহার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই প্রণীত হয়ে থাকে।

ক) সিভিল আইন

সার্বজনীন প্রয়োজনে, নাগরিক হিসেবে ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে সবারই সব আইন জানা এবং সব সময় তা মেনে চলা আবশ্যক। এর সফল প্রয়োগের দায়িত্ব বাহ্যত সরকারের কিন্তু বস্তুত জনগণের। অর্থাৎ, আমাদের সবার। ব্যক্তিগতভাবে সবাই নিয়ম-কানুন, আইন সুষ্ঠুভাবে মানলে সমষ্টিগতভাবে দেশের আইন-কানুন মানা হবে, এতে সরকারকে সহযোগিতাও করা হবে এবং সরকার তখন স্বস্তির সঙ্গে জনগণের মঙ্গলে বা কল্যাণে এবং দেশের উন্নয়নে অধিক কাজ করতে পারবে। তাতে ব্যক্তির ভালো হবে, দেশের কল্যাণ এবং জগতের মঙ্গল হবে। তাই আসুন, সবাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, আইন মেনে সরকারকে সহযোগিতা করি, দেশের ও নিজের কল্যাণে কাজ করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করি এবং সমাজের প্রতি আমাদের দায় মোচন করি। এরূপ না করলে সবার ক্ষতি হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারও বাড়ির সামনে একটা কুকুর মরে পড়ে থাকলে তিনি তা না সরিয়ে যদি মিউনিসিপ্যালিটির সুইপার বা ক্লিনারের অপেক্ষায় থাকেন এবং মুখে মেয়রের পিণ্ডি চটকান, তাতে লাভ হবে না। কারণ, দুর্গন্ধটা তারই

ক্ষতি করবে। এটাই বাস্তব সত্য। ভোট দিয়েছি বা ট্যাক্স দিই বলে (অবশ্য সমাজে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা নেই একথা বলা যায় না) ছোটখাটো সব কাজের দায়িত্বই সরকারের, এটা ভাবা ঠিক নয়। একটি বাড়িতে শুধু একজন পরিষ্কার থাকলে সে বাড়ি পরিষ্কার রাখা যায় না। নিজের কাজ নিজে করার সুফলের একটা উপমা দেয়া যায় : আমরা যখন প্রবাসী হয়ে অপর প্রবাসীর বাসায় নিমন্ত্রণে যাই সেখানে খাওয়ার পর নিজের ব্যবহার্য প্লেট ইত্যাদি নিজেই ধুয়ে দিয়ে আসি। এটা ওই সমাজের রেওয়াজ। এতে সহমর্মিতা বাড়ে এবং পরস্পর সবাই উপকৃত হয়। দেশেও এরূপ করতে অসুবিধা কোথায়? সেটা তো করিই না, বরং আমরা অন্যের বাসায় পরিবার-পরিজন নিয়ে গেলে, আমাদের বাসার কাজের লোককে মেহমান বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাই এবং সেই বাসার কাজের লোকদের সাহায্য করতে দিই না। এর ফলে তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত সহমর্মিতা ও সৌহার্দ সৃষ্টি বিঘ্নিত হয়। আমরা খাওয়ার পর নিজেদের ব্যবহৃত প্লেট বিদেশের মতো না ধুয়ে ফেলে রেখে আসি। তাতে ওই পরিবারের কষ্ট হয়। তাই এরূপ করা অনুচিত।

এখন আইনের আঙিনার দিকে নজর দেয়া যাক। আইনের কর্মকাণ্ড প্রধানত পাঁচ ধরনের আদালতের মাধ্যমে পরিচালিত হয় :

স্বত্বের মোকদ্দমা বা সিভিল মামলা, ঋণ আদায় মামলা প্রাথমিকভাবে ওপরের ১ থেকে ৩ ক্রমিকের আদালতে করা হয়।

বিবাদ মীমাংসায়, স্থানীয় সালিশ অকার্যকর হলে বা কাজ না করলে ফৌজদারি আদালতের মাধ্যমে বিচার চাইতে হবে। আইন কখনও নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না; এটা শুধু অনুচিতই নয়, বেআইনি এবং অপরাধমূলকও বটে। ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালত আইনের সব ধারা সময়মতো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর না করলে ব্যর্থতার দায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে, যা ওই আইনেই স্পষ্ট করে বলা আছে। এ বিষয়টি ব্যাংকার, গ্রাহক এবং সবাকেই বুঝতে হবে এবং সে মোতাবেক চলতে হবে।

খ) কোম্পানি আইন

নিয়ম-কানুনের আওতায় ব্যবসায়ী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানি বা ব্যবসা আইনের সৃষ্টি। ব্যবসায়ে কোনো অনিয়মিত কাজ বা দুর্নীতি হলে আইনের আওতায় তার বিচার হওয়ার সুযোগ থাকে। এই আইন মেনে কাজ করলে ব্যাংক এবং তার খেলাপি-গ্রাহক উভয়েই উপকৃত হতে পারে। কোম্পানি আইন বা ব্যবসায়ের আইন ভঙ্গ করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসা বিপদগ্রস্ত হয়, জনগণও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কোম্পানি সমস্যায় পড়ে। ফলে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব মানুষও ভোগান্তির শিকার হয়। যেমন, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল জিনিস বিক্রি করা, ভুয়া লাইসেন্স নিয়ে কাজ করা ইত্যাদি কারণে ব্যবসা সমস্যায় পড়লে সম্পৃক্ত সবারই অসুবিধা হয়। তাই, আইন সম্পর্কে জেনে কাজ করতে হবে এবং প্রয়োজনে আইন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। আইন না জানার অজুহাতে বা ভুলের জন্য, আবার জেনে আইন ভঙ্গ করার কৈফিয়ত হিসেবে মাফ পাওয়া যাবে না। কোম্পানি আইন ব্যবসা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট হাতিয়ার এবং তা পরিপালনের দায়িত্ব কোম্পানির সবার। দেশের আইন মেনে সুশৃঙ্খলভাবে চললে কোম্পানি আইন মানা কঠিন হয় না। তাই আবারও বলি, কোম্পানির কাজ, নিয়ম এবং আইনের মধ্যে পরিচালনা করলে কোম্পানি ভালো চলবে, তাতে জনগণের অধিকার খর্ব হবে না এবং সবাই লাভবান হবেন। অপরদিকে, আইন না মানলে ফল হবে উল্টো।

গ) ব্যাংক কোম্পানি আইন

ব্যাংক কোম্পানি আইন অন্য সব আইনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক-ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাংক কোম্পানি আইন বা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। তাই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবল অর্থাৎ ব্যাংকার, কাস্টমার সবাইকে এই আইন অবশ্যই জানতে হবে, মানতে হবে। জানলে কাজ সহজ হবে, মানলে মঙ্গল হবে। ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের বিভাজনভেদে এই আইন একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। যেমন- NI Act, Limitation Act, Artho Rin Adalat Ain, Money Laundering Prevention Act, Foreign Exchange Regulation Act etc. আইনের পুস্তক বা পুস্তিকা বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এমনকি মতিঝিল, ব্যাংক পাড়ায়, এনবিআর অফিসের সামনে অস্থায়ী বা ভ্রাম্যমান লাইব্রেরিতে কিনতে পাওয়া যায়। এসব আইন জানলে এবং ঠিকমতো মানলে ব্যাংক ভালো চলবে, না মানলে ব্যাংক বিপদে পড়বে এবং তার কুফল কর্মীবাহিনীকেই বেশি ভোগ করতে হবে। কারণ, কোম্পানি বন্ধ হলে কর্মীরা চাকরি হারাবেন। তাই সব দায়িত্বশীল নাগরিককে এবং ব্যাংকের সব স্তরের কর্মীকে, ব্যাংকের নিয়মাচার এবং আইন-কানুনের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সবাই আইন জানলে কাউকে ঠেকতে হবে না, ঠেকানোও যাবে না। সবার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

পুনরায় বলি, উপরোক্ত সব আইনের বিভিন্ন ধারা, বৈষম্যহীনভাবে মানুষের কল্যাণ, প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা, দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সবার প্রয়োজনের জন্যই সময়ে সময়ে সংযোজিত এবং সংশোধিত হয়ে থাকে। অপরদিকে, সব মানুষের, প্রতিষ্ঠানের এবং সার্বভৌম দেশের সংকট বা বালা-মুছিবত প্রতিরোধ বা তার প্রতিকারের জন্য নিয়ম-নীতি, আইন-কানুনের গুরুত্ব অপরিসীম। এক দেশের আইন অন্য দেশে অচল। তাই ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ক্রস-বর্ডার Dispute বা বিবাদ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রযোজ্য, যা ICC (International Chamber of Commerce)-এর মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশে আইনের ঘাটতি নেই। তবে দুর্বলতা রয়েছে এর প্রয়োগে। বিদেশে আইনের প্রয়োগে কঠোরতা থাকার কারণে সেখানে মানুষ অপেক্ষাকৃত ভালো থাকে। তারা সভ্য বলে স্বীকৃত এবং আইনকে ভয় করে চলে। প্রয়োগের কঠোরতার কারণে আইন মেনে চলতে বাধ্য হয় তারা। উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও যদি আইনের প্রয়োগে পর্যাপ্ত কঠোরতা থাকত, তাহলে আমরাও ওইসব দেশের চেয়ে কম সময়ে অধিক উন্নতি করতে পারতাম। কারণ, আমাদের দেশের মানুষের মেধা বিশ্বনন্দিত এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে অনেক ভালো করছে। যদিও ভাষাগত দুর্বলতার কারণে, তুলনামূলকভাবে আমরা কিছুটা মার খাচ্ছি। এই দিকটাতে আমাদের সবার এবং রাষ্ট্রের সম্মিলিত তীক্ষ্ণ নজর দেয়া প্রয়োজন। আইন প্রয়োগের আলোচিত দুর্বলতা দূর করা কোনো কঠিন কাজ নয়। সার্বজনীন আইনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের এবং আত্মীয়তার ঊর্ধ্বে রাখতে পারলেই এটা করা সম্ভব। প্রশাসক হিসাবে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নিজের ছেলের অপকর্মের বিরুদ্ধে তার অনমনীয় ও নিরপেক্ষ বিচারিক আদেশ চলাকালে, অর্থাৎ বেত্রাঘাতের মধ্যখানে অপরাধী ছেলের মৃত্যুর পর অবশিষ্ট বেত্রাঘাত তার কবরের ওপরে মেরে দণ্ডাদেশ কার্যকর করেন। এ এক অনন্য এবং অসাধারণ বলিষ্ঠ উদাহরণ। তাই তো, সেই কাল এখনও সমাদৃত এবং সবার মুখে মুখে।

১৪. আইনের আওতা

সমাজে সম্মিলিতভাবে সহমর্মী হয়ে বসবাস করার বিধিবদ্ধ পদ্ধতির পরিচালনকে আইন বলা যায়, যা আগেই বলা হয়েছে। নিয়ম, আইন, চুক্তি ইত্যাদি ভঙ্গ করে সাধারণ মানুষ বা ব্যাংকার বা গ্রাহক যে কেউ কোনো কাজ করলে তাকে আইন ভঙ্গ করা বা আইনের আওতাবহির্ভূত কাজ করা বোঝায়। আইন উদার এবং

নিরপেক্ষ। তাই **মামলা রুজু হয়ে গেলেও সমঝোতার মাধ্যমে আদালতের ভেতরে বা বাইরে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যায় এবং তা অপেক্ষাকৃত ভালো।**

পুনরাবৃত্তি হলেও বলি, সাধারণত সম্পত্তির স্বত্ব রক্ষা ও তার সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য সিভিল আইন আবশ্যক। অপরদিকে, কোনো তাৎক্ষণিক অন্যায় ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় ফৌজদারি মামলা করা {এজাহার দেয়া বা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা} হয় এবং পরে তা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যায়। সিভিল বা জমিজমা সংক্রান্ত মামলা জজ কোর্টে করা যায়। অর্থঋণ সংক্রান্ত মামলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঢাকাসহ দেশের সব জেলা শহরের অর্থঋণ আদালতে দায়ের করা যায়।

চুরি-ডাকাতি, মারামারি এবং খুন-জখমের মতো ঘটনার বিষয়ে যত শিগগির সম্ভব সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করতে হয়। আদালতে মামলা করলে উকিলের মাধ্যমে আর থানায় জিডি করলে সরাসরি করতে হয়।

আইন অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা যাবে না। আবার আইন এড়িয়ে চলাও ঠিক নয়। কোনো দুষ্কর্ম বা ক্রাইম সংঘটিত হলে তা মেটাতে Quasi আইন বা স্থানীয় সালিশ ব্যর্থ হলে আদালত-আইনের আশ্রয় নেয়া বা মোকদ্দমা করা আবশ্যক। এটা না করা অনুচিত। কারণ, এতে বিশৃঙ্খলাকারীদের বা দুষ্কৃতকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়ে এবং মুষ্টিমেয় ক'জন দুষ্কৃতকারীর অত্যাচারের ভয়ে সমাজের বৃহত্তর নিরীহ ও শান্ত জনগোষ্ঠী কষ্টে মরে। মনে রাখতে হবে, জনগণই সব শক্তির উৎস। তাই, আইনের আওতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শক্তির আওতা বা ক্ষমতার সীমারেখা সম্পর্কে সবার সম্যক ধারণা থাকা দরকার। একজন মানুষ যদি অন্যকে অথবা সমাজের অধিকসংখ্যক মানুষকে কষ্টে রাখে, তাহলে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। তাই দুষ্কৃতকারী মানুষকে **মানব নয়, দানব হিসেবে** চিহ্নিত করতে হবে। দুষ্কৃতকারীরা সংখ্যায় কম হয়ে যদি আইনের উদাসীন প্রশ্রয়ে দুষ্কর্ম এবং অন্যের ক্ষতি করার পরও মানবাধিকারের প্রশ্রয় পায় অর্থাৎ তারা মানব হিসেবে পরিগণিত হয়, তাহলে তাদের নিপীড়নে নিগৃহীত হওয়া অধিকসংখ্যক মানুষ যুক্তিতে দানব হবে। কিন্তু তা কি ঠিক? এটা কি মানবিক? আবার দু'গ্রুপের লোকই ঢালাওভাবে মানব হবে এটা কি ঠিক? না, তা হতে পারে না। এটা অনাচার, অবিচার। নির্যাতনের বিপরীতে নিগৃহীত ভুক্তভোগীদের সাহস থাকলেও তাদের পরিবারের লোকজন তাকে প্রতিবাদ করতে দেয় না। কারণ, প্রতিবাদ করতে গেলে স্ত্রী ভাবে সে বিধবা হয়ে যেতে পারে, সন্তানেরা ভাবে তারা এতিম হতে পারে। কে চায় এরূপ হতে। তাই অত্যাচারীর ভয়ে সমাজের ভালো মানুষেরা মুখ লুকিয়ে থাকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আইনের আওতায় অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও ওইসব নিগৃহীত নিরীহ মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠ মানবরূপী দানবের দাপটের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। তবুও বলি, ওইসব দানবের দুষ্কর্মকে প্রতিহত করতে হবে। না পারলে সংঘবদ্ধভাবে তাদের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, প্রতিবাদ জানাতে হবে। এরূপ করতে না পারলে তাদের ঘৃণা করতে হবে। অর্থাৎ, তাদেরকে ফাঁকা মাঠে গোল করতে দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, অন্যায়কারী বাইরে সাহস দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভীত থাকে, সাপের মতো। তাদের ওই সুপ্ত দুর্বলতার ওপর সাহস করে বলিষ্ঠ আঘাত হানতে হবে। ভীরু হয়ে বাঁচার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলায় প্রয়োজনে সাহস করে সত্য সাক্ষী দিতে হবে। ভয় পেয়ে মুখ লুকিয়ে থাকলে চলবে না। সাহসী হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাকে প্রতিহত করলে যুদ্ধে জেতা যাবে। কিন্তু আমাদের সমাজে ক'জন তা করে? নিরাপত্তাহীনতার কারণে সবাই নিষ্ক্রিয় থাকে। একটা মর্মবাণী মনে রাখতে হবে **অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।** অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ না করা মানে আইনকে অসহযোগিতা করা। তাই তা করতে হবে আইনের আওতাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর জন্য।

১৫. আইন কেন এবং কীভাবে মানতে হবে

আইন মানতে হলে তার আওতায় করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সবার পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বইপত্র, সার্কুলার ইত্যাদি পড়ে এবং অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে অথবা আইনজ্ঞের সাহায্য নিয়ে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং সর্বোপরি নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে আইনমতো চলতে হবে। এসব করতে হলে প্রথমেই আইন জানতে হবে যা আগেই বলেছি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেউ আইন না মানলে, আইনের আওতায়ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে সবাই আইন মানার জন্য সচেষ্ট ও তৎপর হবে। ফলে, আইনের উপকারিতা সবাই পাবেন। কখনও আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না। আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। আইনের ওপর আস্থা হারালে আইনের সঙ্গে অসহযোগিতা করা হবে। সহযোগিতা না পেলে আইন সবল হবে না, দুর্বল হয়ে পড়বে ভূমিকা রাখতে।

আইন কোনো কঠিন বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়। Law is nothing but a Common Sense. অর্থাৎ, মানুষের সাধারণ জ্ঞানই আইন। তাই যে যেখানে আছে সেখানে প্রত্যেককে জ্ঞান দিয়ে কোনো বিষয়ের বা কাজের ভালো-মন্দ বিচার করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে এবং তাতেই আইন প্রয়োগ করা হবে। নিজের সুবিধার জন্য অন্যের অসুবিধা করা অন্যায় এবং তা আইনের পরিপন্থী। অন্যায় করে পার পাওয়া যায় না। ইহকালে না হলেও পরকালে তার বিচার হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অন্যায়কারীরা শাস্তি পায় না। তবে সূক্ষ্মভাবে ভাবলে দেখা যাবে, যারা বেআইনি কাজ করে তাদের বিচার অনেক সময় এই দুনিয়াতেই হয়ে যায়। যেমন– বালা-মুছিবত, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি তাদের লেগেই থাকে। তারা এক হাতে আনে, অন্য হাতে খরচ করে, স্থিতি দাঁড়ায় শূন্য। এটা তাদের জন্য শাস্তি। কারণ, সম্পদ জড়ো করতে না পারলে বা জড়ো করা সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তারা অনেক কষ্ট পায়। কেউ কেউ হয়তো সন্তান হারানোর চেয়েও বেশি। তারা সম্পদ আহরণে মত্ত হয়ে বিপথে যেতেও পিছপা হয় না। তারা পরিবার-পরিজনের দিকে খেয়াল করার সময় পায় না। তাই তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সন্তানরা মানুষ হয় না। এটাও তাদের শাস্তি। অন্যায়কারী শেষমেশ ভালো থাকে এ কথা কেউ বলতে পারবে না। অপরদিকে, যারা অন্যের ক্ষতি করে না তারাই বরং ভালো থাকে। চোখ বন্ধ করে দেখুন, এর উদাহরণ হয়তো আশপাশেই পাবেন। অবৈধ উপার্জন অবাধে খরচ হয়ে যায়, (Ill Got Ill Spent) কর্পূরের মতো উবে যায়; কিছুতেই তা রোধ করা যায় না। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে আরও ব্যাখ্যায় যাওয়া প্রয়োজন। যেমন– আয় তিন প্রকার। i) হেলায় আয় (Easy Earn), যা অবলীলায় ব্যয় হয় ii) কষ্টের আয় (Hard Earn), যা কেষ্ট আনে এবং সবশেষে iii) পাপের আয় বা ধন (Ill Earn) যা প্রায়শ্চিত্তে যায়। তাই আইন মানা অপরিহার্য এবং তা সবার বেলায়ই প্রযোজ্য। কারণ, আইন বেআইনের বিরুদ্ধে। বেআইনি কাজ চমকপ্রদ, তবে তা পাপাসক্ত এবং তা অত্যাচারী মানুষকে আনন্দ দেয়। তাই তারা নিষ্ঠুর হয়ে নিজের ভোগের জন্য অপরের ভোগান্তি বাড়ায়। তার ফলে নিরীহ মানুষ কষ্ট পায়। কবি বলেছেন, **নিঠুর নিদয় শশী, সুদূর গগনে বসি, কি দেখিছ? জগতের হিংসা পাপরাশি!** পাপের বিপক্ষে তাই বলা হয়, Behind every Fortune, there is a Crime. সুতরাং, ওইসব পাপী মানুষের Fortune আসলে Fortune নয়, তা বস্তুত Misfortune। আসুন, এমন Fortune ঘৃণা করি, এমন ভাগ্যবানকে এড়িয়ে চলি।

১৬. শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিত্ব

আইন বা নিয়ম-কানুন মেনে চলার নামই Discipline বা শৃঙ্খলা। যিনি শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারেন তিনিই ভালো মানুষ এবং সঠিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তিনি ভালো থাকতে পারেন। তার সহকর্মীদেরও ভালো রাখতে পারেন। কোনো মানুষ বা জাতি Discipline ছাড়া ভালোভাবে চলতে পারে না। Discipline মানেই ঐক্যতান, এক লয় এবং এক সুর। অর্থাৎ, Discipline মানে কোনো কাজের প্রয়োজনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে অভিন্ন প্রটোকল মেনে চলা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, কোনো মানুষ সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ ফর্সা, কেউ

কালো, কারও নাক বোঁচা, কারও চোখ অন্ধ। সংক্ষেপে অন্যভাবে বলা যায়, কেউ রূপে ভালো এবং কেউবা গুণে। রূপেগুণে উভয় দিক দিয়ে ভালো এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। তাই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ বা সমন্বয় করেই সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বানিয়েছেন এবং তার ১৮০০০ সৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন এবং বাহ্যিক নিদর্শনও তিনি রেখেছেন এভাবে যে, শুধু মানুষের মাথাই উঁচু থাকে চলার সময়। অন্য কোনো প্রাণীকেও সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো দিয়ে বানালে তা সুন্দর হতো না। যেমন উটের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সর্বোত্তম হওয়া সত্ত্বেও উট একটি কুৎসিত প্রাণী। তাই একযোগে কাজ করতে, বিভিন্ন মতের মানুষকে অভিন্ন প্রটোকলে এক পতাকাতলে আনার জন্যই আইন, শৃঙ্খলা এবং Discipline-এর প্রয়োজন। Discipline থাকলে সবকিছুই সুন্দরভাবে হয়। যেমন– আর্মিদের প্যারেড এবং মসজিদে জামাতের নামাজের সুশৃঙ্খল দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।

১৭. স্বাতন্ত্র্য বনাম সমাজ

আবারও বলি, সব মানুষ সমান নয়, সমমনাও নয়। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সত্তা, পছন্দ ও ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে পটু। আবার একাও চলতে পারে না। তাই সমাজের জন্ম হয়। বড় কাজ করতে সমাজ লাগে, সমষ্টি লাগে। অর্থাৎ যেখানে একাধিক লোক এক পরিসরে কাজ করে, সেখানে মতপার্থক্যের কারণে বিবাদ বাধতে পারে। বিবাদকে বিবেক দিয়ে প্রতিহত করা না গেলে, সেই বিবাদ সংঘাতে রূপ নিতে পারে। তাই সংঘাত এড়িয়ে দেশের, প্রতিষ্ঠানের এবং পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার জন্য অভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতির পরিপালন আবশ্যক। এক কথায়, এই অভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির নামও আইন। আগেও বলেছি, আবারও বলি, আইন সার্বজনীন প্রয়োজনে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত এবং তা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যগণ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি দ্বারা অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ, আইন মানুষের ইচ্ছায় এবং মানুষেরই প্রয়োজনে তৈরি হয়। অথচ আমাদেরই আইন আমরা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলছি না। হয় ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থপরতার কারণে, না হয় অসুস্থ পরিবেশের কু-প্রভাবের ফলে। এতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এই অচল এবং ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা ভাঙতে আমাদের সবাইকে নিঃশর্তভাবে, একনিষ্ঠ হয়ে আইন মেনে কাজ করতে হবে। এটা অসাধ্য কাজ নয়। মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে আইনের সুফল পেতে নীতি এবং ধর্মের পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগ অধিক কার্যকর হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। উন্নত দেশগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগের অবস্থাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমার জানামতে, সেখানে আইনের প্রয়োগে কঠোরতা অধিক কার্যকর হিসেবে দেখা যায়। পুনরায় বলা যায়, মানুষ সেখানে ভয়েই আইন মেনে চলে।

আমরাও কঠোর হতে পারলে ধীরে ধীরে আমাদের সবার মানসিকতায় পরিবর্তন আসবে এবং তাতে আমরা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমষ্টিগতভাবে তার নিশ্চিত সুফল ভোগ করতে পারব। আমাদের শিক্ষা অপবাদমুক্ত হবে।

১৮. বোনাস কেন কমে বাড়ে

কাজে ফাঁকি দিলে বা ষোলআনা কাজ না করলে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক ক্ষতির শিকার হয় এবং তার কুফল সব কর্মীকেই ভোগ করতে হয়। যেমন, কোনো একটি ব্যাংকের কথাই ধরা যাক। সেখানে যদি কিছুসংখ্যক লোক কাজ না করে বা কাজ কম করে বা জালিয়াতির মাধ্যমে তহবিল তছরুপ করে তাহলে সেখানে উৎপাদন আনুপাতিক হারে কমে যায়। ফলে, কর্মীদের বোনাস এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ডিভিডেন্ডও কমে যায়। এভাবে, কর্মে অনাগ্রহী এবং দুষ্কৃতকারী লোকের সংখ্যা আরও বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের আয় কমে অর্থাৎ ক্ষতি হয়ে তার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বোনাস কমার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রায় সবাই অভিন্ন সুরে বলে থাকেন, ব্যাংকের শাখা এবং এর জনবল বৃদ্ধির কারণে খরচ বাড়ছে, তাই বোনাস বা অন্য সুবিধা কমছে। একথা আদৌ সত্য নয়, সঠিকও নয়। বরং আমি বলব, এটা ভুল। কারণ, একজন ব্যবসায়ী তার দোকানে বা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ায় তার বাড়তি ব্যবসার কাজ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে বেশি মুনাফা অর্জন করার জন্য, খরচ বাড়ানোর জন্য অবশ্যই নয়। বর্ধিত জনবলসহ কর্মচারীদের পেছনে প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকের যে খরচ হয়, তা তারা খরচ নয়, বরং বিনিয়োগ হিসেবে ধরে নেয়। তারা জানে, বিনিয়োগ সঠিক হলে অর্থাৎ নিয়োগকৃত লোক সঠিকভাবে কাজ করলে তার জন্য ভালো রিটার্ন আসবেই। অপরদিকে, লোক বাড়িয়ে যদি কাজ বাড়ানো না হয় এবং বর্ধিত কাজ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে খরচ বাড়বে। অর্থাৎ ভালো ব্যবসা সুনিয়ন্ত্রণে বাড়ানো না হলে তার জন্য যে খরচ হবে তা বাড়তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আয় কমাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা দুর্বল হলে সেখানে এরূপ বেহিসাবি কার্যক্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই আমরা একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে একক এবং সম্মিলিতভাবে মনোযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের বা দফতরের জন্য ষোলআনা কাজ করব, ফাঁকি দেব না এবং বেহিসাবি কোনো কাজও করব না। তাহলে প্রতিষ্ঠান ভালো চলবে, আমরা ভালো থাকব। বেশি বেশি করে বোনাস পাব। কারণ, Bonus is the Part of Profit & Profit is the reward of Cost Effective Management.

১৯. আবেগ- বিবেক সংঘাত

মানুষ আবেগ দ্বারা তাড়িত এবং বিবেক দ্বারা চালিত হয়। আবেগ স্পর্শকাতর; মানুষকে দুর্বল করে, উত্তেজিত করে, কখনও কখনও অপ্রকৃতিস্থও করে। কিন্তু বিবেক মানুষকে লাগাম দিয়ে টেনে ধরে আবেগের উন্মাদ দৌড় থেকে থামায়। আবেগের কাছে অনেক সময় সত্য আড়াল হয়ে যায়। তাই কারও চোখে আবেগের মুগ্ধতা দেখে তার তথ্য বা মতামত যাচাই না করে গ্রহণ করা ঠিক নয়। মনে সন্দেহ রাখতে হবে যে, এটা তার ভুল অনুভব নতুবা সুপ্ত দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন কূটকৌশল হতে পারে। তাই যাচাই-বাছাই করে তার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তার তথ্য এবং কাজ গ্রহণ বা অনুমোদন করা হলে শুধু তার অন্যায়কেই সমর্থন দেয়া হবে না, বরং তাতে প্রতিষ্ঠানের এবং নিজেরও সমূহ ক্ষতি হবে। আবার বলি, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে আবেগ কাজ করে কিন্তু বিবেক তাকে প্রতিহত করে। বিবেক মানুষকে যুক্তি দেখায়, ভাবতে শেখায়, সাহস দেয়, শক্তি জোগায়। বিবেক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নিয়ন্ত্রণ যখন করতে পারে তখন অন্যায়-অপরাধ কম হয়। কখনও কখনও আবেগের তাড়না কীভাবে মানুষকে ধ্বংস করে তা একবার দেখুন। সেদিন একটা জাতীয় দৈনিকে দেখলাম, ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক গ্রামে মুরগি বা হাঁসের ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়া, মারামারি এবং অবশেষে ৪ জন মানুষ খুন এবং ২০ জন আহত হয়েছে। এবার ভাবুন, একটা হাঁস কতটুকু বা কী পরিমাণ ধান খেতে পারে? বড়জোর আধা কেজি। বর্তমান বাজার অনুযায়ী তার দাম কত? ৯.০০ টাকা। অর্থাৎ ৯.০০ টাকার ধানের জন্য ৪টি মূল্যবান প্রাণ গেল। তাহলে কি একটি প্রাণের বা মানুষের জীবনের দাম ২.২৫ টাকা? ওই ৯.০০ টাকার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের যে কী অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা যদি তারা একবার ভাবত, তাহলে তাদের ক্রোধ প্রশমিত হতো এবং এরূপ বিধ্বংসী ঘটনা ঘটত না। এমনকি হাঙ্গামার সময় যদি তাদের বিবেক আবেগকে দমন করতে পারত, তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। তাই আবেগ নয়, বিবেক দিয়ে চলাই উত্তম। অর্থাৎ মন দিয়ে, বিবেক দিয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে চলার বিকল্প নেই।

২০. ক্ষমা বনাম প্রতিশোধ

অহেতুক মামলা-মোকদ্দমা অশান্তি বাড়ায়। চোরকে ধরার জন্য তাড়া করলে তার পেছনে নিজেকেও ছুটতে হয়। এটা শুধু কষ্টকর নয়, ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষতিকরও বটে। ফ্যাসাদ এবং মোকদ্দমা মানুষের মনে প্রতিহিংসা বা জিঘাংসার উপসর্গ সৃষ্টি করে। প্রতিশোধ নেয়ার হিংস্র মানসিকতা থেকে এরূপ হয়। এর কুফল থেকে বাঁচতে হলে সহনশীল এবং উদার হোন। অপরাধীকে সম্ভব হলে ক্ষমা করুন।

তাকে সুনজরে রাখুন, দেখবেন সে ভালো হয়ে গেছে। কারণ, ক্ষমা একটি বড় গুণ। সুষ্ঠু বিচার এবং ক্ষমা প্রদর্শনই মহৎ কাজ। এতে হার নেই, আছে জিত। তাই বিবাদ করে নয়, বিবেক খাটিয়ে সমঝোতা করে চলুন। আবেগপ্রবণ হয়ে, উত্তেজনা বাড়িয়ে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করবেন না।

পুনরাবৃত্তি হলেও বলি, মামলা হয়ে গেলেও বিবাদ আদালতের বাইরে মীমাংসা করা যায় এবং তা অপেক্ষাকৃত শান্তির, স্বস্তির। তাই তো মর্মবাণী বলে, **দয়ার মতো ধর্ম নেই, হিংসার মতো পাপ নেই।** তবে এই ধর্মমুখী ক্ষমা অবশ্যই সমাজ, দেশ এবং দশের ক্ষতি করে নয়; অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে নয়। অন্যায়কে প্রতিহত করতে দয়া ব্যর্থ হলে নিয়মনীতির প্রতি কঠোর হতেই হবে, প্রয়োজনে আইনের আশ্রয়ও নিতে হবে। অর্থাৎ, সফ্‌ট লাইন কাজ না করলে হার্ড লাইন নিতেই হবে, তাহলেই বিবেক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবে; পরিবেশ শান্ত থাকবে, সমাজ ভালো হবে।

২১. অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের অবদান

আমরা সবাই জানি, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেয়া হয়েছে সঞ্চালনের জন্য। নিয়মিত অঙ্গ সঞ্চালন করলে দেহ সচল ও সুস্থ থাকে, মনও প্রফুল্ল থাকে এবং না করলে দেহ রোগগ্রস্ত হয়ে অচল হয়ে যেতে পারে। ভালো কাজে শরীর ও মনকে লাগালে ভালো ফল এবং খারাপ কাজে লাগালে খারাপ ফল আসতে বাধ্য। ভালো-মন্দ বিবেচনা করার জন্য মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। 'মস্তিষ্ক' এবং 'মন' মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান চালিকাশক্তি। কারণ, মন থেকে যখন কোনো কাজের সাড়া আসছে, মস্তিষ্ক তখন সেটিকে সঠিকভাবে করার জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নির্দেশ দিচ্ছে। তাই মস্তিষ্ককে ভালো কাজে লাগাতে হবে। স্বার্থপরতা পরিহার করে নিরপেক্ষ হতে পারলেই এটা করা সম্ভব। এগুলো সবই সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বলা হয় **আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না।**

২২. কাজের ভালো- মন্দ বাছাবাছি

যে কাজ একতরফাভাবে এক পক্ষের লাভের পাল্লাকে ভারী করে, সে কাজ ভালো হতে পারে না। যেমন, চুরি করা, অন্যায় করা, অন্যের স্বার্থহানি করা, কারও মনে কষ্ট দেয়া, অন্যের হক মারা, অত্যাচার করা ইত্যাদি সব কাজ একতরফা। তাই তা খারাপ, অবৈধ এবং অনিয়মিত। এসব অনিয়মিত বা বেআইনি কাজই খারাপ কাজ। ভালো বা খারাপ বুঝে কাজ করতে হবে এবং করার আগে কাজের দোষ-

গুণ, ভালো-মন্দ, সুফল-কুফল সম্পর্কে ভাবতে হবে। মন্দ হলে তা বর্জন, ভালো হলে তা গ্রহণ করতে হবে। খারাপ কাজে প্রথমে মেকি প্রশান্তি, পরে প্রকৃত অশান্তি। কিন্তু ভালো কাজে প্রথমে কষ্ট, পরে কেষ্ট। মনে রাখতে হবে, **ভোগে সুখ নেই ত্যাগেই সুখ**। তাই ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে ভোগ বা লাভের লোভ সংবরণ করে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখলে **লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু** ঘটবে না। **অতি ভোজনে শাস্তি, অল্প ভোজনে স্বস্তি** - এই সুবচন নির্বাসনে যাবে না। স্বার্থপরতা ত্যাগ করলেই কাজের ভালো-মন্দ গুণাগুণের বিশ্লেষণ এবং নিরূপণ সঠিক হবে। স্বার্থপরতা ত্যাগ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এটা Willforce-এর ব্যাপার। তাই, যে কাজ যখন করব, তা সিরিয়াসলি করব এবং তার মাধ্যমেই কর্তার কৃতিত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। এর জন্য মনের দৃঢ়তা এবং শ্রমই যথেষ্ট।

২৩. ভালো কাজ করার উপায়

প্রতিষ্ঠানকে আপন ভেবে সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে ট্রেনিং দিয়ে তাদের মধ্যে Sense of Belonging সৃষ্টি করে গোটা টিমের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারলে নির্বিঘ্নে ভালো কাজ করা যাবে এবং তাতে প্রতিষ্ঠান ভালো চলবে। এ কাজ করার দায়িত্ব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। ভোগ ছেড়ে ত্যাগ করতে পারলেই এটা করা সম্ভব। অপরদিকে, অধস্তনদেরও ঊর্ধ্বতনদের ভালো ও যৌক্তিক কথা শুনতে হবে, অর্ডার মানতে হবে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল যুক্তি দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা যাবে না। বস্ বা ঊর্ধ্বতন যেভাবে চাইবেন, সেভাবে কাজ করলেই বিতর্ক এড়ানো যাবে। ধৈর্য ধরে বসের কথা শুনতে হবে এবং যথাযথভাবে সেটা পালন করতে হবে। কোনো বিষয়ে বসের চেয়ে ভালো জানলে বা বুঝলে এবং সে মোতাবেক বসের অর্ডারে বা আদেশে কোনো দুর্বলতা বা ভুল আছে বলে মনে হলেও দৃঢ় ভাষায়, রুঢ় আচরণে তার প্রতিবাদী সমালোচনা করা সমীচীন নয়। বরং শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রেখে যুক্তি দিয়ে সুযোগ এবং সময় বুঝে সন্তর্পণে বসকে প্রকৃত ঘটনা বা সঠিক জিনিস সম্পর্কে জানাতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করা উচিত। মনে রাখতে হবে, আমি একাই শুধু প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসি না, বসও ভালোবাসেন। যদি দু'জনই ভালোবাসেন, তাহলে বিতণ্ডা হবে কেন? গন্তব্যস্থল যদি এক হয়, অর্থাৎ উভয়েই যদি প্রতিষ্ঠানের ভালো চান, তাহলে অভিন্ন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সমস্যা হবে কেন, পৌঁছানো অসম্ভব হবে কেন? হ্যাঁ, হতে পারে, যদি রাস্তা পৃথক হয়। তাই পার্থক্য ও বিভেদ ভুলে ধৈর্য ধরে সমঝোতার মাধ্যমে সমন্বয় করে চলা উত্তম। নিরপেক্ষ হলেই এটা করা সম্ভব। বস্ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে বসকে সতর্ক করার পরও তিনি না মানলে

অপকর্মের বিরুদ্ধে কৌশলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এরূপ অভিযোগের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং তার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। যাচাই-বাছাই করে তার সত্যতা নির্ধারণ করে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অভিযোগকারী মুখ্য নয়, অভিযোগটাই মুখ্য এবং বিবেচ্য। কোনো Perfect Management এরূপ করলে অর্থাৎ, গোপন খবরকে মূল্য দিলে দেয়ালেরও কান আছে ভেবে সবাই সতর্ক হবেন এবং তাতে প্রতিষ্ঠান খারাপ কাজকে প্রতিরোধ করতে পারবে। যেমন, একটা কথায় বলে **যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।** অর্থাৎ, যাচাই করলে তথ্যের গুরুত্ব বের হয়ে আসতে পারে।

অধস্তনদের সামনে ভালো থাকার নমুনা হিসেবে, ঊর্ধ্বতনদের কাজে স্বচ্ছ থাকতে হবে। যাতে Dubious হতে না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। পরিবেশ এমন হলে অধস্তনরা ভালো থাকার অনুপ্রেরণা পাবে এবং তখন তারা অধিক গুরুত্ব দিয়ে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে মনেপ্রাণে চেষ্টা করবে। একেই বলে আদর্শ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতভাবে আরও অধিক মনোযোগী হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং তার উপকার সবাই পাবে। সবার চাকরি বা কাজ স্থায়ী এবং সুদৃঢ় হবে। প্রতিষ্ঠানও দাঁড়িয়ে যাবে। এর ফলে কর্মীরা ভবিষ্যতে তাদের বংশধরকেও স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারবে। তাদের মাঝেই প্রতিষ্ঠান হাজার বছর বেঁচে থাকবে। তবে, প্রতিষ্ঠানকে সময় ও চাহিদা অনুযায়ী সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে রাখতে হবে। অপরদিকে, পুনরায় জোর দিয়ে বলি, অধস্তনদের মধ্যেও শেখার আগ্রহ, প্রত্যয়, পরিশ্রমী মনোভাব, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য ও সহনশীলতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি থাকতে হবে। কেবল তাহলেই কর্তৃপক্ষের শেখানোর উদ্যোগ সফলভাবে কার্যকর হবে। অর্থাৎ, '2 way Traffic' 'Win–Win Situation.' নিজেরা ভালো হলে সন্তানরাও ভালো হবে। কারণ আম গাছে আমই ধরে, তেঁতুল বা জাম নয়। কথায় বলে, **বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলেই পরিচয়।** তাই, স্থির বুদ্ধিতে আর প্রশান্ত মনে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিপদ মোকাবেলা করতে হবে, কাজ করে যেতে হবে। ধৈর্য হারিয়ে, রেগে, উত্তেজিত হয়ে শক্তি ক্ষয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিশ্বাস রাখতে হবে, **রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।**

প্রতিষ্ঠানকে যে ব্যক্তি নিজের ভাবতে পারবেন, তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতি হবে না। প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংক হলে ওই ধরনের মানুষের হাত দিয়ে ব্যাংকের কোনো খারাপ ঋণ হবে না এবং তিনি সজ্ঞানে ব্যাংকের কোনো ক্ষতি বা Malpractice হতে দেবেন না। নিজের টাকা অপরকে ঋণ হিসেবে দিতে এবং তা আদায় করতে মানুষ যে তৎপরতা চালায়, ব্যাংকের ব্যাপারেও তিনি তদ্রূপ

করবেন। আদায়ের কথা চিন্তা করে ঋণ দেয়ার সময়ও দেখেশুনে দেবেন, ভালোকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, এবং মন্দকে বিদায় দেবেন। তাতে তার হাতে ব্যাংক নিরাপদ থাকবে। সবার সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করে গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করবেন, সদা সজাগ থেকে তৎপর হয়ে কাজ করবেন এবং অধস্তনদের কাজ তদারক করবেন। তাতে তিনি ভালো থাকবেন, প্রতিষ্ঠানও ভালো থাকবে। তাই প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবার কোনো বিকল্প নেই। এই ভালো ভাবাই ভালো কাজ করার উপায়। এরূপ আন্তরিক উপলব্ধি ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশনামার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২৪. কোনো কাজই ছোট নয়

কাজকে ছোট বা বড় ভাবা মনের দৈন্য বা হীনম্মন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো ভালো বা ন্যায় কাজই ছোট নয়, আবার, কোনো খারাপ বা অন্যায় কাজই বড় নয়। কাজের ভালো-মন্দ নিরূপণ হয় তার ফল দিয়ে, আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন বা চমকপ্রদ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নয়। প্রত্যেক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটই আশা করে, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সবাই ট্রেনিংয়ে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং ভালোভাবে ট্রেনিং নিয়ে নিজ নিজ কাজে দক্ষ হবেন, স্বতঃস্ফূর্ত হবেন। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি শুধরে নেবেন। সঠিকভাবে কাজ করবেন। মনে রাখতে হবে, একটি কাজের একাধিক স্তর থাকতে পারে এবং একটি স্তরের কাজের সঙ্গে অপর স্তরের কাজের সম্পর্ক থাকতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কোনো একটি স্তরে কাজ কম হলে বা কোনো কাজ খারাপ বা ভুল হলে তা অন্য স্তরের কাজকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে। যেমন, ব্যাংকের কাজ সার্ভিস দেয়া। এই সার্ভিস দিতে, সুইপার থেকে প্রধান ব্যক্তি পর্যন্ত সবার কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কোনোটাই ছোট বা কম কাজ নয়। তাই সবাইকে নিজ নিজ অঙ্গনে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। আগেই বলেছি, চুরি করা, অন্যায় করা, কাজে ফাঁকি দেয়া, কারও মনে আঘাত দেয়া, কারও স্বার্থহানি করা এবং কারও সঙ্গে বেয়াদবি, বেইমানি করা ইত্যাদি কাজ নয়, অকাজ এবং তা পাপের। যারা অকাজ বা কুকাজ করে, তারা কিন্তু তাদের ওই অকাজগুলোকেও কাজ বলেন, যা সঠিক নয়। যারা চুরি-ডাকাতি বা খুন-খারাবি করে, তারাও বলে থাকে, অমুক জায়গায় একটা কাজ আছে, অর্থাৎ সে কাজটা হয়তো ওই পেশাদার চোর বা খুনির, চুরি বা খুন করার কাজ। তাদের এই কাজ, কখনই বৃহত্তর সুশীল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আসে না। আসলে ভালো **কাজে পাপ নেই, আছে পুণ্য**। পাপ-পুণ্য ধর্মের কথা। তাই তো **কর্মই ধর্ম**' এই বিষয়টি আমাদের মানতে হবে।

২৫. কাজ হালনাগাদ রাখার উপায়

কাজে নিয়মিত হতে হবে। সময়মতো সঠিকভাবে কাজ করে দিনের কাজ দিনেই শেষ করতে হবে। কোনো কাজ Pending রাখা যাবে না। 'No To-morrow' নীতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ, আগামীকালের জন্য ফেলে রাখা কাজ কালের গর্ভে বিলীন হতে কতক্ষণ? আজকের কাজ কাল করব বলে ফেলে রাখলে কাল অর্থাৎ পরের দিন কোনো জরুরি কাজ এলে, গতকালের পেন্ডিং কাজটি ফেলে ওই জরুরি কাজটি করতে হয়। আবার তৃতীয় দিনেও যদি দ্বিতীয় দিনের অনুরূপ ঘটনা ঘটে তাহলে চতুর্থ দিনে হয়তো আপনি প্রথম দিনের ফেলে রাখা কাজটি ভুলে যাবেন অথবা ইতোমধ্যে ওই কাজ সম্পাদনের সময়সীমা পার হয়ে যাবে। এতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে এবং এর দায়িত্ব আপনার ঘাড়েই পড়বে। তখন নিজে বাঁচার জন্য আপনি হয়তো ওই কাজ আপনাকে করতে দেয়া হয়েছে বা আপনি পেয়েছেন বলে অস্বীকার করার পথ খুঁজবেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডও উধাও করে দিতে পারেন। এতে প্রতিষ্ঠানের আরও ক্ষতি হবে। কারণ, প্রথম ক্ষতি হলো কাজটি হলো না। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, আপনার সততা চুরি হলো। তৃতীয় ক্ষতি, এই কুপ্রথা প্রতিষ্ঠানকে সংক্রমিত করল। কাজ পেন্ডিং রাখার খেসারত শুধু প্রতিষ্ঠান বা আপনাকে নয়, আমাদের সবাইকে দিতে হয়। কারণ তা সার্বিক উৎপাদনে ঘাটতি ঘটিয়ে সবার প্রাপ্তি কমায়। কে চায় বেশি শ্রম দিয়ে কম মূল্য নিতে? মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হলে আপনারও লাভ। তাই কাজ হালনাগাদ রাখতে Due Date Dairy এবং Things to do Today Note Pad ব্যবহার করতে হবে। যখন যে কাজ মনে আসবে তা সঙ্গে সঙ্গে নোট বইয়ে লিখে ফেলতে হবে এবং ওই নোট বইটি সব সময় সঙ্গে রেখে কাজ করার আগে দেখতে হবে। তাহলে কাজে ভুল হবে না। মোবাইলের সাহায্যে এটা করতে পারলে আরও ভালো। কারণ, তাতে Alarm Bell থাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য।

২৬. নীতির কঠোরতা ঝুঁকি কমায়

যেসব মানুষের মনের শক্তি এবং দক্ষতার ভিত্তি দুর্বল, তারা চাকরি হারানোর ভয়ে সদা সংকুচিত হয়ে থাকে। অহেতুক নানা অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে চলে, নীতি ভেঙে নত হয়ে। লাভের জন্য লোভী হয়ে অথবা ভীতু হয়ে অনিয়মের সঙ্গে সমঝোতা করে, আপাতত ভালো থাকতে চায়। তাদের ভয়, কঠোর হলেই ঝামেলায় পড়তে হবে, ক্ষতি হবে, চাকরি হারাব অথবা জীবন হুমকির মুখে পড়বে ইত্যাদি।' একটি প্রচলিত কথন বলে, **'নুনের' চেয়ে 'খুন' সস্তা**। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে এবং নির্দিষ্ট দিনে এবং ক্ষণেই তা হবে। অর্থাৎ মৃত্যু যেদিন, যেখানে, যেভাবে লেখা আছে, সেভাবেই হবে এবং

এটা হবেই। কেউ রোধ করতে পারেনি, পারবেও না কখনও; যত বড় পরাক্রমশালীই তিনি হন না কেন। নমরুদের কাহিনীই এ কথার প্রমাণ দেয়। তাই **কাপুরুষের মতো, মরার আগে বহুবার মরব না।** এরূপ ভীরু এবং দুর্বল মানসিকতা রুখে দাঁড়াব। সত্যকে ভয় করে দূরে সরে থাকা যাবে না, **ভয়কে জয় করতেই হবে।** মনে রাখতে হবে, **মিথ্যা বলতে সাহস লাগে, সত্য বলতে সাহস লাগে না, লাগে প্রত্যয়।** কোরআনে আছে, **সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকো না, জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।** তাই নিষ্ঠুর হলেও আমাদের প্রত্যেককে সব সময়ই এই বাস্তব বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। এছাড়াও, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে, হয়তো আজই আমার জীবনের শেষ দিন। এরূপ ভাবতে পারলে কেউ কখনও কোনো অন্যায়, দুর্নীতি বা মিথ্যাচার করতে পারবে না এবং কোনো কাজও অযথা বা আলস্য করে ফেলে রাখবে না। দিনের কাজ দিনেই সারবে। প্রত্যেকে আমরা এ নীতি অনুসরণ করলে সবারই মঙ্গল হবে। তাই একে অপরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব, নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে মনোযোগ দিয়ে কাজ করব। তাতে ঝুঁকি কমবে, চাকরি মজবুত হবে। অন্যায় করেও অযথা গলাবাজি করে বাজিমাত করব না, কাউকে করতেও দেব না। কারণ, এটা শঠতা এবং ধোঁকাবাজি। নিম্নস্বরে কথা বলব, এই মনে করে যে, নিঃসন্দেহে গাধার স্বর কর্কশ।

২৭. Attitude, Attires and Cleanliness

মনের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সুন্দর দেহ, পরিপাটি পরিচ্ছদ, ছিমছাম চলাফেরা, গোছানো কাজ, নরম মেজাজ, ভদ্র আচার, বিনয়ী আচরণ ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এখন সেই পর্বে যাওয়া যাক; কীভাবে সুন্দর থাকা যায়।

❖ সুন্দর থাকতে হলে এই প্রবাদটি মানতে হবে যে, **আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী।**

❖ কাজের উপযোগিতা এবং পরিবেশের প্রয়োজনে ভালো কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ড্রেস কোড মানতে হবে বা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ, পরিবেশ বুঝে পোশাক পরতে হবে। দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরের পেখম লাগানোর মতো পোশাক পরিধান যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

❖ কাজের সময়ে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ইউনিফর্ম পরতেই হবে। আইডি ব্যাজ লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইউনিফর্ম পরিধানে লজ্জা নেই, বরং আছে গর্ব। কারণ তা পরিচিতি দেয়, স্মার্টনেস বাড়ায়, ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তা আনে। ইউনিফর্ম এবং কাজ কখনও মানুষকে ছোট করে না। কারণ, কোনো ভালো কাজই ছোট নয়।

❖ সিনিয়রদের কাছে গেলে, বিনম্র ভঙ্গিতে, একটির ওপর আর একটি হাত সম্মুখে রেখে, নিচের দিকে ঝুলিয়ে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে। পেছনে দাঁড়ানো, পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়ানো, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো, দাঁড়িয়ে শরীর নাড়ানো বা অঙ্গভঙ্গি করা চলবে না। কারণ, তা অশোভন, অসম্মানজনক ও অসদাচরণমূলক।

❖ হাঁটা-চলায় সুঠাম হতে হবে (প্রতিবন্ধী না হলে)।

❖ কাপড়, জুতা ইত্যাদি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

❖ কথা বলা বা শোনার সময় বক্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, প্রথমে চোখে চোখ রেখে, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। মাথা নেড়ে বা মৃদু স্বরে বক্তাকে মাঝে মাঝে স্যার, স্যার, বলে তার কথা মনোযোগ সহকারে 'শোনা এবং বোঝা হচ্ছে' মর্মে তাকে অভয় দিতে হবে।

❖ অফিস সময় কাজের চেয়ারে ইজি চেয়ারের মতো হেলান দিয়ে আয়েস করে বসা যাবে না। চেয়ারে তোয়ালে ফিট করে বসা অশোভন।

❖ ফোন **ধরতে গেলে** হ্যালো বলে ধরা যাবে না। 'প্রথমে সালাম'; তারপর 'নিজের পরিচয় দেওয়া'; তারপর **কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি** বলে, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে-বুঝে-উত্তর দিতে হবে বা তার চাহিদা মোতাবেক কাজ করতে হবে।

❖ ফোন **করতে গেলে,** প্রথমে সালাম, তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হবে, 'আমি কি অমুকের সঙ্গে কথা বলছি বা বলতে পারি?' অর্থাৎ, ফোনের অপর পক্ষের ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে নিজের বক্তব্য শুরু করা যাবে না। সেটা আপনার জন্য অপমানজনক, আপনার গোপনীয়তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আবার অপরপক্ষের কারও জন্য তা বিরক্তিকর, আবার কারও জন্য সুখকর হতে পারে।

❖ কথা বলার সময়, ধীরে ধীরে, নিচু স্বরে, সংক্ষেপে কিন্তু টু-দি পয়েন্টে, প্রতিটা শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বলতে হবে, যাতে শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা না হয়। এমনভাবে বলতে হবে, যাতে শ্রোতাকে আপনার কথা বা বক্তব্য বোঝার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করতে না হয়। আপনার কথা পরিষ্কার, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত হলে শ্রোতার কাছে আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে এবং গুরুত্ব বাড়াবে। অন্যের কথার মধ্যে কথা বলা যাবে না, অবান্তর কথা বলা চলবে না।

❖ ফোনে সব সময় সংক্ষিপ্ত আলাপ করতে হবে। তাতে সময়, খরচ এবং এনার্জি সাশ্রয় হবে; কানের এবং ব্রেনের ক্ষতি হবে না। এতে নিজের, প্রতিষ্ঠানের এবং দেশের সম্পদের অপচয় রোধ করা যাবে। সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে, পৃথিবীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং তার মধ্যে আবার বাংলাদেশ, দীর্ঘ ফোন আলাপচারী। জানামতে, দেশে বর্তমানে প্রায় ৭ কোটি সেলফোন গ্রাহক

আছে এবং প্রতিজন ফোন বিল বাবদ মাসে গড়ে ন্যূনতম ৩০০ টাকা খরচ করে। তাদের এই ফোনের প্রয়োজন কতটুকু? নিশ্চয়ই ততটা নয়। তাহলে এতে কত পয়সার অপচয় হয় তা একবার ভেবে দেখুন। এটা অনেক বাবুকে আর্থিকভাবে কাবু করছে। এই সমষ্টিগত খরচ জাতীয় অপচয় ঘটাচ্ছে এবং তা কোম্পানির আয় হয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় অযথা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটু সতর্ক হলেই এই বাহুল্য ব্যয় কমানো যায়। এই টাকা দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়। এতে নিজের সাহস বাড়ে, দেশেরও পুঁজি বাড়ে। **যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।** সুতরাং অহেতুক ফোনালাপ করে অপচয় করব না, মিতব্যয়ী হব, দেশের অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করতে সহায়তা করব।

❖ রাস্তায় চলার সময়, গাড়ি চালানোর সময়, মোবাইল ফোনে কথা বলা বা গান শোনা যাবে না। এটা শুধু অপরাধই নয়, বরং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনকও বটে।

❖ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় কোনো ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অধস্তনের উচিত বিনয়ী সালাম দিয়ে নিজে ল্যান্ডিং স্পেসে নেমে বা উঠে তাকে যাওয়ার পথ করে দেয়া।

❖ অফিসের মধ্যে নীরবতা পালন করতে হবে। যতটা সম্ভব ইশারায়-ইঙ্গিতে এবং অতি নিচু স্বরে কথা বলে কাজ সারতে হবে। কাজের পরিবেশে এমনভাবে কথা বলে কাজ করব, যাতে পাশের লোকের মনোযোগ নষ্ট না হয়। তার মনোযোগ নষ্ট মানে তার কাজের ক্ষতি, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি, তাতে আপনার এবং আমারও ক্ষতি। স্থানীয় বিদেশি ব্যাংক এবং বহুজাতিক কোম্পানির মতো দেশি দফতরেও নীরবতা পালন করে চলা সম্ভব এবং এটা সার্বজনীন কল্যাণকর।

❖ অফিসের সুবিধাদি কখনই নিজের কাজে বা স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না। সঠিকভাবে পর্যাপ্ত কাজ করে অফিস সুবিধাদির সদ্ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ অফিসে বসে ব্যক্তিগত কাজ না করলে সততা, নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হবে। এতে প্রতিষ্ঠান লাভবান হবে এবং এর ফলে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার ঋণ পরিশোধ হবে। সময়মতো পর্যাপ্ত কাজ না করে সেই কাজ অতিরিক্ত সময় নিয়ে করে দেশের বিদ্যুৎ, অফিসের খরচ এবং জাতীয় সম্পদ অপচয় করব না।

❖ অফিসের কাজ, (ভেতরে এবং বাইরে) সংক্ষিপ্ত সময়ে, ন্যূনতম ব্যয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। দফতরের বাইরে কাজে গেলে ওই সময়ে নিজের অর্থাৎ ব্যক্তিগত কোনো কাজ করা অনুচিত। কারণ, ওই সময়টা কিন্তু কর্তার, কর্মীর নয়। তাই কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা যেন প্রশ্রয় না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

❖ অফিসের কাজে বাইরে গেলে, সেই কাজের সঙ্গে বসের ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে অফিসের মতো সমান গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। তা না হলে ওই কাজে বসের অধিকতর মূল্যবান সময় নষ্ট হবে এবং তা প্রতিষ্ঠানের Output কমাবে। এতে সবার ক্ষতি হবে। অধস্তনকে মনে রাখতে হবে, ঊর্ধ্বতনদের সাহায্য করাই তাদের কাজ। বসদেরকে মানসিকভাবে ফ্রি রাখতে পারলে তারা অফিসের জন্য আরও অধিক কাজ করতে পারবেন, যা সার্বজনীন কল্যাণকর হবে। অপরদিকে, ঊর্ধ্বতনদের বা বসদেরও মনে রাখতে হবে, অফিসের লোক দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কাজ করালে অফিসের অন্য কাজের সঙ্গে তা করাতে হবে। বিষয়টি বিতর্কিত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

❖ অফিসে মোবাইল ফোন সাইলেন্ট (Silent) মোডে রাখতে হবে এবং কাজের সময় ব্যক্তিগত ফোন ধরা বা করা যাবে না। কথা বলা তো দূরে থাক। কল-লিস্ট দেখে পরে প্রয়োজনে Call Back করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, Call Back করা কেবল ভদ্রতাই নয়, উপকারীও বটে।

❖ সুস্থ থাকতে হলে ধূমপান করা যাবে না, পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে। ভালো থাকতে হলে মিথ্যা কথা বলা যাবে না। সত্য বলতে হবে, সুপথে চলতে হবে। এসব বিষয়ের ব্যতিক্রমী নমুনা ধরে তদ্রূপ কাজ করা আত্মহত্যার শামিল। অর্থাৎ, কেউ যদি খারাপ কাজ করার পরও ভালো আছে বলে দেখা যায়, তার দেখাদেখি বা তার উদাহরণ দিয়ে খারাপ কাজ করা যাবে না। কারণ, খারাপ কাজে সুফল নয়, কুফল আসতে বাধ্য, দু'দিন পরে হলেও। যেমন, ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে বলতে হয়, ব্যাংক চলে ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং নীতিতে। অর্থাৎ, একটা ডেবিট হলে তার করসপন্ডিং ক্রেডিট হতেই হবে। ফলে কোনো জালিয়াতি হলে তা একদিন না একদিন ধরা পড়বেই, ভুয়া ডবল এন্ট্রি থাকলেও।

❖ আইন, নিয়ম ছাড়াও সব মানুষকে স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

২৮. প্রতিষ্ঠান চালাতে করণীয়

সবাইকে দেশের আইন মেনে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম পরিপালন করে চলতে হবে। নিজে নিরপেক্ষ হতে হবে। কাজের বিষয়ে অধস্তনদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করতে হবে। সবাইকে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দিতে হবে। বস হিসেবে তাদের কাজের ওপর পর্যাপ্ত Monitoring, Supervision রাখতে হবে। কোনো নতুন অনুশাসন বা নির্দেশনা পেলে বা দিলে, কাজ শুরু করার আগেই তার ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করে, সে সম্পর্কে সম্পৃক্ত সবাইকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে তার ব্যবহার পদ্ধতি তাকে দেখিয়ে দিতে হবে, যাতে অধস্তনরা সহজে কাজটি করতে পারে,

বোঝার ঘাটতির কারণে ওই কর্ম সম্পাদন বাধাগ্রস্ত না হয় এবং কর্মী বেকায়দায় না পড়ে।

ACR-এর ভয় দেখিয়ে বা ধমক দিয়ে জোর করে কাজ করানোর মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল কৌশল পরিহার করতে হবে। তবে কেউ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে প্রশাসনিক পদ্ধতির আওতায় তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া যাবে না। এসব ব্যাপারে কঠোর না হলে খারাপ কাজকে প্রশ্রয় দেয়া বা ইন্ধন জোগানো হবে, যা নিরাপদ নয়। এখানে একটি বাস্তব কথন প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যেমন- 'Cruel brutality always wins at every contest unless it is countered by the brutality equal to itself' - অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। Bankers' Wisdom কাজে লাগাতে হবে।

আইন সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে। আবারও বলি, আইনের সুবিধা ভোগ করতে হলে আইনকে মানতে হবে, দূরে রেখে বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না। আইনের ভেতরে ঢুকতে হবে। আইন সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে। জানার চেষ্টা করলেই জানা যাবে। এটা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। তাই এই প্রবাদের পুনঃউল্লেখ করে বলা যায়, 'Law is nothing but a Common Sense' ঊর্ধ্বতনরা, বেআইনি কাজ করতে বললে বিনয়ের সঙ্গে তাদেরকে আইন মানানোর চেষ্টা করতে হবে, যাতে অফিস-শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়। আপনার সততা-সিক্ত অহংকারের উচ্ছৃঙ্খল বহিঃপ্রকাশ যেন অফিসের পরিবেশ নষ্ট না করে। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বস্‌কেও সজাগ থাকতে হবে। বস উদাসীন হলে বা ন্যায়-নীতির ব্যাপারে উপেক্ষার ভাব দেখালে অধস্তনদের পক্ষ থেকে তা বিনয়ের সঙ্গে বসের নোটিশে আনতে হবে, যাতে অফিস-শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়। এরপরও মাঝেমধ্যে স্টাফদের যে মিটিং হবে সেই মিটিংয়ে অবশ্যই সবার অসুবিধার কথা অকপটে তুলে ধরতে হবে এবং বসও সে সুযোগ সবাইকে দেবেন। এরূপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বসের অপকর্মের সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার নিদর্শনসহ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কৌশলে জানাতে হবে, যা আগেও বলা হয়েছে। এমনটি করলে সবাই সজাগ হয়ে যাবে। দফতরের প্রতি সবার sense of belonging বাড়বে। তখন সবাই নিজেকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের/ দফতরের এক-একজন গর্বিত কর্মী হিসেবে ভাবার অনুপ্রেরণা পাবে এবং তাতে সবাই উপকৃত হবে। সবার সঙ্গে যোগাযোগ, সহমর্মিতা থাকবে। একে অপরের Watch-Dog হিসেবে কাজ করতে হবে; নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে, দফতরের সমষ্টিগত স্বার্থে। তাহলেই অফিস ভালো চলবে।

২৯. যৌক্তিক কথার যথাযথ মূল্যায়ন

অধস্তনকে বা অনুজকে ছোট বা নিচু ভেবে তাদের যৌক্তিক কথা, পরামর্শ বা প্রস্তাব ভেবে না দেখে অহমিকা করে বাতিল বা উপেক্ষা করা যাবে না। কারণ,

তার ওই কথা বা মতামত বা পরামর্শ ভুক্তভোগী হিসেবে, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূতও হতে পারে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Wearer knows, where the shoe pinches'। অর্থাৎ, অনুমানকারী অপেক্ষা অনুশীলনকারী ভুক্তভোগীরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর সম্পৃক্ত বিষয় সম্পর্কে অধিক ওয়াকিবহাল হতে পারে। স্তর-নির্বিশেষে, মানুষের কথার এবং কাজের মূল্যায়নের সুফলের সপক্ষে একটা অকাট্য বাস্তব উদাহরণ এই যে, বাংলাদেশ এবং সিঙ্গাপুর প্রায় একই সময়ে স্বাধীন হয়। কিন্তু সিঙ্গাপুর আজ কোথায় আর আমরা কোথায়! আমি গভীরভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাদের অফিস-আদালতে, এমনকি সরকারে Participatory Management-এর চর্চা সমাদৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি, তাদের কাণ্ডারি Lee Kuan Yew-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা সবাই ত্যাগী, সৎ এবং সিরিয়াস হয়েছে, ভালো কাজ করতে। অবশ্য আইনও সেখানে খুব কড়া। তাই তারা এত উন্নত। তর্কের খাতিরে, কেউ হয়তো বলতে পারেন, তাদের লোকসংখ্যা কম, তাই ম্যানেজ করা সহজ। কিন্তু এই যুক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কারণ, লোকসংখ্যাই যদি প্রতিবন্ধকতা হতো, তাহলে চীন সর্বাধিক জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশ হয়েও উন্নতি করে পৃথিবীর অর্থনীতির চাকার স্টিয়ারিং কখনও নিজেদের হাতে নিতে পারত না। আসলে তারা কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সবাই সিরিয়াসলি কাজ করে। যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতাকে তারা মূল্য দেয়, হোক না তা অধস্তনের কাছ থেকে। বিতাড়িত ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া ছোট-বড়'র মধ্যকার নিকৃষ্ট বৈষম্যের ভণ্ডামি বা নষ্টামি তাদের (চীনের লোকের) কাছে গুরুত্বহীন। তাই তো দুর্নীতিমুক্ত না হয়েও তারা এতদূর এগিয়েছে। যাহোক, Law of Diminishing Return-এর Theory অনুযায়ী, তাদের উন্নয়নেও হয়তো একদিন ভাটা পড়বে।

যাহোক অধস্তনের কথাও শুনতে হবে। অযৌক্তিক হলে যুক্তি দিয়ে, উপমা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ধমক দিয়ে নয়। ধমক দিলে তার কাছ থেকে আর কোনো পরামর্শ বা Information এমনকি কোনো সৃজনশীল কাজ পাওয়া যাবে না। কোনো সহযোগিতাও পাওয়া যাবে না। তিনি সংকুচিত হয়ে যাবেন। আবার বিদ্রোহী হয়ে ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাই এই অভ্যন্তরীণ সোর্সকে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না। কোনো তথ্য পেলে, তার ওপর পদক্ষেপ নেয়ার আগে অবশ্যই তার সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে। প্রতিরোধক হিসেবে, প্রয়োজনে আইনগত মতামত নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তাই আমাদের লিডার ম্যানেজার হতে হবে, বস ম্যানেজার নয়। Participatory Management-এর তৎপরতা বজায় রাখতে হবে। যৌক্তিকতাকে সমাদর করলে, মেনে নিলে, মিথ্যা ইগো পরিহার করা গেলে দফতর, প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করা যাবে। আসুন, আমরা তাই করি। ভালো কথার মূল্যায়ন করি।

আবার কাউকে প্রশংসা করলেও তার প্রতি অন্ধ হয়ে না থেকে তার ওপর নিয়ত নজর রাখি।

এই বইয়ের ৬টি অধ্যায়েই অনেক কথনের/বচনের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। জেনে-বুঝেই তা করা হয়েছে। এর কারণ একটাই - সব মুসলমান জানেন, নামাজের ওয়াক্ত কয়টি এবং সময় কখন কখন। তারপরও পাঁচবার আজান দেওয়া হয় নামাজে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। অনুরূপ উদ্দেশ্যেই এই বইয়ে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পুনঃঅবতারণা করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই ভুলে না যান, আত্মস্থ করেন, মানেন এবং ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ ঘটান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মের স্তরভেদে কর্মীর দায়িত্ব

১. কাজ এবং কাজের দর্শন

আসলে কাজ সৃষ্টিকর্তার হুকুম। কাজের অর্থ গতিময়তা বা সচলতা; অচলতা নয়। সৃষ্টিকর্তা কাজ করতে এবং চলতে হুকুম দিয়েছেন তার সব সৃষ্টিকে। তাই সবাই নড়েচড়ে, কাজ করে চলে স্ব-স্ব অঙ্গনে অনড় না থেকে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, সূর্য প্রতিদিন সময়মতো ওঠে এবং ডোবে, বাতাস থেমে থাকে না, নদী চলে নিরবধি, সমুদ্রের ঢেউ কখনও বন্ধ হয় না। আগুন পোড়ায়, পানি সে আগুন নেভায়, আবার কখনও সবকিছু ডুবিয়ে বা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, স্যান্ডি বা সুনামি হয়ে। এ সবই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা, প্রকৃতির খেলা। এই খেলাই প্রকৃতির কাজ। খেলা করানো সৃষ্টিকর্তার কাজ। খেলা মানুষেরও কাজ। তবে স্রষ্টার প্রতিটি খেলার যৌক্তিক এবং অর্থবহ কারণ আছে এবং সেটা হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। কিন্তু মানুষের খেলা কখনও আনে মানুষের অকল্যাণ।

এবার আসা যাক, প্রাণীজগতের কাজের উপমায়। এমন প্রাণী কি আছে যা নড়ে না? হয়তো নেই। প্রাণী জগতের এই সচলতা কিসের ইঙ্গিত দেয়? চলার, নড়ার। এই চলা এবং নড়াই তাদের কাজ। এ কাজের মধ্যেই তাদের জীবন। সৃষ্টিকর্তা একটা Recycling প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাণীজগৎকে চলতে নিবিষ্ট রেখেছেন। যেমন- তারা সবল ও সজীব Intake নেয়, আবার Output ছেড়ে দেয় বর্জ্য হিসেবে; যা সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে সরস উপাদেয় কাজে ফিরে আসে। অর্থাৎ, Waste to Wealth. স্রষ্টার এই অপূর্ব সৃষ্টির খেলা মহিমাময়তার ইঙ্গিত দেয়। এর মাধ্যমে তিনি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে কী ইঙ্গিত দেন? কাজ করার ইঙ্গিত। কোরানের প্রথম আয়াত, 'পড়'। এই পড়াও একটি কাজ। সৃষ্টিকর্তা একটা শক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার অপূর্ব এবং অসাধারণ। মানুষ মহাশূন্যে স্টেশন বানিয়েছে। সেখানে মানুষ থাকছেও, তবে অক্সিজেন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে। ওই জিনিসটারই অভাব সেখানে। অক্সিজেন সরবরাহ আল্লাহ্‌র হাতে, যার অভাবে মানুষ চলতে পারে না। এটাই মহাশক্তির প্রমাণ।

কাজ করতে উদ্যম লাগে, উদ্যোগ লাগে। যিনি উদ্যমী হয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাকে উদ্যোক্তা বলে। এখানে ভুল বুঝলে চলবে না যে, উৎপাদনমুখী কাজ না হলে উদ্যোক্তা হওয়া যায় না। আসলে, যে কোনো কাজে উৎপাদন থেকে শুরু করে বিক্রি এবং বিক্রয়োত্তর সেবা পর্যন্ত, সব কাজেই উদ্যোগ লাগে। তাই তো বলি, উদ্যমই উদ্যোগের অনুপ্রেরণা এবং কাজে উদ্যমী হয়ে যারা উদ্যোগ নেয়, তারা সবাই উদ্যোক্তা, যা আগেই বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত আরও বলি, সব মানুষ সমান নয়। পৃথক পৃথক মানুষের, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-চেতনা, ক্ষমতা এবং দক্ষতা দিয়েই সবাই উদ্যোক্তা হতে পারে। তাই এই উদ্যোক্তাকে বা Entrepreneure-কে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১.	কারিগরি উদ্যোক্তা	(Technical Entrepreneure)
২.	সুযোগসন্ধানী উদ্যোক্তা	(Opportunist Entrepreneure)
৩.	উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা	(Creative Entrepreneure)
৪.	অনুকরণীয় উদ্যোক্তা	(Copying Entrepreneure)

যার যেদিকে আগ্রহ এবং দক্ষতা সে সেই লাইনে উদ্যোগ নিয়ে উদ্যমের সঙ্গে কাজ করলে তাতেই কৃতকার্য হতে পারে। বসে থাকলে চলবে না। অর্থাৎ, হাতের পাঁচ আঙুলের মধ্যে কনিষ্ঠতম আঙুলের গ্রুপে নিজেকে ফেললেও ওই আঙুলের শীর্ষে ওঠার জন্য উদ্যমী হয়ে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করতে হবে। উদ্যমী হওয়ার পক্ষে কবির একটা উক্তি এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। যেমন, **আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, কর্মী হওয়ার শিক্ষা আমি বায়ুর কাছে পাইরে**। তাই, প্রকৃতির দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, সবাই কাজ করে, কাজ করছে এবং সৃষ্টিকর্তা সবাইকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। তাই কাজের বিকল্প নেই। বসে খাওয়া যাবে না। বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারেও কুলায় না। তাই পুনরায় একটি কথনের উল্লেখ করে বলি, **কর্মই ধর্ম** এই মর্মবাণীই হোক আমাদের কাজ করার অনুপ্রেরণা, উদ্যোগ নেয়ার শক্তি। আসুন, আমরা কাজ করি, ভালো থাকি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

কর্মবিন্যাস এবং কর্ম বিভাজন সফল কর্ম পরিচালনার শক্ত হাতিয়ার। তাই সব প্রতিষ্ঠানেই কর্মীর স্তরভেদে তাদের মধ্যে দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ এবং বণ্টন করা হয়ে থাকে। এতে অধিক উৎপাদনের সুফল পাওয়া যায়। গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন কারিগরের একটি স্যুট সেলাই করতে যতটুকু সময় লাগবে, ওই একই সময়ে ৫ জন লোক স্যুটের পৃথক অংশ পৃথকভাবে তৈরি করলে হিসাব করে দেখা যাবে, একই সময়ে আনুপাতিক হারে

অপেক্ষাকৃত বেশি কাজ হয়েছে। অর্থাৎ ওই একই সময়ে পাঁচটির অধিক সংখ্যক স্যুট তৈরি হয়েছে। এতে খরচ সাশ্রয় হবে। তাই অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে কর্মীদের মধ্যে স্তরভেদে দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। স্তরবিশেষ দায়িত্ব জানার আগে চাকরির দায়িত্ব কী তা জানা দরকার। চাকরি কী এবং কর্মী কী তা আগে বলা হয়েছে। চাকুরেদের দায়িত্ব হচ্ছে, নির্ধারিত কাজ নির্দেশিত পন্থায় বা প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, মনোযোগ দিয়ে সময়মতো করা এবং তাতে পরিমিত শ্রম দেয়া। এরূপ করতে প্রতিজ্ঞা লাগে যা সৃষ্টি হয় মন থেকে, বোধোদয়ের মাধ্যমে। এই বোধোদয়ই দায়িত্ব এবং এই দায়িত্বই মানুষকে কর্তব্য শেখায়।

২. কর্মক্ষমতা

কর্মক্ষমতা বলতে কাজ করার প্রবণতা এবং পারদর্শিতার যুগ্ম বা যৌথ প্রয়োগের ফলকে বুঝায়। অনেকের কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকে। কিন্তু কাজ করার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং নিয়ম-কানুন ইত্যাদি না জানার কারণে তিনি সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন না। অপরদিকে, পারদর্শিতা বা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও অনেকে কখনও কখনও পর্যাপ্ত কাজ করে না বা করতে চায় না। কারণ তারা কাজে অনীহ। কাজ করার অনীহা বা না করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় কর্মীর ব্যক্তিগত স্বার্থপর চিন্তার হীন এবং সংকীর্ণ মোহ থেকে। কখনও কখনও অধস্তনরা সুচতুরভাবে প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অপরিহার্য হিসেবে তৈরি করে স্ব স্ব বসকে ডোমিনেট করে তাদের পছন্দমতো চলতে চায়। এর ফলে তাদের ওপর বসের বা ঊর্ধ্বতনদের তদারকি হ্রাস পেয়ে কাজ পেন্ডিং হয়। কখনওবা ভুলে কোনো কোনো কাজ বাদ পড়ে যায়, কখনওবা খারাপ কাজ হয়। যাতে উৎপাদন হ্রাস পেয়ে সব স্টেক হোল্ডারের প্রাপ্তি কমায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কথিত অপরিহার্যতা বিশ্বাসের খোলসে ঢেকে যায়, কর্তৃপক্ষকে অন্ধ বানায়। কর্তৃপক্ষের সেই অন্ধত্ব, ওইসব মুষ্টিমেয় দুশ্চরিত্র কর্মীর মধ্যে লোভ এবং দুঃসাহসী আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে জালিয়াতি করতে ইন্ধন জোগায়।

কথিত অপরিহার্য লোকেরা সংকীর্ণমনা হয়ে তাদের কাজ অন্যকে শেখায় না। অর্থাৎ, তাদের অঙ্গনে অন্যকে ঢুকতে দেয় না। পাছে তাদের দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যায় বা তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সময়ে সময়ে যেসব জালিয়াতি হয় তার অধিকাংশের কারণ এই অশুভ কর্মতৎপরতা। এরূপ অতি চালাক ব্যক্তিরা তাদের কথিত দুষ্কর্ম দিয়ে শুধু প্রতিষ্ঠানকেই ডুবায় না, নিজেরাও ডোবে। যেমন- চাকরি হারায়, জেল খাটে,

জরিমানা দেয়, সমাজে এবং পরিবারে মুখ খোয়ায়। তাদের সন্তান এবং স্বজনরাও তার জন্য বাইরে মুখ দেখাতে পারে না। এ এক অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি।

ক্ষমতার কথিত অপব্যবহার এবং কুফল থেকে প্রতিষ্ঠানকে এবং সব বিপথগামী কর্মীকে বাঁচাতে হলে বা তাদের সঠিক পথে রাখতে হলে যা করা আবশ্যক তা নিম্নরূপ :

ক) ঊর্ধ্বতনদের করণীয়

❖ কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করা (তবে ভালো ব্যবহার দিতে হবে)।

❖ কারও অপরিহার্যতা সৃষ্টি হতে না দেয়া।

❖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবাইকে সব কাজ শিখিয়ে প্রতিষ্ঠানে ডিফেন্স লাইন সৃষ্টি করা।

❖ ঘন ঘন Job Rotation করা।

❖ সব অধস্তনের কাজের ওপর, চলন-বলনের ওপর সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা, যাতে Living Beyond Means হলে বোঝা যায়।

❖ ইচ্ছাকৃত ভুল চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া বা গ্রহণ করা।

❖ নিয়মিত স্টাফ মিটিংয়ে প্রত্যেকের ভুলের ওপর আলোচনা করা, ভুল সংশোধন করা এবং ভুল এড়িয়ে চলার প্রতিশ্রুতি নেয়া বা দেয়া।

❖ বস হয়ে নিজে কোনো অন্যায়, দুর্নীতি বা বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।

খ) অধস্তনদের করণীয়

❖ ঊর্ধ্বতনদের ভক্তি সহকারে মনেপ্রাণে স্থান দেয়া।

❖ ঊর্ধ্বতনদের আদেশ-নির্দেশ মনেপ্রাণে মেনে চলা।

❖ কাজের সময় মনোযোগ দিয়ে সততার সঙ্গে পর্যাপ্ত কাজ করা।

❖ বসদের খারাপ কিছু দেখলে বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত বা সমালোচনা শুনলে তা বসকে বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সন্তর্পণে জানিয়ে দেয়া। জানানোর পরও সংশোধন না হয়ে পুনরাবৃত্তি করলে বিকল্প পন্থায় ঊর্ধ্বতন অফিসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। কারণ ব্যাংক রক্ষা করার দায়িত্ব সবার।

গ) পরিবারের করণীয়

❖ গুরুজনদের ভক্তি করা, মেনে চলা।

❖ সন্তান, স্ত্রী এবং পরিবারের সবার উচিত, প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি এবং অভিভাবকের সঙ্গে স্বচ্ছ এবং সৌজন্যমূলক আচরণ করা।

❖ অভিভাবকের সঙ্গতির দিকে খেয়াল রেখে নিজেদের চাহিদাকে পরিমিত প্রাধান্য দিয়ে পেশ করা, যাতে তার ওই সীমিত সৎ উপার্জন হতে সবার প্রয়োজনকে পরিমিত প্রাধান্য দিয়ে মেটানো সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে পরিবেশের কুপ্রভাবে পড়ে বা লোভে পড়ে অসম প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে নিজেদের চাহিদা না বাড়ানো, যাকে ইংরেজিতে বলে Variable না বাড়ানো।

❖ অভিভাবক তার আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো জিনিস পরিবারের বা বাসার জন্য আনলে পরিবারের পক্ষ থেকে তার উৎস জানতে চাওয়া এবং সন্তোষজনক না হলে ওই জিনিস বা গিফট যা-ই হোক না কেন, তা খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করা।

❖ অভিভাবক হিসেবে পরিবারের সবার ন্যায্য চাওয়া-পাওয়ার দিকে খেয়াল রাখা এবং তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া। শুধু টাকা-পয়সা দিলেই চলবে না।

❖ ভালো সমালোচনা করা এবং ভালোকে অনুসরণ করতে শেখানো।

❖ আবার অনুজরাও কখনও পরিবারের জন্য বিসদৃশ্য কোনো কাজ করলে সন্তর্পণে তার বিরোধিতা করা।

দেয়ালের শুধু কান নয়, চোখও আছে– এই চরম সত্য ওপরের ক, খ এবং গ গ্রুপ মেনে চললে এবং প্রতিষ্ঠানকে বা নিজের সংসারকে প্রকৃতই নিজের ভাবতে পারলে কর্মক্ষমতা সঠিক পথে এগোবে। এতে নিজে ভালো থাকা যাবে এবং পরিবারকে ও প্রতিষ্ঠানকে ভালো রাখা যাবে। আসুন, আমরা সবাই তাই করি।

৩. কর্মীর দায়িত্ব

এ সম্পর্কে আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, কর্মীর দায়িত্ব কাজ সংগ্রহ করা, কাজ সৃষ্টি করা এবং তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। তা না করতে পারলে সিনিয়রদের নৈকট্য পাওয়া যায় না। তাই প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে কাজ চেয়ে নেয়া, যাতে কোনো সময় অযথা বসে থাকতে না হয়। শুধু একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, অফিসের সময়-এ অর্থাৎ প্রতিদিন অফিস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে আমার সার্ভিস আমি আমার দফতরের বা প্রতিষ্ঠানের কাছে

বিক্রি করে দিয়েছি। বিক্রীত জিনিসের ওপর বিক্রেতার কোনো অধিকার থাকে না। তাই ভাবতে হবে, আমার ওই বিক্রি করে দেয়া সময়ের ওপর অর্থাৎ বিক্রীত জিনিসের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। অতএব, ওই সময়ে অর্থাৎ অফিসে বা অফিসের সময়ে অফিসে বসে বা অফিসের বাইরে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোনো কাজ করা যাবে না; নিজের বা পরিবারের কারও সম্পর্কে কিছু ভেবে অফিসের সময় নষ্ট করা যাবে না। যারা অফিস সময়ে অফিসের কাজ বাদ দিয়ে নিজের কাজ করবে তাদের কাছ থেকে অফিস পর্যাপ্ত কাজ পাবে না। অফিসে বসে অন্য কিছু ভাবলে অফিসের কাজ কম হবে এবং সেই কম কাজ করে যখন পূর্ণ পারিশ্রমিক বা পয়সা নেয়া হবে, তা হালাল হবে না। হালাল না হলে তাতে বরকতও হবে না। অর্থাৎ দুশ্চিন্তা, অভাব, অশান্তি, ভোগান্তি এবং বিপদ ইত্যাদি লেগেই থাকবে। তাই রুটি আমাদের হালাল করেই খেতে হবে। অসৎ রোজগার অযথা সংকট বাড়ায়। অসৎ রোজগারে তৈরি রক্ত দূষিত হবে। যারা এ রক্তের ধারক হবেন তারাও অসৎ হবেন, দুর্নীতি করবেন এবং তার দায়-দায়িত্ব, উপার্জনকারীকেই বহন করতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, অন্যায় করে জেলে গেলে বা শাস্তি পেলে তার দায়িত্ব কেউ এমনকি নিজ সংসারের কেউও নেয় না। সবাই বলে, তোমাকে কি অন্যায় করতে বলা হয়েছে? তোমার দায়িত্ব সৎ রোজগার করে আমাদের খাওয়ানো। তাই তোমার এই পাপের বোঝা তোমাকেই বহন করতে হবে। কেয়ামতের পরও এরূপই হবে। কেউ কাউকে চিনবে না, সাহায্য করবে না। নিজের হিসাব নিজেকেই দিতে হবে। দুনিয়ার খারাপ কাজের জন্য জেলে যাওয়ার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা এই স্বর্গীয় অনুশাসনেরই একটা প্রকৃষ্ট নমুনা বা উদাহরণ।

৪. বসের বা ঊর্ধ্বতনের কর্তব্য

এ সম্পর্কে বলতে গেলে একটু ভূমিকা দেয়া দরকার। যেমন, এই পুস্তক লেখার সময় অধস্তন কর্মীদের কাছ থেকে একটি পরামর্শ আমার কাছে আসে। যথা– 'আমাদেরকে ট্রেনিং দেয়ার আগে বসদের ট্রেনিং হওয়া উচিত। তাহলে তারা সঠিকভাবে চলবেন এবং মেন্টর হিসেবে আমাদেরকে মনিটর করতে পারবেন এবং তাতে আমাদের কাজ সহজ হবে।' আমরা সিরিয়াস হব এবং আমাদের জন্য সেটা অবশ্য করণীয় হবে। তাদের এই প্রস্তাব আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। এ ব্যাপারে আরও একটা যুক্তি আমাকে প্রণোদিত করল এভাবে, সব মানুষেরই ট্রেনিং প্রয়োজন। পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় অহরহ যে পরিবর্তন বা উন্নয়ন ঘটছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন নতুন বিষয় এবং পদ্ধতির ওপর অবশ্যই সবার ট্রেনিং হওয়া দরকার। শুধু দক্ষতাই নয়, বৈষয়িক, সামাজিক এবং মানবিক অঙ্গনে, অহরহ যে পরিবর্তন ঘটছে, তার ওপরও ট্রেনিং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেমন- আগে আমরা দেখেছি কড়া শাসন। কিন্তু এখন দেখছি শাসন কিছুটা নরম হয়েছে এবং অনেক অনুশাসনও শিথিল হয়ে এসেছে। যতটুকু আছে তা আমাদের মেনে চলা আবশ্যক। তবে তা ঠিকমতো হচ্ছে না। এ ব্যাপারে উভ-সম্মতি থাকতে হবে - শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে। অর্থাৎ প্রশাসক এবং তার অঙ্গনের অধস্তনদেরও একমত হতে হবে। মোটিভেশন করে যে কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করানোর জন্য তাদের মধ্যে অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। Devotion দিতে হবে। যারা মোটিভেশন করবেন, তাদেরও সৎ এবং নিরপেক্ষ হতে হবে। অর্থাৎ, কিছু করার জন্য অন্যকে নির্দেশ দিলে নিজেকে মনেপ্রাণে তা মানতে হবে এবং প্রয়োজনে করে দেখিয়ে দিতে হবে। নিজের লোকদেরকে দিয়ে তা মানাতে হবে। তবেই দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা হবে। হুকুম দিয়ে Done ভেবে বসে থাকলে চলবে না। Done-এর End Use দেখতে হবে। এরূপ ব্যবহারিক ট্রেনিং করানোর নামও ট্রেনিং।

এবার আরও খোলাখুলিভাবে বসের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের পর্বে আসা যাক। বসের কর্তব্য কী, দায়িত্ব কী, বা বস কেমন হওয়া উচিত, কীভাবে বসের চলা উচিত সেটাই এখানে প্রধান উপপাদ্য বিষয়। আসলে বসের প্রধান দায়িত্ব ২টি, ১) কাজ নির্ণয় করা ২) নির্ণীত কাজ সঠিকভাবে সময়মতো করা এবং করিয়ে নেয়া। কাজ যাদেরকে দিয়ে করাবেন তারা সাহায্যকারী বা Associate. তাদেরকে Motivate করে শিখিয়ে কাজ করাতে হবে। তাহলেই সে কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে।

কাজ সম্পাদনের জন্য কাজের পরিধি বা পরিমাণ ভেদে বিভিন্ন মানের সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। কারণ, কোনো মানুষের সীমিত/পরিমিত ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহায্যকারীরা মূলত অধস্তন। যাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ওপরের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। মূলত কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন উভয়েরই গুরুত্ব এবং দায়িত্ব অপরিসীম। একটি ছাড়া অপরটি চলে না। তাই উভয়ের মধ্যে সমতা এবং সমঝোতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কের হুকুমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলে। তেমনি উর্ধ্বতনদের হুকুমে অধস্তনদের চলা উচিত। উর্ধ্বতন ও অধস্তনের সমতায়, সমঝোতায় এবং সমন্বয়ে ঘাটতি থাকলে, ব্যত্যয় ঘটলে কাজ হবে না। হলেও ভালোভাবে হবে না। কাজ ভালোভাবে না হলে তার ফল ভালো হবে না এবং তাতে ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন উভয়ের লোকসান হবে। অর্থাৎ, যে পয়সার জন্য কাজ করা হয় সেই পয়সা পর্যাপ্ত পাওয়া যাবে না। পয়সা না পাওয়া গেলে কর্মীরা চলবে কী করে? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন উভয়কেই একে অপরের পরিপূরক হয়ে, ভালোভাবে কাজ করতে হবে। তবে অধস্তনদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঊর্ধ্বতনরা কাজ সৃষ্টি করে না দিলে অধস্তনরা কাজ পাবে না। তাই অধস্তনদের অবশ্যই অধিক নমনীয় হয়ে, সহনশীল হয়ে বসের সঙ্গে

মিলেমিশে কাজ করতে হবে। কাজ না করে বা কাজ কম করে, চাঁপাবাজি এবং গলাবাজির আশ্রয় নিয়ে, কাজের ঘাটতি পূরণের অসৎ চেষ্টা করা যাবে না। হাত চালাতে হবে, কাউকে মারতে নয়, ভালো কাজ করতে। অর্থাৎ কথা কম বলে কাজ বেশি করতে হবে। বসের কথার বিপরীতে পাল্টা কথা বলা যাবে না; যত শক্ত যুক্তিই থাকুক না কেন। তবে বস কোনো প্রশ্ন করলে তার চটজলদি সদুত্তর দিতে হবে। এমন সৎ আচরণ করলে বসের মাথা এবং মেজাজ ঠিক থাকবে। তার চিন্তায় খেই থাকবে। তখন বস সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করে অধস্তনদের জন্য অধিক ফলদায়ক কাজ সৃষ্টি করে দিতে পারেন।

যিনি বস হবেন তার মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাবলি অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন, চরিত্রে সততা, মনোমুগ্ধকারী পারস্পরিক আচরণ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রজ্ঞা, দক্ষতা, সহনশীলতা, ক্ষমতা ইত্যাদি। আর এগুলোর সমন্বয়ে বসের যা যা করা দরকার তা হলো নিম্নরূপ :

১. যথাসম্ভব সব বিষয়ে খোঁজখবর রাখা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

২. সবার মধ্যে পর্যাপ্ত কাজের সুষম বণ্টন।

৩. কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মীকে পরিমিত সময় দেয়া।

৪. কাজের সহায়ক সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা।

৫. অধস্তনদেরকে কাজ ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া এবং কাজের ব্যাপারে তাদের কোনো যৌক্তিক পরামর্শ থাকলে তা আমলে নেয়া।

৬. অধস্তনদের অযথা অহরহ ধমক না দেয়া।

৭. অধস্তনদের কাজের ওপর নিবিড় তদারক রাখা এবং তারা কাজ করতে কোনো অসুবিধা বোধ করলে তাদেরকে সাহায্য করা। মনে রাখতে হবে, কাজ করে দেখিয়ে দেয়ার মতো অগ্রজের সহানুভূতিশীল আচরণ অনুজের কাছে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।

অধস্তনদের ওপর অস্পষ্ট হুকুম জারি করে তা সম্পাদন করার জন্য চাপ দিলে কাজ হবে না। কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময়ের আগে কাজ চাইলে তাও পাওয়া যাবে না। কর্মীর অনীহার কারণে কাজ সমাপনে দেরি হলে প্রথমে বসকে অধস্তনের সেই কাজ করতে সহযোগিতা করতে হবে। প্রয়োজনে তার টেবিলে বসেই সম্পূর্ণ কাজটি নিজ হাতে করে দেখিয়ে দিতে হবে। তাহলে অধস্তন বুঝবেন বস কাজ বোঝেন, জানেন। তাই তাকে কোনো কাজে ফাঁকি দেয়া যাবে না এবং এতে তিনি (অধস্তন) সিরিয়াস হবেন। তবে নিতান্তই খারাপ, বেয়াদব এবং অনীহ অধস্তনকে আবার ছাড় দেয়াও যাবে না। তার বিরুদ্ধে উপযোগী নিরপেক্ষ প্রশাসনিক এবং প্রয়োজনে আইনগত বা বিচারিক ব্যবস্থা নিতে হবে। এমন আচরণ করলে অধস্তনরা বসকে ভয় পাবে, ভক্তিও করবে। নিয়মের প্রতি, আইনের প্রতি, ভয়ে হলেও শ্রদ্ধাশীল হবে। যেমনটি উন্নত বিশ্বে হয় এবং এভাবেই ঊর্ধ্বতনরা অধস্তনদের Respect & Confidence Command করতে পাবেন।

বস হয়ে কোনো কাজ না জানলে, জানার ভান করে মেজাজ দেখানো বা ধমক দেয়া যাবে না, শিখে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিখতে লজ্জা নেই। শেখার সময় দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। অধস্তনের কাছ থেকে কাজ শিখতে লজ্জা নেই। শেখা হয়ে গেলে জীবনে আর কখনও কারও কাছে মাথা হেঁট করতে হবে না। কোনো ব্যক্তিগত কাজ, অধস্তনদের দিয়ে করাতে হলে তাকে বলতে হবে, 'আমি কি আপনার কাছ থেকে একটু সহযোগিতা পেতে পারি (Can I ask a small favour from you?)' তাহলেই অধস্তন বিনয়ী হয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বসের সেই কাজ করে দিয়ে তৃপ্তি পাবে। তবে বসকে অবশ্যই অধস্তনদের ব্যক্তিগত ভালো-মন্দের সঙ্গে Deeply Concern হতে হবে। বিপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ বসকে ভোগ ভুলে, ত্যাগ স্বীকার করে যথার্থ Leader হয়ে কাজ করতে হবে, তাহলেই সম্পর্ক ভালো থাকবে। মনে রাখতে হবে, 'সুসম্পর্ক' ভালো কাজের এবং ভালো পরিবেশের নিয়ামক।

৫. সময়ানুবর্তিতা

প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা এবং তার উন্নতির জন্য সময়ানুবর্তিতা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সময়ানুবর্তিতার প্রতি আগ্রহী, মনোযোগী ও অনুগত এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ শুরু করতে হবে। শুরু করার প্রথা হিসেবে প্রতি কর্মদিবসে কর্মীকে যথাসময়ে অর্থাৎ অফিস শুরু হওয়ার কমপক্ষে আধা ঘণ্টা আগে কর্মস্থলে হাজির হয়ে নিজেকে Settle করতে হবে। তারপর সুস্থ হয়ে কীভাবে কাজ শুরু এবং কিভাবে শেষ করবেন তা প্রথমেই নির্ধারণ করে নিয়ে সেভাবেই কাজ শুরু করতে হবে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় দেখতে হবে, যাতে নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি কাজ শেষ করা যায়। যেমন, পরীক্ষায় প্রশ্নের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দিতে হয়। এভাবে কাজ করলে সময়ের অপচয় হবে না, প্রতিটি মিনিটের মূল্য পাওয়া যাবে। অফিসে দেরিতে পৌঁছার কারণ হিসেবে ট্রাফিক জ্যাম বা অন্য কোনো রকম অজুহাত দেখানো চলবে না। কারণ, ট্রাফিক জ্যাম নতুন কোনো বিষয় নয়; এটা অফিসের সমস্যাও হতে পারে না। এ সমস্যাটা আমাদের যার যার নিজের। সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের সব সমস্যা নিজের দায়িত্বে নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. সময় ব্যবস্থাপনা

জোর দিয়ে বলি, টাইম ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ট্রাফিক জ্যামের মতো চলমান প্রাত্যহিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি ম্যানেজ করে কাজ কীভাবে করতে হবে সেটা

অফিসারদেরই ভাবতে হবে এবং সে মোতাবেক Strategy-ও নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ, এটা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এটা অফিসের দেখার বিষয় নয়, যা আগেই বলা হয়েছে। অফিসকে দুর্বল ভেবে তার ঘাড়ে সময়ক্ষেপণের বা অপচয়ের বোঝা চাপানো যাবে না। আমার ভুলে অফিস Suffer করবে এটা হতে দেব না। গ্রাহক ব্যাংকারের আগেই ব্যাংকে এসে হাজির হয়ে ব্যাংকারের অনুপস্থিতির কারণে সেবা পাবে না এটা ভয়ঙ্কর লজ্জার, অপমানের এবং তা সবার জন্য ক্ষতিকরও বটে। আবার, এভাবে বলা যায়, গেস্ট হোস্টকে রিসিভ করার মতো পরিস্থিতি লজ্জাকর, এবং হোস্টের জন্য তা অপমানজনক। এরূপ পরিস্থিতি হলে গ্রাহক নীরবে অন্য ব্যাংকে চলে যাবে। কারণ, প্রশস্ত এবং খোলা প্রতিযোগিতার বাজারে এ সুযোগ সবার জন্য অবারিত। কথিত কারণে গ্রাহক কমতে থাকলে আমরা ব্যবসা হারাব। এতে প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি হবে, তার অংশ আমাদের ঘাড়েই বেশি করে পড়বে; বোনাস কম হবে, হচ্ছেও।

অপরদিকে, গ্রাহকের অনুকূলে বলতে গেলে বলতে হয়, পছন্দমতো ব্যাংকে আসা এবং সেখান থেকে ভালো সার্ভিস পাওয়া গ্রাহকদের মৌলিক অধিকার। সেটা না পেলে তা আদায়ের জন্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থাৎ এর কর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণ করলেও ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাদের কিছুই বলার থাকবে না। কারণ, গ্রাহকরা আমাদের মনিব। কর্মচারীর দুর্ব্যবহারে মালিক ঘর ছাড়বে এটা কখনও হতে পারে না। এভাবে প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকারের কারণে সব গ্রাহক নীরবে অভিমান করে ব্যাংক ছেড়ে চলে গেলে ব্যাংকাররা অর্থাৎ কর্মীরা পানি ছাড়া মাছ হয়ে যাবে, শুকনা ডাঙায় ছটফট করে লাফাতে লাফাতে মরবে। অতএব, কাস্টমারকে নয়, প্রয়োজনে ব্যাংকারকেই প্যাক করতে হবে অর্থাৎ ঘর ছাড়তে হবে। তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, আমাদের অসদাচরণের কারণে যেন কোনো গ্রাহক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে না যায়। তার ফলে আমাদেরকে ঘর ছাড়তে না হয়। তাই সুফল পেতে সময়ের কাজ সময় থাকতে করতে হবে। সময় কারও জন্য অপেক্ষা না করে তার কাজ সে নিজের মতো করে করে ফেলবে। অর্থাৎ সময় চলে যাবে এবং আমরা ওই কাজ করার সুযোগ হারাব। তাতে আমাদের ক্ষতি হবে, প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষতি হবে।

৭. কাজে ফাঁকি দেয়ার খেসারত

যারা কাজে ফাঁকি দেয় তারা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে, দেশের ক্ষতি করে। এতে তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সেটা তারা বোঝে না, বুঝলেও আমলে নেয় না। তারা Penny wise Pound foolish মনে করে। তাই বলে প্রতিষ্ঠান কি ওই সব

সহ্য করে নীরবে বসে থাকবে? অবশ্যই না। আয় না থাকলে সায় পাওয়া যায় না, কেউ পাত্তা দেয় না, বাঁচার ঠাঁই মেলে না। প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসঙ্গত অধিকার আছে বাঁচার এবং টিকে থাকতে চেষ্টা করার। এই বাঁচার জন্য গা ঝাড়া দিয়ে ওঠারও প্রয়োজন রয়েছে তার। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা অনীহ বা দুর্বল কর্মীর জায়গায় অপেক্ষাকৃত কম পয়সায় অধিক কর্মঠ লোক সহজেই নিয়োগ দেবে, দিতে পারে, দেয়াও অনুচিত নয়।

কারণ, এটা গ্রাহকের বা মালিকের অধিকার। এ কাজ প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য সহজতর এবং অধিক Cost Effective। তাই তারা মনে করে, যেসব লোক কাজ করে না, ফাঁকি দেয় বা কম কাজ করে তাদেরকে আগাছা হিসেবে চিহ্নিত করে নিড়ানি দিয়ে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দেয়াই হবে উপযোগী কাজ। কারণ, শস্যে পোকা-মাকড়ের অত্যাচার বা ক্ষতি রোধ করার জন্য ব্যবহৃত কীটনাশকের মতো, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি রোধ করতে এই নিড়ানি সহায়তা করে। এরূপ করলে যারা নির্বোধ বা শঠ, অপরিণামদর্শী এবং ফাঁকিবাজ কর্মী, তারাই প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ভালোরা টিকে যাবে। তবে এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে সাবধান হতে হবে, নিরপেক্ষ হয়ে সজাগ থেকে কাজ করতে হবে, যাতে সহনশীল বা দক্ষ কর্মীরা কোনোভাবেই আগাছা হিসেবে নিড়ানির কোপে না পড়ে। অপরদিকে, কর্মী হিসেবে আমাদেরও ভাবতে হবে এবং সজাগ হতে হবে, আমরা যেন আগাছা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মালিকের কাছে ধরনা না দিই তাদের করুণার পাত্র হয়ে কোনো রকমে টিকে থাকার আবেদন নিয়ে। নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করি, নিজে বাঁচি, প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাই এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াই। এখানে আরও একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক যে, Train does not wait for Ordinary Passengers; ট্রেন ধরতে না পারলে প্যাসেঞ্জারকেই Suffer করতে হবে। অর্থাৎ নিজেকে ফিট না করতে পারলে সেখানে Survive করা বা টিকে থাকা যাবে না। এটা ভেবে সবারই উচিত, যখন যে কাজ করা দরকার তখন তা সিরিয়াস হয়ে করা। অর্থাৎ, Hit the iron when it is hot.

৮. কর্তব্যপরায়ণতা / দায়িত্বশীলতা

কর্তব্যপরায়ণতা এবং দায়িত্বশীলতা কি তা জানার আগে আমাদের সবাইকে সর্বপ্রথমে জানতে হবে, বুঝতে হবে আমি কী, আমি কে, আমার অবস্থান কোথায়, আমার লেভেল কী, আমার ক্ষমতা কতটুকু, শক্তি কতটুকু, দক্ষতা কতটুকু, যোগ্যতা কতটুকু, আমার কতটুকু পাওয়া উচিত, কতটুকু চাওয়া উচিত এবং যার কাছে চাচ্ছি তার দেয়ার ক্ষমতাই বা কতটুকু। তাহলে চাওয়া-পাওয়ার ব্যাসার্ধ স্ফীত হবে না। চাওয়া সংকুচিত হয়ে আসবে, গ্রহীতার মনে বুঝ আসবে।

মনোকষ্টও কমে যাবে। দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিয়ে সচেতন হয়ে নিয়ম-নীতির আওতায় সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং অন্যকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কাজ করতে দিতে হবে। এভাবে সবাইকে দিয়ে পর্যাপ্ত কাজ করিয়ে নিতে হবে। দিনশেষে আগামী দিনের কর্তব্য নোটে লিখে নিতে হবে, যাতে ভুল না হয়। কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বশীল কর্মীরা কখনও দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেন না এবং কোনো খারাপ কাজেও লিপ্ত হবেন না, এটাই আমাদের বিশ্বাস।

৯. শ্রম ও পারিশ্রমিকের হিসাব

প্রতি কর্মদিবস শেষে হিসাব করতে হবে, পারিশ্রমিক কত পেলাম, তার বিপরীতে শ্রম কতটুকু দিলাম এবং এটা পরিমিত হলো কি-না। বেশি শ্রম দিয়ে কম পারিশ্রমিক পেলাম, নাকি কম শ্রম দিয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিলাম, এই হিসাব মেলালেই আমরা আমাদের শ্রমের বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের খরচের যথার্থতা অর্থাৎ Cost Efficiency এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব বের করতে পারব। কাজে আরও Serious হব, যা আমার তথা পরিবারের সদস্যদের চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে। আমরা একে অপরের প্রতি সহমর্মী হব। তাতে পরিবারে গৃহকর্তা হিসেবে আমাদের বা উপার্জনকারীর আদেশ বা নির্দেশ উপার্জন-ভোগীরা মেনে চলবেন, ভয় করে নয়, ভক্তি করে। এতে পরিবারের কাছে আমাদের সম্মান বেড়ে যাবে অর্থাৎ আমরা লিডার হিসেবে অধস্তনদের কাছ থেকে সম্মান এবং আত্মবিশ্বাস আদায় করে নিতে পারব।

এ ব্যাপারে একটি উপমা দেয়া যায়। আমরা প্রায়শই অফিসে আসার আগে বাড়িতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য মিস্ত্রি লাগিয়ে দিয়ে আসি এবং ফিরে গিয়ে তাকে মজুরি দিই। কিন্তু বাসায় ফিরে যদি দেখি, ওই কাজটি হয়নি বা সঠিকভাবে হয়নি, তাহলে কি আমরা তাকে প্রতিশ্রুত পেমেন্ট দেব? তিনি অবশ্য দাবি করবেন। কারণ, তার হিসাবে বা দৃষ্টিতে তিনি সারাদিনই কাজ করেছেন, কাজ ছেড়ে কখনও বসে ছিলেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাজ পরিমিত এবং সঠিক না হলে আমরা কেউ নিজেদের বাসা বা বাড়ির কাজে নিয়োজিত লোককে পয়সা দেই না। তাহলে আমাদের কর্মস্থলে সঠিকভাবে কাজ না করে পর্যাপ্ত কাজ না করে করার ভান করে সময়ক্ষেপণ করলে আমাদের মনিব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ আমাদেরকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দেবেন কেন? আমরা দাবিই বা করব কোন অধিকারে, কোন মুখে? আমরাও স্ব-স্ব স্থানে কর্মী বা শ্রমিক। তাহলে আমাদের অযৌক্তিক দাবি কি, সরকারি অফিসের কিছু সংখ্যক কর্মচারীর মতো (ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের মতো) অবান্তর হবে না? -এ রকম **অফিসে এলে বেতন পাই, কাজ করলে ওভারটাইম পাই**। মাসিক ভিত্তিতে আমরা নিয়মিত

বেতন বা পারিশ্রমিক পাই এবং আমাদের মনিবরা উদার বলে বিদেশের মতো আমাদের কাজের চুলচেরা হিসাব করছেন না অর্থাৎ পরিশোধিত পারিশ্রমিকের বিপরীতে আমাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত শ্রম পাচ্ছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছেন না। তাই আমরা পার পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বিদেশে এমনকি আমাদের দেশে বিদেশি-কোম্পানি এবং স্থানীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে বা কোম্পানিতেও এটা কঠোরভাবে দেখা হয়। আমাদের অঙ্গনে এরূপ চলতে থাকলে, এই সুপ্ত ঘাতক ব্যাধি সংক্রামিত হয়ে মহামারি ডেকে আনবে। কর্ম-সমাজ ভেঙে পড়বে। আমাদের কর্মহীন জীবন ভিতহীন ঘরের মতো এবং আমাদের কর্মশূন্য প্রতিষ্ঠান গোয়ালের কুড়ে বা অকর্মণ্য গরুর মতো শুয়ে পড়বে; শুধু খাবে, দেবে না কিছুই।

তাই আসুন, আমরা সজাগ হই, সতর্ক হই, কাজে তৎপর হই; নিজেরা কাজ করি এবং সবাইকে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করি। কর্ম অনীহার সংক্রমণকে প্রতিরোধ করি। ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। সমাজ ভালো হোক, দেশ ভালো চলুক। নির্দ্বিধায় বলা যায় **ভোগে সুখ নেই ত্যাগে সুখ-** এই মর্মবাণী অনুশীলন করলেই এটা করা সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে অর্থনীতির চিরন্-ন সূত্র অর্থাৎ More you get, more you want' Fallacious না হলেও Exception হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাতে মানুষ ভালো হতে অনুপ্রাণিত হবে।

১০. কাজে ভুল না করা

কাজ Effectively & Efficiently করতে হবে। Effective হতে গিয়ে Efficiency-কে উপেক্ষা করে তাড়াহুড়ো করে কাজে ভুল করা যাবে না। ভুল কাজ করা কাজ না করার শামিল এবং ওই ভুল সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। তারপরও ভুল হলে 'ভুল মানুষের ধর্ম, ভুল তো হতেই পারে' বলে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে প্রতিরক্ষা (Defense) নেয়া বা সুযোগ নেয়া যাবে না। কারণ, 'To err is human' এটা একটা নিছক প্রবাদ বাক্য নয়, গুরুত্বপূর্ণ মর্মবাণী। এই বাক্য ব্যবহার করার সুযোগ শুধু বস্ বা অগ্রজরা নিতে পারেন। বস্ যদি মনে করেন, তার অধস্তনের ভুল গ্রহণযোগ্য, তখন তিনি এরূপ ভুলের জন্য তার অধস্তনকে 'Benefit of doubt' দিতেও পারেন। তবে তা দেওয়ার আগে বস্‌কে নিশ্চিত এবং আশ্বস্ত হতে হবে যে, ওই কর্মী আগে কখনও এমন ভুল করেন নাই এবং অভ্যাসগতভাবে ভবিষ্যতেও সহসা এমন ভুল করবেন না। কর্মী এই প্রবাদের আশ্রয় নিলে বা প্রশ্রয় পেলে এটা তাকে ভুল না করার জন্য সিরিয়াস হতে দেবে না, বরং অহরহ ভুল করতে ইন্ধন জোগাবে। এতে তার ক্ষতি হবে, প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষতি হবে। তাই ভুল না করার জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, সদা সজাগ থেকে তৎপর হয়ে কাজ করতে হবে। কোনো ভুল হলে তার জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে,

অনুতপ্ত হতে হবে, ভুল স্বীকার করতে হবে। ভুল করে ছাপাই গাওয়া যাবে না এবং ভবিষ্যতে আর ভুল হবে না বলে কঠোর ওয়াদা করতে হবে। বসকে আশ্বস্ত করতে হবে। তাহলেই ভুল এড়ানো যাবে। আরও মনে রাখতে হবে, স্মার্টলি Sorry বলে উর্ধ্বতনকে বেওকুফ বানিয়ে বা বিভ্রান্ত করে অধিক ক্ষতি করার জন্য সুচতুরভাবে সময় ও সুযোগ নেয়া যাবে না। কারণ এই অপকৌশল ধরা পড়ে গেলে তা বিপদ ঘটাবে। তাই আসুন, কথায় কথায় ভণ্ডামির Sorry বলার ধূর্ত অভ্যাস পরিহার করে ভবিষ্যৎ বিপদ প্রতিরোধ করি, ভুল প্রতিহত করি।

১১. ভুলের মাশুল

ভুল করলে মাশুল দিতে হয়। অনেক সময় ভুলের মাশুল অনেক ভারী হয়ে দেখা দেয়। ভুল করে শেষ অঙ্কের ডান পাশে একটি শূন্য ধরে নিয়ে কাজ করলে তার রেজাল্ট ভয়াবহ হবে এবং তার মাশুল ভুলকারীকেই দিতে হবে। তাই কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না। ব্যাংকের চাকরিতে তো একেবারেই নয়। কারণ, ভুল না করার জন্য ব্যাংকারদের তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা এবং বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেয়া হচ্ছে; যেখানে তাদের আশপাশেই অগণিত শিক্ষিত ও দক্ষ বেকার মানুষ অনেক কষ্টে থেকে অধীরভাবে চেষ্টা করে চলেছে কাজ পাওয়ার জন্য। চলার পথে ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। অবিবেচিত সিদ্ধান্তও ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। আবার, মানুষকে বুঝতে বা চিনতে ভুল করলে সেই ভুল শত্রুতা বাড়িয়ে বিধ্বংসী ক্ষতি করতে পারে। যে ব্যক্তি Perception বা অন্যের মনের চিন্তা সম্পর্কে যত নির্ভুলভাবে আগাম বুঝতে পারে, সে তত বেশি কৃতকার্য হয়। ভুল Perception করে সিদ্ধান্ত নিলে তা ভুল হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই হঠাৎ কিছু শুনেই বা মনে এলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করা উচিত নয়। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে কানে হাত দিয়ে নিশ্চিত না হয়ে চিলের পেছনে ছোটা বেওকুফি। তাই, দেখে, শুনে, বুঝে, সময় নিয়ে, যাচাই-বাছাই করে কোনো কাজে পা ফেলানো উচিত। তাতে হোঁচট খেতে হয় না।

১২. মনকে বিভক্ত করা

মানুষের মন একটা। এটাকে আমরা প্রায়ই ভাগ করে ফেলি। এই মনকে একই সময়ে একাধিক কাজের জন্য কখনও ভাগ করা উচিত নয়। তাতে দুটো বা সব কাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হতে পারে। তাই এক সময়ে একটি কাজেই মন দিতে হবে। তাতে সুফল পাওয়া যাবে। এমনকি একনিষ্ঠভাবে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলে তাকেও পাওয়া যাবে। অতএব, একটি কাজ শেষ করে অপরটি করতে হবে।

প্রথম কাজটি করার মাঝখানে অপর একটি কাজ অতি জরুরি হিসেবে এসে গেলে প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টি করা যাবে। তবে জরুরি অর্থাৎ দ্বিতীয় কাজটা শেষ হলেই ছেড়ে যাওয়া প্রথম কাজটি করতে হবে। তা না করলে সমস্যা হবে। মনোযোগ ভাগ হয়ে গেলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয় তার একটা নমুনা এভাবে দেখা যাবে। আপনি মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন অথবা টিভিতে আপনার কোনো পছন্দের Episode বা Event বা খেলা দেখছেন। সেই সময় মনে হলো, চা অথবা পানি খাই। তখন পাশে রাখা পানির গ্লাস বা চায়ের কাপ নিতে ওই দিকে না তাকিয়ে হাত বাড়ালেই তা পড়ে যায়, এতে একাধিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে। যেমন, টিভি দেখায় ব্যাঘাত ঘটা, উত্তেজনাকর শট মিস্ হওয়া, কাপ ভেঙে চা পড়ে সরঞ্জামাদি নষ্ট হওয়া এবং ভাঙা কাপে হাত-পা কাটার মতো আরও অনেক অঘটন ঘটতে পারে। আবার, হাঁটার সময় অন্যমনস্ক হলেও হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে পা ভাঙতে পারে, কোমরে ব্যথা পেতে পারেন ইত্যাদি। কেন এমন হয়? কারণ, ওই সময় আপনার মন দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। মনের গতি এবং দেহের গতির মধ্যে কোনো সমতা থাকে না। মনের গতি দেহের গতি অপেক্ষা ক্ষীপ্রতর হয়। তাই কথিত দুর্ঘটনা ঘটে বা ঘটতে পারে। পক্ষান্তরে, টিভির ওপর থেকে নজর সরিয়ে চা বা পানি নিতে গেলে খেলা থেকে মন সরে গিয়ে চায়ের ওপর পড়ত এবং তখন আর এরূপ হতো না। মনোযোগ ভাগ হওয়ার কারণে এ ধরনের আরও কত ঘটনা যে আমাদের জীবনে অহরহ ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক এবং সাবধান হতে হবে।

মন বিভক্তির কারণে ব্যাংকাররা কাজে ভুল করলে বিরাট ক্ষতি হতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি গ্রাহকের আস্থা কমে যায় এবং তাতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়, যা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সম্পদ। আবার এর ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা কমে, আয় হ্রাস পায় এবং তার খেসারত প্রতিষ্ঠানের সবাইকে দিতে হয়। গ্রাহকরা কোনো প্রতিষ্ঠানে নিজেদের নিরাপদ না ভাবলে তারা নীরবে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাবেন এবং আমরা ব্যবসা হারাব, তাতে প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ার হুমকির সম্মুখীন হবে। কর্মস্থল নামে থাকবে, সেখানে কর্ম থাকবে না। এরূপ হলে কর্মহীন কর্মস্থান কতদিন টিকে থাকবে? তাই মন বিভক্তির কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক না কেন, কাজে বা চিন্তায় ভুল করা যাবে না। নির্ভুল কাজ করার জন্য মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিতে হবে, যাতে আমার প্রতিষ্ঠান কোনো কারণে 'আল্লাহ্ করুক' অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মার্জ না হয়। হলে নতুন মালিকরা আমাদেরকে কিছুতেই চাকরিতে রাখবেন না। Rubish বা অথর্ব বলে বিদায় করে দেবেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, তারা সহজেই নিজেদের পছন্দমতো অধিক নির্ভরযোগ্য লোক সাশ্রয়ী মূল্যে তদস্থলে নিয়োগ দিয়ে লাভবান হতে পারবেন।

কারণ, দেশে বেকার সমস্যা প্রকট। ফলে দক্ষ এবং অধিক শিক্ষিত লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম পয়সায় ওই কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে অধীর আগ্রহে বসে আছে।

তাই এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে আমাদের অবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং আমাদের ব্যাংক অন্য ব্যাংকের সঙ্গে নয়, বরং অন্য ব্যাংক খারাপ করার কারণে আমাদের ব্যাংকের সঙ্গে এসে মার্জ হয় এবং আমরা সেই ব্যাংককেও লাভজনকভাবে চালাতে সক্ষম হই। এরূপ হলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ওই একীভূত হওয়া প্রতিষ্ঠানের লোকদেরকে ট্রাশ ভেবে ক্যানে ছুড়ে ফেলে দেবে এবং আমাদের ওপর তাদের আস্থা বেড়ে আমাদের চাকরি মজবুত হবে।

আবারও বলি, দায়িত্বই কর্তব্য শেখায় এবং কর্তব্য মানুষকে নিষ্ঠাবান বানায়। নিষ্ঠা থাকলে মন ভাগ হয় না, ভুলও হয় না বা কম হয়। **'বে-খেয়ালি ভুল'** আর **'অজ্ঞাত ভুলের'** মধ্যে পার্থক্য অনেক। উদাসীন বা ইচ্ছাকৃত ভুলের মাফ নেই, কিন্তু অজ্ঞাত ভুল সন্দেহের উপকারিতা পেলেও পেতে পারে, যেটা আগেই বলা হয়েছে। তাই মনকে একনিষ্ঠভাবে কাজে নিবিষ্ট করতে হবে; কখনও ভাগ হতে দেয়া যাবে না। দিলে দুটো কাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার খেসারত আমাদেরকে দিতে হবে।

১৩. স্বার্থ সংঘাত

কর্মীবাহিনীর আরও একটা দায়িত্ব এবং অবশ্যই জানার বিষয় এই যে, অফিসের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত কাজ বা স্বার্থ কখনই মেলানো যাবে না। এ কথা আগেও বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। চিন্তায় ও কাজে নিরপেক্ষ হতে হবে। অর্থাৎ, অফিসে বসে বাইরের চিন্তা, বাড়ির চিন্তা করা যাবে না। আগেই বলেছি, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মীর চুক্তি হয় শ্রম দেয়ার। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, অফিস সময়ে নিজের সার্ভিস আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। বিক্রীত জিনিসের ওপর বিক্রেতার কোনো দাবি থাকে না, থাকতে পারে না। অতএব, অফিস সময়টা আপনার নয়, অফিসের। এ নিয়ে কোনো ডিবেট করার সুযোগ নেই। তাই অফিস সময়ে সততার সঙ্গে নিয়মমাফিক পর্যাপ্ত কাজ করে প্রতিষ্ঠানের কাছে সার্ভিস দেয়ার চুক্তি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কর্মীকে অফিস সময়ে শুধু তার অফিস বা প্রতিষ্ঠানকেই সার্ভিস দিতে হবে। তাও সুষ্ঠুভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করে। কখনই অফিসের সুবিধাদি ব্যক্তিগত কাজে লাগানো যাবে না। যেমন, অফিসের খাতা, কলম, কাগজ, টেলিফোন বা অন্য কোনো অফিস সামগ্রী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বাসায় নেয়া যাবে না। অফিসের চেয়ারে বসে অফিসের সব সুবিধা ব্যবহার করে অফিস চলাকালীন

ব্যক্তিগত কোনো কাজ করা যাবে না। এমনকি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা অন্য কোনো বইও পড়া যাবে না।

১৪. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের দৈনন্দিক কাজ

■ অফিস শুরুর পর্যাপ্ত সময় আগে অফিসে পৌঁছানো বা হাজির হওয়া, ব্যক্তিগত কাজ শেষ করে নিজেকে প্রস্তুত করা, ক্লিনারদের পরিচ্ছন্নতা কাজেরও তদারক করা ইত্যাদি।

■ ঊর্ধ্বতনেরা অফিসে পৌঁছার আগেই, প্রতিদিন সকালে তাদের চেয়ার টেবিল কার্পেট বা ফ্লোর ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে দেয়া। কম্পিউটার ইত্যাদি সরঞ্জাম চালু করে অফিসের খাতাপত্র বের করে কাজের জন্য অফিসকে প্রস্তুত করে দেয়া।

■ অফিসারদের টেবিলের জিনিসপত্র ঠিক আছে কি-না, তা যাচাই করা ও ঠিক রাখা। যেমন, কলমে কালি আছে কি-না, পেন্সিল কাটা বা শার্প করা আছে কি-না, পঞ্জে ডেটল পানি আছে কি-না, স্ট্যাপলার মেশিনে পিন আছে কি-না, ডেস্ক ও দেয়াল ক্যালেন্ডারের তারিখ, মাস ঠিকমতো উল্টানো আছে কি-না, কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ফ্যাক্স মেশিনের কাগজ-কালি বিদ্যমান বা মজুদ আছে কি-না ইত্যাদি দেখা।

■ অফিসের, অর্থাৎ কর্মস্থলের কোথাও বা কারও টেবিলে কোনো জিনিস মালিকবিহীন হিসেবে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেলে অফিসের সবাইকে এ সম্পর্কে জানানো, অফিস প্রধানের কাছে তা জমা দেয়া এবং সবার অবগতিতে তা সঠিক মালিককে ফেরত দেয়া অবশ্যকরণীয়। এতে সততা প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মীর অবস্থান মজবুত হয় এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

■ অফিসের দায়িত্ব হবে কেউ হারানো জিনিসের দাবি না করলে উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। না করলে অফিসের বদনাম এবং কর্মীদের দুর্নাম হবে।

■ অফিস শুরুর আগে এবং অফিস শেষে অফিসের সব নির্বাহীর এবং অফিসারের **কম্পিউটার অন ও অফ** করার সঙ্গে সঙ্গে, অফিসের সব **ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি** এবং **পানির কলগুলো** সঠিকভাবে চালু এবং বন্ধ আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। এরূপ সতর্কতা দুর্ঘটনা এবং অপচয় রোধ করবে।

■ সকল আসবাবপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

■ অফিসে, বাথরুম বা অন্য কোনো রুমে অপ্রয়োজনে বাতি জ্বলে এবং এসি চলে কি-না তা প্রতিনিয়ত পরখ করা। চললে তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে দেয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখিত কাজ না করে আত্মরক্ষার আশ্রয় নেওয়া যাবে

না। যেমন, লাইট এবং ফ্যান ইত্যাদি বন্ধ করার কথা বললে বলা হয় 'আমি জ্বালাই বা চালাই নাই, অন্যে করেছে', বা 'এই তো এখনই আবার ফিরে আসব বলে বন্ধ করি নাই। আবার কখনও কখনও এমনও Sily যুক্তি দেয়া হয় যে, **এটা তো আর নিজের বাসা নয়, অফিস, তাই লাইট-ফ্যান ইত্যাদি বন্ধ করি নাই?** উল্লেখিত সামগ্রীর অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার, অযাচিত এবং এতে অযথা খরচ বাড়ে, যা প্রতিষ্ঠানের লাভ কমিয়ে লোকসান বাড়ায়। এর ফলে Stake Holder-দের প্রাপ্তি কমে। এখানে ব্যবহারিক শিক্ষার উদাহরণ এসে যায়। যেমন, ইলেকট্রিক লাইনে প্রতিটি পয়েন্টের জন্য পৃথক সুইচ দেয়া হয়, যেটা যখন প্রয়োজন সেটাই শুধু তখন ব্যবহার করার জন্য। কারণ এটাই সংযমের শিক্ষা। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়ে নিজের অফিসের তথা দেশের ক্ষতি রোধ হয়। এই সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ, জরুরি ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেচ কাজে লাগতে পারে।

এমন করা হলে বর্তমানের বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমবে। ভাড়া করা হলে Quick Rental-এর বাড়তি খরচ কমবে, হাসপাতালে বিদ্যুৎ নির্ভর জরুরি শৈল্য চিকিৎসায় বিদ্যুতের অভাবে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে না।

- বস্‌দের কাছে কোনো গেস্ট এলে বস চাইলে ভদ্রতার সঙ্গে তাকে চা-নাশতা বা খাবার দেয়া এবং খেয়াল রাখা, কখন খাওয়া শেষ হয়। খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে উচ্ছিষ্টসহ ব্যবহৃত বাসনপত্র টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং টেবিল পরিষ্কার করে দেয়া। দেরি করে ওঠালে মেহমান বিব্রত হতে পারেন এবং তাতে অফিসের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, অফিসের অদক্ষতা ও উদাসীনতা চিহ্নিত হয়, যা অপমানজনক।
- অফিসাররা ডাকলে বা স্মরণ করলে বা বেল দিলে মোটেও দেরি না করে, হাতের কাজ সযত্নে বন্ধ রেখে, আগ্রহভরে তার ডাকে তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়া, তার কথা বা নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝে, সে মোতাবেক ত্বরিত কাজ করা শুধু উচিতই নয়, কর্তব্যও বটে। দেরি করলে বসের ব্যয়বহুল সময় অপচয় হয়, যা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে।
- অফিসের কাজে বাইরে গেলে সবাইকে জানিয়ে যাওয়া, যাওয়ার আগে কাজগুলো সঠিকভাবে বুঝে নেয়া এবং যথাযথভাবে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসা বাঞ্ছনীয়। কাজ শেষ করে জলদি ফিরে আসার পর সংশ্লিষ্ট অফিসারকে বা বসদেরকে আপডেট দেয়া ভালো কর্মীর লক্ষণ। কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা যাতে প্রশ্রয় না পায়, তার দিকে নজর দেয়া উচিত।
- অফিসের ফাইল ও অন্য সব জিনিসপত্র অর্গানাইজ করে ক্রমানুসারে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা যাতে কাজের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়; কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। এতে efficiency বাড়ে।

▪ অফিসে এক টেবিলের জিনিস অন্য টেবিলে এমনকি বাসায়ও এক ঘরের জিনিস অন্য ঘরে না নেয়া উচিত। জরুরি প্রয়োজনে নিলেও জানিয়ে নেয়া এবং কাজ শেষে তা অবশ্যই আগের স্থানে ফেরত রেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়া। এটা জীবন, অফিস এবং বাড়ি– সব পর্যায়েই অতীব প্রয়োজনীয়।

▪ চিঠিপত্র ডেলিভারি দেয়ার জন্য দফতর হতে তা ভালোভাবে বুঝে রিসিভ করে নেয়া, হেফাজতে রাখা, দ্রুত ডেলিভারি দেয়া এবং ডেলিভারির সময় অফিস কপিতে বা পিয়ন-বুকে সিলসহ সংশ্লিষ্ট গ্রহণকারী দফতরের প্রাপ্তিস্বীকারমূলক স্বাক্ষর নেয়া এবং ফিরে এসে তা নির্ধারিত ফাইলে যথানিয়মে বসের অবগতিতে ফাইল করা সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। Initial দিলে জিনিস গ্রহণকারীর নাম ব্রাকেটের মধ্যে লিখে রাখতে হবে।

▪ দফতরের মতো বাসা-বাড়িতেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফোন, গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল, জমি বা বাড়ির খাজনা বা ট্যাক্সের কাগজ ইত্যাদি সুন্দর করে, ক্যাটাগরি অনুযায়ী পৃথক ফাইলে রাখতে হবে। এভাবে রাখলে, সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কখনও কোনো বিলের পুরনো পাওনা পরিশোধের প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন পড়লে, মুহূর্তের মধ্যে নির্দিষ্ট ফাইল থেকে তার কপি বের করে অতি সহজেই এই সমস্যার সমাধান করে দেয়া যাবে এবং কোনো প্রকার বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না বা খোঁজার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সময় অপচয় করতে হবে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করতেও হবে না। তাই কাজ শেষ হলেই বাসায় ফিরে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নির্দিষ্ট ফাইলে ফাইল করে তারপর কাপড় ছাড়তে বা Change করতে হবে বা অন্য কাজ করতে হবে। পরে করব বলে ফেলে রাখলেই ভুলের মারাত্মক খেসারত দিতে হতে পারে, সব MESS হয়ে যেতে পারে।

১৫. ফাইলিং করা ও রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি

অফিসের ফাইলিংয়ের ব্যাপারেও একইভাবে বলা যায়, প্রত্যেক বিভাগের নামে ফাইল থাকবে। (যেমন, ব্যাংক হলে HRD, GSD, ID ইত্যাদি) তার মধ্যে প্রতি ফাইলের আওতায় কাজের প্রকারভেদ অনুসারে কাগজ, বিল, চিঠি ইত্যাদি পৃথক লট হিসেবে স্ট্যাপল্ করে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত Organize করে পেন্ডিং বা সংশ্লিষ্ট ফাইলে রাখতে হবে, যাতে কোনো বিষয়ের A to Z সব চিঠিপত্র স্ব-স্ব লটে পৃথকভাবে থাকে। তাহলে পরে সেটা খুঁজে পেতে সময় ও শ্রম ব্যয় হবে না বা হারিয়ে যাওয়ারও ভয় থাকবে না; Auditor-দের কাজে কম সময় লাগবে। তাতে খরচ সাশ্রয় হবে। অন্যথায় আপনাকে অনেক খেসারত দিতে হতে পারে। একটু সতর্কতা এবং Seriousness-ই এই ক্ষতি হতে আপনাকে বাঁচাতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য তাগিদ (Reminder) দেয়াও সহজ হয়। কাজ শেষে ওই লট

নির্দিষ্ট ফাইলে শেষবারের মতো ফাইল করে দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র এক জায়গায় একসঙ্গে পাওয়া যায়। এটা একটা স্মার্ট অভ্যাস।

একটু পুনরাবৃত্তি হলেও বলি, অফিসের ফাইলের মতো, বাড়িতেও যদি সব কিছু Organize করে সুশৃঙ্খলভাবে রাখা যায়, তাহলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। অনেক সময় দেখা যায়, বাসায় অনেকে টেলিফোন নম্বর, ঠিকানা, কাজের মানুষের পেমেন্টের হিসাব স্মৃতিতে থাকে বা কদাচিৎ লিখে রাখে। লিখলেও অর্গানাইজ করে Compartment হিসেবে লিখে রাখা হয় না। নম্বর থাকলেও নাম থাকে না, নাম থাকলেও পরিচিতি এবং ঠিকানা থাকে না। অপরদিকে, কাজের লোকদের বেতন পরিশোধের হিসাব ঠিকমতো লেখা হয় না। পরে এ নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। যেমন, ভুল করে কম পেমেন্ট দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে হৈচৈ করে দুর্নাম করে, ক্ষতি করতে পারে, আবার বেশি পেমেন্ট দিলে নিজেদের ক্ষতি হয়। এই হিসাব রাখার দায়িত্ব ঘরণির হলে এ নিয়ে ঘরনার সঙ্গে মনোমালিন্য বা বিবাদ হতে পারে। অপরদিকে, ওইসব হিসাব-কিতাব লিখে না রেখে Memory-এর ওপর বেশি নির্ভর করায়, Memory Fail করতে পারে বা Stroke হতে পারে। অর্থাৎ, সামান্য একটু অসতর্কতার কারণে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। তাই চলায়, বলায়, করায় সর্বত্র সতর্ক এবং সুশৃঙ্খল হলে শান্তিতে এবং নিরাপদে থাকা যাবে।

এ ব্যাপারে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। যেমন- গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি সরকারি ডিপার্টমেন্টে জীবনে আমাকে কমপক্ষে একবার করে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। আর এ কাজ ঠিক করে দিতে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ঘুষ চেয়েছে, অহেতুক ঘুরিয়েছে। পরে বিল দেখালে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তখন বলেছে, আপনাকে ধরা গেল না, দেখছি। আমি বলেছি, কখনও পারবেন না। কারণ, আমি এসব ব্যাপারে খুবই সচেতন। তখন তারা বলেছে, কিছু পাব বলে আশা করেছিলাম, কিছুই তো পেলাম না বা আপনাকে দিতে হলো না, অধিকন্তু হাতে হাতে কাজ করে নিয়ে গেলেন। তাই চা-টা খাওয়ার জন্য কিছু দেবেন না? দিয়েছি। কারণ, দেশে এটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হয়, বাইরের দুনিয়ায়, অনেক জায়গায়ই এরূপ হয়। শুনেছি, উন্নত দেশে এটাকে বলে 'Speed Money'। এসব ব্যাপারে আমাদের দেশের এই 'ঘুষ' নামটা খুব খারাপ শোনায়, যেহেতু আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনে এটা পাপের কাজ। তাই ঘুষ খাওয়ার মতো অন্যায় করতে বলি না কাউকে। তবে কীভাবে এ পথ থেকে বেরিয়ে আসা যায় তার উপায় খুঁজে বের করা দরকার।

১৬. অফিস সামগ্রী ক্রয়

অফিসের জন্য জিনিসপত্র কেনার সময় নিজের ভেবে তার গুণগত মান এবং মূল্য সম্পর্কে বাজার যাচাই করে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ভালো জিনিস কিনতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বা কোম্পানীর পয়সা বলে বাজার যাচাই-বাছাই না করে সব সময়ে একই দোকান থেকে দরদাম না করে জিনিস কেনা উচিত নয়। আবার কেনার সময় আর একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যেন বিক্রেতা কম দামের প্রলোভন দিয়ে একই রকম দেখতে অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস গছিয়ে না দেয় বা কমিশন দিয়ে আমাদেরকে দুর্বল করে না ফেলে। ক্রয়ের বিপরীতে সঠিক ভাউচার নিতে হবে এবং নতুন ক্রয় ভাউচারের কপি Contact ফাইলে সংরক্ষণ করে রেডি রেফারেন্স হিসেবে রাখা ভালো, তাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ ক্রয়ের আগে প্রয়োজনে ঘরে বসে সে বিষয়ে ফোনে প্রাথমিক যাচাই করা সম্ভব এবং সহজতর হয়। তাতে অযথা সময় এবং যাওয়ার খরচ বাঁচে।

১৭. অকেজো জিনিসের সুষ্ঠু ব্যবহার

অফিসের কোনো জিনিস ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে গেলে তা অকেজো হিসেবে স্টোরে গুছিয়ে রাখতে হবে এবং তার হিসাব নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিখে রেখে তা সংরক্ষণ করতে হবে। পরে সুযোগ বুঝে ওইসব ব্যবহার অযোগ্য জিনিস যথাযথ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে নষ্ট করতে হবে বা ট্রাশ হিসেবে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকের বা প্রতিষ্ঠানের আয় খাতে জমা করতে হবে এবং তারও সঠিক হিসাব বা রেকর্ড রাখতে হবে। তা না করলে ওইসব ট্রাশের জন্য হয়তো একদিন চুরির বা আত্মসাতের অভিযোগ কলঙ্কতিলক হয়ে কপালে লেগে যাবে– এটা অপমানজনক। তাই মনে রাখতে হবে, সবকিছুর সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন, যা সর্বোপরি কল্যাণকর এবং নিরাপদ।

১৮. যা করা উচিত নয় (বিধিনিষেধ)

➢ ড্রেস কোড আবমাননা করা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ইউনিফর্ম, জুতার পরিবর্তে ক্যাজুয়াল ড্রেস, কেডস্, টি শার্ট, স্যান্ডেল পরে অফিসে আসা বা কাজ করা যাবে না।

➢ কাপড়-চোপড়, জুতা ইত্যাদি কোনো পরিধেয় পরিচ্ছদ অপরিষ্কার রাখা যাবে না। সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়মিত ধোলাই, পলিশ এবং ইস্ত্রি করিয়ে পরতে হবে।

➢ অফিসের সব নিয়ম-কানুন বা নির্দেশনা মানতে হবে।

➢ নিয়মিত শেভ না করা, গোসল না করা, চুল, কাপড়-চোপড়সহ কোনো জিনিস অগোছালো রাখা যাবে না। অফিসে Cow Boy এবং High Kicking Girl-এর ফ্যাশন করা অনুচিত। কারণ, এরূপ পোশাক কাজের জন্য স্বস্তিকর নয়। অফিসে Hot বা Vulgar Costume ব্যবহার করা চলবে না।

➢ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে গেলে তাদের পেছনে দাঁড়ানো যাবে না, পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়ানো যাবে না, বার বার প্যান্ট ওপরে টানা যাবে না এবং কোনো অঙ্গভঙ্গিও করা যাবে না। দুটি হাত সম্মুখে নিচু করে একটির ওপর অপরটি ঝুলিয়ে সোজা হয়ে সামনে দাঁড়াতে হবে (আগেও বলা হয়েছে)।

➢ অফিসে বসে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক আলাপ-সংলাপ করে অফিসের মূল্যবান সময় নষ্ট করা যাবে না।

➢ অফিসারদের সামনে অধস্তনরা কখনই নিজের ইচ্ছায় বসবেন না। কারণ এটা অশোভন।

১৯. টেলিফোন ব্যবহার

আজকাল ফোনালাপ বহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ টেলিফোন, বিশেষ করে মোবাইল ফোন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই এ আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হলো যাতে কেউ ভুল না করে।

❖ **বাইরে থেকে ফোন কল এলে,** রিসিভার তুলে 'হ্যালো কে বলছেন' বলা যাবে না। এটা বিড়ম্বনাময়। তাই প্রথমে বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিতে হবে। তাতে টেলিফোনকারী এই মর্মে নিশ্চিত হবেন যে, তিনি ঠিক জায়গায় সঠিক লোকের কাছে ফোন করেছেন কি-না।

❖ আগত কল সঠিক জেনেও Avoid করতে রং নম্বর বলে ফোন রেখে দেয়া যাবে না। তবে অযাচিত ফোন পরিহার করতে চাইলে অন্য কথা।

❖ বিনয়ী সালাম এবং নিজের পরিচয় দেয়ার পর বলতে হবে **কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি**। মনে রাখতে হবে, টেলিফোনের অভদ্র আচরণ ব্যক্তির, পরিবারের তথা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। পুনরায় বলি, কথিত ভাবমূর্তি বা Goodwill প্রতিষ্ঠানের কষ্টার্জিত মহামূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না, যে কোনো মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, সুনাম অর্জন করতে সময় লাগে, বর্জন হতে নয়; নিমেষে উধাও হয়ে যায় কর্পূরের মতো।

❖ মিটিংয়ে থাকা অবস্থায় বা মিটিং চলাকালে জরুরি ব্যক্তিগত ফোন এলে উপস্থিত সবাইকে Excuse me বলে অর্থাৎ তাদের অনুমতি নিয়ে একটু দূরে

গিয়ে ওপরে বর্ণিত নিয়ম মেনে অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে কথা বলে ফিরে এসে Sorry বলে বৈঠকে যোগ দিতে হবে। দফতরে বসে ব্যক্তিগত কাজের জন্য ফোন-আলাপ করা যাবে না। তা নিজের বা অফিসের– যে ফোনই হোক না কেন।

❖ **বাইরে কল করলে** প্রথমে সালাম দিয়ে, তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বলতে হবে, 'আমি অমুকের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?' বর্ণিত অনুশাসন মানলে অন্যের মনোযোগ নষ্ট হবে না এবং নিজের গোপনীয়তাও বজায় থাকবে।

❖ বস্ কখনও অফিসিয়াল কাজে ফোনে বা সম্মুখ-আলাপে ব্যস্ত থাকলে সেখান থেকে সরে এসে তাকে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। অন্যের টেলিফোনের আলাপ আড়ি পেতে শোনা যাবে না। এটি একটি অন্যায় এবং অপরাধমূলক বদ অভ্যাস।

❖ অফিসের সময়ে ব্যক্তিগত কোনো ফোন এলে সংক্ষেপে **হ্যাঁ-না** বলে শেষ করতে হবে, জরুরি না হলে, **আমি পরে কল করছি** বলে অবসর সময়ে কল করতে হবে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের, নেহায়েত জরুরি না হলে অফিসে আসতে বা অফিস সময়ে নিজের কাছে টেলিফোন করতে বারন করে দিতে হবে। অফিসে সব সময় ব্যক্তিগত সেলফোন সাইলেন্ট-মোডে রাখতে হবে, পরে অবসরে মিস্‌ডকল লিস্ট দেখে কল ব্যাক করতে হবে। কারণ কল ব্যাক করা ভদ্রতা এবং দক্ষতার প্রতীক। এছাড়া অফিসে বসে নিজের সেট থেকে নিজের কাজেও অতি জরুরি না হলে ফোন করা যাবে না।

২০. গোপনীয়তা রক্ষা (Code of Confidentiality)

➢ অফিসের কাজের গোপনীয়তা, বসের বা সহকর্মীদের আলোচনার গোপনীয়তা বা তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক খবরাখবর, ব্যাংক-হিসাব ইত্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা বা কঠোরভাবে মানা চাকরিবিধির এবং জীবনরীতির অন্যতম শর্ত। এই শর্তের লঙ্ঘন শুধু প্রতিষ্ঠানেরই ক্ষতি করে না, পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বিবাদ-কলহ এমনকি খুন-জখমের মতো মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে। এছাড়া ব্যাংকে এক গ্রাহকের তথ্য অন্য গ্রাহককে এমনকি স্বামীর হিসাবের তথ্য স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর হিসাবের তথ্য স্বামীকেও বলা যাবে না। পরিবার-পরিজন এমনকি সন্তানদের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। ব্যাংকের গোপনীয়তা রক্ষা না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটা নিজে মানতে হবে, অন্যকে মানাতে হবে।

এখানে একটা উপমা প্রাসঙ্গিক : একটি লোক, যাকে আপনি পছন্দ করেন না বা ভালো বলে জানেন না, তিনি যদি আপনার ব্যাংক হিসাবের ব্যালান্স জেনে যান

এবং আপনার কাছে টাকা ধার চান, আপনি স্বভাবত বলতে পারেন, টাকা নেই। তিনি উত্তরে যদি বলেন, ব্যাংকে আপনার টাকা আছে, কত আছে তাও জানি, তখন আপনি বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন। আপনি হয়তো জানেন, সেই লোককে টাকা দিলে ফেরত পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় যদি আপনি তাকে টাকা না দেন, তাহলে তিনি শত্রুতা করে আপনার ক্ষতি করতে পারেন। ভাড়া করা লোক দিয়ে খুন বা পরিবারের কাউকে অপহরণও করাতে পারেন। তিনি দুর্বৃত্ত ও জঘন্য খুনি হলে আপনাকে হত্যাও করতে পারেন। আবার হিসাবের গোপনীয়তা ভঙ্গের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ-কলহও বেধে যেতে পারে। তাই ব্যাংকার হিসেবে আপনি অদূরদর্শী হয়ে বা অবহেলা করে যদি আপনার গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা না করেন তাহলে আপনার বা গ্রাহকের অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই নিজের গোপন কথাও কাউকে বলবেন না। মনে রাখতে হবে, ‘Your secret will never come to light, if you don’t tell it to others.’ সুতরাং এক্ষেত্রে গোপনীয়তা শান্তি রক্ষার হাতিয়ার। ছোট-বড়, ধনী-গরিব, চাকরিরত বা বেকার– সব পর্যায়ের মানুষের জন্যই এই অনুশাসনের অনুশীলন বা পরিপালন অপরিহার্য।

২১. অফিসের ভাবমূর্তি

কর্মক্ষেত্রে নিজের সুনাম এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বা ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য সবাইকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমার বা আপনার এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবার দুটি সত্তা- একটি নিজের, অপরটি তার কর্মস্থলের বা প্রতিষ্ঠানের। এ দুটোই রক্ষা করার দায়িত্ব স্ব-স্ব কর্মীর। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের পরিবারের ব্যাপারেও এই দর্শন একইভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ, পরিবারের সদস্য এবং তার পরিবারের মধ্যে এ দুটি সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্ন। তাই পরিবারের কোনো সদস্যের যা ইচ্ছা তাই করার এখতিয়ার নেই। সমাজের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। এক সদস্যের কুকর্ম তার পরিবারের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ভাবমূর্তি নষ্ট করতে যথেষ্ট, সমাজে যার মূল্য অনেক বেশি। নিজের ভাবমূর্তি এবং অফিসের ভাবমূর্তি বজায় রাখলে নিরাপদ থাকা যায়, শান্তিতে থাকা যায়। যেমন, কাউকে সবাই ভালো জানলে তার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাঙা সহজ, গড়া কঠিন। তাই পূর্বপুরুষদের তিল তিল করে গড়া বংশের বা পরিবারের, প্রতিষ্ঠানের বা সমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট করে নিজের এবং Posterity-এর ক্ষতি করা ঠিক নয়। কারণ, প্রবাদ বলে, ‘কাজ করে বেহুদ্দা, মার খায় গুষ্টিসুদ্ধা।’

২২. অফিসে নীরবতা পালন

বিদেশের এবং স্থানীয় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদেরও স্ব-স্ব দফতরে, নীরবতা পালন করে চলতে হবে। কিন্তু দেশি অফিসে এমনটা কদাচিৎ হয়। যদিও এটা কঠিন কাজ নয়। আমাদেরই সহপাঠী এবং সহযোগী বন্ধু, ভাই যদি স্থানীয় বিদেশি অফিসে নীরবতা পালন করে কাজ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না? আমাদেরকে পারতেই হবে! এ ব্যাপারে সিনিয়রদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তাদেরকেই অগ্রজ হিসেবে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে অনুজরা তা অনুসরণ করে। এমন করলে ভালো অফিসার বা বস হিসেবে আপনি সবার সম্মান পেতে পারেন এবং অফিস ভালোভাবে চালাতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজনে দফতরে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। সর্বতো প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মস্থলে নীরবতা পালন করতে পারলে এর উপকার দেশে-বিদেশে সর্বত্র পাওয়া যাবে।

২৩. ছুটি নেয়া

অকারণে বা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনে (যা ম্যানেজ করা যায়), ঘন ঘন ছুটি নেয়া যাবে না। ছুটি দুর্দিনের জন্য মজুদ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, 'Leave can not be claimed as a matter of right.' বিনা বেতনে ছুটি নেয়াও ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিতে ভালো নয়। ছুটি নষ্ট হয়ে যাবে বলে অযথা ছুটি ভোগ করার প্রবণতাও প্রতারণামূলক। এরূপ মানসিকতা পরিহার করে 'কর্মই ধর্ম' এ কথার ওপর বিশ্বাস রেখে কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে মনপ্রাণ দিয়ে। এতে নিজেরই উপকার হবে। যত কাজ করবে, তত দক্ষতা বাড়বে। যত দক্ষতা বাড়বে, তত দায়িত্ব বাড়বে। যত দায়িত্ব বাড়বে, তত সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। যত সুবিধা বাড়বে, তত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। কে না চায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, সম্মান পেতে? অকর্মণ্য লোকেরা তাদের কাজ না করার যৌক্তিকতাকে জায়েজ করার জন্য 'যতই পড়িবে ততই শিখিবে' এ প্রবাদটি প্যারোডি করে বলবে, 'যত পড়িবে তত ভুলিবে, যত কম পড়িবে তত কম ভুলিবে, যত পড়িবে না তত ভুলিবে না'। এরূপ করা যাবে না।

২৪. কাজে বিলম্ব

কর্ম সম্পাদনে অহেতুক বিলম্ব করা যাবে না। অর্থাৎ কোনো কাজে পরিমিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় নেয়া যাবে না। বিলম্ব করার মানসিকতা মানুষকে অলস

করে, বলদ বানায় কলুর ঘানি টানতে। এতে স্পিড কমে যায়। স্পিড কমে গেলে গন্তব্যস্থল সুদীর্ঘ হয় এবং অবশেষে সেখানে পৌঁছানোও দুরূহ হয়ে পড়ে।

প্রতিদিনের কাজ সময়ের মধ্যে করে দিন শেষে ঝরঝরে হয়ে ফুরফুরে মেজাজে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরুন। বাড়ি ফিরে এসে বাসার বা গৃহস্থালির কাজে ধ্যান-মন দিন। বাসার লোকজনদের সহযোগিতা করুন। সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুন। তাদেরকে সময় দিন। তাতে পরিবারে আপনার সম্মান থাকবে, গুরুত্ব বাড়বে। বাসায় এসে সবার বক্তব্য একসঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসে শুনবেন এবং সবার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে, যুক্তি দেখিয়ে, নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন। তাতে সৌহার্দ এবং আন্তরিকতা বাড়বে। কারও চাহিদা মেটানো না গেলে তার কারণ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। জিদ না ধরে, রাগারাগি না করে, সুন্দরভাবে বোঝাবেন। প্রয়োজনে একাধিকবার বোঝাবেন। দেখবেন, সুফল এসেছে। এতে তারা অখুশি হবে না, বরং মেনে নেবে আপনার বুঝ। তাতে আপনার ইজ্জত বাঁচবে। সবাই Discipline শিখবে। পরস্পরের প্রতি মমত্ব বাড়বে। পরিবারে আপনার নেতৃত্ব আস্থাশীল হবে।

২৫. আয় গোপন না করা

পরিবারের লোকের কাছে, বিশেষ করে স্ত্রী বা সন্তানদের কাছে কখনও নিজের আয় গোপন করবেন না। ছেলেমেয়েসহ পরিবারের সবার সঙ্গে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে শেয়ার করুন। এই আয়ে চলতে হবে বলে সবাইকে জানিয়ে দিন। সবাইকে নিয়ে নিয়মিত মাসিক ব্যয়ের বাজেট করুন। বাজেটে সবার বিশেষ প্রয়োজনকে চিহ্নিত করে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে প্রয়োজনের প্রাধান্য (Priority) নির্ধারণ করুন। তাহলে দেখবেন, সবার অসীম বা সীমাহীন চাহিদা সীমার মধ্যে আসবে এবং তা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। যা আয় করবেন তাতেই চলে যাবে এবং অর্থনীতির চিরন্তন সূত্র অর্থাৎ **চাহিদা অসীম, সম্পদ সীমিত** ভুল প্রমাণিত হবে বা ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত হবে। আবার অবুঝ ছেলেমেয়েরাও কোনো কিছু বায়না করার আগে সংসারের বা অভিভাবকের সঙ্গতির কথা এবং অন্য ভাই-বোনদের চাহিদার কথা ভেবে সংযত হবে। দেখবেন, আপনার দায়ভার অনেক কমে গেছে। তাই বলি, সাংসারিক ব্যয়ের বাজেট আপনার আয়ের মধ্যে রাখুন। এডিপির মতো ব্যয়-ভিত্তিক বাজেট করবেন না। এরূপ করে ওয়াদাকৃত চাহিদা মেটাতে না পারলে আপনি বিশ্বাস, ভক্তি-শ্রদ্ধা ইত্যাদি সবই হারাবেন। এতে ধীরে ধীরে সংসারে, পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে, অবিশ্বাস, বিবাদ-কলহ, দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদ এবং খুন-জখমের মতো মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাই বাগাড়ম্বর নয়, শো-আপ নয়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও নয়, সামর্থ্য অনুযায়ী

বাস্তব ওয়াদা করুন এবং তা পূরণ করার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে পরিশ্রম করুন, সফল হবেন।

পক্ষান্তরে পরিবারের কাছে আপনার আয়ের বিষয়টি গোপন করে যদি ভাব দেখান, আপনার কোনো অভাব নেই, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে সব দিয়ে দেন (যেভাবেই হোক ম্যানেজ করে), তাহলে তাদের চাহিদা আরও বেড়ে যাবে। পরিবারের সবাই তখন বেহিসাবি খরচ করবে, অসংযমী ও অসাশ্রয়ী হবে। তাদের খরচের হাত বেড়ে গেলে তারা বিপথে যাবে এবং আপনি অসৎ পথে অনেক আয় করেও তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারবেন না। তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, অসৎ পথে পা দেবে। তখন তাদেরকে আর রক্ষা করতে পারবেন না। এরপর আপনার ছেলে কোনো অশোভন কাজ করলে এমনকি মাদকাসক্ত হয়ে খারাপ বা বাজে মেয়েকে ঘরে তুলতে চাইলে অথবা আপনার মেয়ে খারাপ বা বাজে কোনো ছেলের সঙ্গে ঘর করতে চাইলে আপনি তাদের থামাতে পারবেন না। বাধা দিতে গিয়ে হয়তো রেগে উঠে বলবেন, 'আমার মান-সম্মান, ইজ্জত সব ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে।' তখন আপনার ছেলে বা মেয়ে হয়তো পাল্টা জবাব দেবে, 'তোমার আবার ইজ্জত কিসের? তুমি তো অসৎ, তোমার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।' তখন আপনি না পারবেন কিছু বলতে, না পারবেন সইতে। হাঁটুতে মাথা গুঁজে, গুমরে গুমরে কাঁদা ছাড়া আর আপনার কিছুই করার থাকবে না। এরূপ উদাহরণ বিরল নয়।

অপরদিকে আপনার অসৎ আয়ের প্রবাহে কখনও ভাটা পড়লে এবং সে কারণে আগের মতো সবার সীমাহীন চাহিদার জোগান দিতে না পারলে পরিবারের লোক আপনাকে ভর্ৎসনা করবে, অথর্ব বলে গালি দেবে। তখন আপনার মান সম্মান কোথায় থাকবে? তাই সম্পদ নয়, পরিবারকে বৈষয়িক জ্ঞান দিন, ত্যাগের শিক্ষা দিন, সেটাই ভালো। সেটাই প্রকৃত সম্পদ। সবারই এই মর্মবাণী মানা উচিত যে, **সম্পদ অপেক্ষা জ্ঞান উত্তম, কেননা সম্পদ পাহারা দিতে হয়, পক্ষান্তরে জ্ঞান মানুষকে পাহারা দেয়।**

অবৈধ আয় করবেন না, বাহুল্য ব্যয়ও করবেন না। বেশি কথা বলবেন না, বেশি খাবেনও না। মনে রাখবেন, 'One who Talks more, Talks Rubbish.' তাই আপনি যা, নিজেকে তাই-ই ভাবুন, বেশি উঁচু বা নিচু ভাববেন না। নিজেকে সব সময় low profile-এ রাখার চেষ্টা করাই উত্তম, তবে তা কিছুতেই নিজের সম্মানহানি করে নয় বা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে নয়। এমনটি করলে অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়। পক্ষান্তরে, চাঁপাবাজি করলে নিজের চাঁপায় নিজেকেই পড়তে হয়, কখনও না কখনও।

প্রসঙ্গত বলি, আপনার সহকর্মী বা প্রতিবেশী কেউ ভালো থাকলে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কখনও অহমিকা বা স্ট্যাটাসের প্রতিযোগিতায় যাবেন না। পরিবারের কাউকে এরূপ আত্মঘাতী প্রতিযোগিতায় যেতেও দেবেন না। দেখবেন, তাতে পরিবারের সবাই সংযত হয়ে চলার মতো, অনুকরণীয় চরিত্র গঠন করতে পারবে। ফলে আপনার পরিবারের মঙ্গল হবে, সমাজের কল্যাণ হবে।

আয় গোপন না করার সুফলের পক্ষে এখানে একটা উপমা দেওয়া যায়। একবার এক আমেরিকান তার দফতরের এক বাংলাদেশি সহকর্মীকে বলছে, তুমি তো জানো, আমার ২টি সন্তান। ১টি ৪, অপরটি ২ বছরের। আমার আয়ই সংসারের একমাত্র উপার্জন। আমি কত আয় করি তা আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে Share করি। প্রতি মাসে সংসারের বাজেট করি (তাদেরকে নিয়ে) নিজের আয়ের মধ্যে। সেখানে অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তারপর কী হলো, একবার তার বড় ছেলে খেলনা নেবে বলে আবদার করল। ক'দিন পর তিনি তাদেরকে নিয়ে Toy Shop-এ গেলেন। তারা (বাচ্চারা) খুশি হয়ে খেলনা পছন্দ করে নিয়ে এল। তখন ওই ভদ্রলোক তাদেরকে নিয়ে দোকানের এক কর্নারে গিয়ে মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসলেন এবং পরে বড় ছেলেকে বললেন, তুমি জানো তোমার বাবার আয় কত। তুমি এও জানো সবার প্রয়োজনের প্রাধান্য দিয়ে সেই আয়ের মধ্যেই কাট-ছাঁট করে আমরা প্রতি মাসের খরচের বাজেট করি। তদ্রূপ এ মাসের ব্যয়ের বাজেটও করা হয়েছে। ছেলেটি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল। তখন বাবা বললেন, এই খেলনাটির দাম ৫০ ডলার। যদি তুমি এটা নাও বা কেনো, তাহলে বাজেট থেকে সমমূল্যের একটি জিনিস বাদ দিতে হবে। কারণ বাজেটের প্রতিটি আইটেমই খুবই দরকার এবং কোনোটাই বাদ দেয়ার মতো নয়। এখন তুমি বলো, কোনটা বাদ দিয়ে খেলনাটি কিনবে? তখন ছেলেটি কী বলল, শুনলে অবাক হবেন। নিজের মুখে প্রশান্তির আভা ছড়িয়ে ছেলেটি তখন বলল, 'Dad, I don't need this toy now.' কেন এমন হলো? কারণ ওই ছেলেকে ছোটবেলা থেকেই স্বচ্ছতা দেখানো হয়েছে, শেখানো হয়েছে আয়ের মধ্যে ব্যয় করতে। তাই সে সংযমী হয়েছে, সংযত হয়েছে। ছোটজনও এটা শিখল। এটা না করলে অর্থাৎ যেভাবেই হোক তার চাহিদা মেটালে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উল্টো হয়ে যেত। ছেলেটি হয়তো মানুষ হতো না, বেয়াড়া, উচ্ছৃঙ্খল হতো। এই উদাহরণ থেকে একটা শিক্ষা পাওয়া গেল যে, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে, ভালো-মন্দ চিন্তা না করে, Right & Left টাকা কামিয়ে লাভ নেই। তাতে নিজের ক্ষতি, সংসারের ক্ষতি, সন্তানদের ক্ষতি, বর্তমানের ক্ষতি, ভবিষ্যতের ক্ষতি। কারণ, মৃত্যুর পর সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। রেখে গেলে তা টিকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর জন্য সন্তানদের বিপদও হতে পারে। তাই স্বচ্ছতা নিয়ে চলাই সর্বোত্তম পন্থা।

২৬. বেশি কথা/মিথ্যা কথা

বেশি কথা বলা ঠিক না। বেশি কথা বললেই বাজে কথা এসে যায়। আবার কথায় কথা বাড়ে। কথা অশান্তি বাড়ায়। অপরদিকে, একটা প্রবাদ আছে - Easier said than done অর্থাৎ **বলা সহজ, করা কঠিন**। আগবাড়িয়ে কথা বললে এবং কথামতো কাজ করতে না পারলে ওই বলাটা মিথ্যে হয়ে যাবে এবং তাতে নিজের ওজন কমে যাবে। তাই মিথ্যে বলা ঠিক না, এটা পাপ। একটি মিথ্যা ঢাকতে দশটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও পার পাওয়া যায় না। মিথ্যা বললে সেটা মাথার বিভিন্ন ডিস্কে অর্গানাইজ করে রাখতে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্যতের আচরণ চালাতে হয় বা কথা বলতে হয়। এরূপ না করলে ধরা খেয়ে যেতে হয়। এটা অর্গানাইজ করা একটা অপ্রয়োজনীয় এবং বাড়তি স্নায়ু ঝুঁকির কাজ। এতে ব্রেইনের সেল অযথা ক্ষয় বা নষ্ট হয়। পক্ষাঘাতও হতে পারে। পুনরায় বলি, অসঙ্গত কথা বললে মানুষের কাছে ফট্কাবাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়, সমাজে ও সংসারে মূল্য কমে যায়। কেউ বিশ্বাস করে না। জীবনধারণ কঠিন হয় যাতে রোগ-ব্যাধি বেড়ে শরীর এবং মনের ক্ষতি হয়, অকালমৃত্যুর ঝুঁকি দেখা দেয়। পঙ্গু হলে অযথা অন্যের গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকতে হয়, নিজের সন্তান পর হয়ে যায়। এ সবই অসহনীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক দুর্ঘটনা। আল্লাহ্ যেন শত্রুকেও এমন পরিস্থিতিতে না ফেলেন। তাই ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'Don't over sell. Promise only what you can deliver & Deliver quickly.' অনেক সময় দেখা যায়, শোনা যায়, অনেকে মিথ্যা বলার পরও ভালো থাকে। কিন্তু সে ভালো ভালো নয়। ওই ভালোর বিপরীতে পাল্টা মন্দ লুকিয়ে থাকে, সময় হলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ, আলোর পর অন্ধকার, এটা চিরন্তন সত্য।

'Deed & Dialogue'-এ Harmony রেখে চললে ঝামেলা এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে একটি বাচ্চা ছেলের মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করানোর জন্য আমাদের রাসূল (সঃ)-এর মিষ্টি খাওয়া বন্ধকরণের একটি কাহিনী কারও অজানা আছে বলে মনে করি না।

আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, 'গুলি আর বুলি' ছুড়ে দিলেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই অপরিণামদর্শী হয়ে অযথা কথা বলা আর গুলি ছোড়ার মতো মারাত্মক কাজ করা উচিত নয়। করলেও বুঝে-শুনে করা উচিত। যিনি দুই নম্বরি করেন অর্থাৎ দুর্নীতি করেন, ফটকাবাজি করেন, তার ছেলেমেয়েরা কখনও মানুষ হয় না। চাকচিক্য দেখিয়ে, ফুটানি করেই তারা শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে, যারা ধৈর্য ধরে, কষ্ট করে হলেও সততার সঙ্গে চলে, তারাই এগিয়ে যায়, ভালো

থাকে, যদিও আর্থিক কষ্টে থাকে। তাই সৎ থাকুন এবং সততার নির্ভেজাল উপকারিতা উপভোগ করুন।

২৭. আয় কম, দায় বেশি

অনেক সময় অনেকের পক্ষে লোভ এবং চাহিদা সংবরণ করা সম্ভব হলেও সীমিত আয়ে নিজের চলা, সংসার চালানো, মা-বাবাকে দেখা সম্ভব হয় না। তাই আপনি হয়তো দুশ্চিন্তা করেন, কাজে মন বসে না, ভুল হয়। এই ভুলের কারণে বা কাজে অমনোযোগিতার কারণে বস মেজাজ করেন এবং আপনার ওপর খারাপ ধারণা নেন। একটা কথা আবারও বলতে হয়, **দুশ্চিন্তা কখনও কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না।** তাই অভাবের কারণে অযথা দুশ্চিন্তা না করে একটা বাস্তব কথা ভাবুন, আমার এই বেতনে না পোষালেও এটা রক্ষা করার জন্য বা এটা টিকিয়ে রাখার জন্যই আমাকে পর্যাপ্ত কাজ করতে হবে। এটা হারালে কী করে খাব? আগে বলেছি, আবারও বলি, বেকারত্বের বাজারে অতি সহজে মালিকরা আমার জায়গায় আমার চেয়ে কম বেতনে অন্যকে নিয়োগ দিতে পারেন। তাই Seriously ভাবতে হবে, আল্লাহ্ না করুক, এরূপ হলে আমার কী হবে? যেটুকু পাচ্ছি সেটুকুও পাব না। Something is better than nothing. এরূপ চিন্তা করলে ধৈর্য-ধারণের উপলব্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি বাড়বে। দুশ্চিন্তা কমে যাবে, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে দ্বিধাবস্থার নিরসন করতে নিচের অনুশাসনগুলো উপকারে আসতে পারে :

- চাহিদা এবং লোভসহ অন্য সব রিপুকে দমন করে নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- ওপরের দিকে নয়, নিচের দিকে তাকান। দেখবেন, আপনার ছেলেবেলার সাথী অনেকের চেয়ে আপনি অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো আছেন। এই ভেবে সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করুন।
- ওপরওয়ালাদের অর্থাৎ ধনী লোকদের আড়ম্বর দেখে না পাওয়ার বেদনায় কাতর হয়ে অস্থির হবেন না। এরূপ ভাবনা আপনাকে অশান্ত করতে পারে, অসৎ ও আত্মঘাতী বানাতে পারে।
- পুনরায় বলি, পরিবারের সবার জ্ঞাতসারে নিয়মিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করুন। অর্থাৎ আয় কত, ব্যয় কত তা পরিজনদের জানান। দেখবেন আপনার কাছে তাদের চাহিদা কমে গেছে, আপনার অভাবও কমে যাবে তাতে। এতে আপনি ভালো থাকবেন। সংসারে, সমাজে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে যাবেন।

• সততার সঙ্গে, কাজের প্রতি মনোযোগী হন, প্রত্যয়ী হন, সবাই আপনাকে ভালোবাসবে, বিশ্বাসও করবে।

ভালো থাকার এটাই মোক্ষম উপায়। মনে রাখবেন, **আল্লাহ্ দিলে ফুরায় না, বান্দা দিলে কুলায় না।** তাই সর্বশক্তিমানের বা সৃষ্টিকর্তার ওপর নির্ভর করুন। কিছু চাইতে হলে একাগ্রচিত্তে তার কাছেই চান। ঠিকমতো চাইতে পারলে আপনি তা পাবেনই। তাই তো একটা প্রবাদের পুনরাবৃত্তি করে বলি, **ডাকার মতো ডাকলে পরে কেন দেখা দেবে না, খোদা তোমায় ডাকতে জানি না।** আমাদের চাওয়ায় গলদ থাকে, ফাঁক থাকে, তাই পাই না। না পেয়ে হা-হুতাশ করি, ভেঙে পড়ি, এভাবেই শেষ হয়ে যাই। এটা ঠিক নয়। পরে ভুল ভাঙলে অনুতাপ করি। তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। বেলা গড়িয়ে রাত আসে। রাতের অন্ধকার তখন আমাদের ভালো উপলব্ধিকে গ্রাস করে। তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়, অসমতার গভীর কষ্টের ঘন তমসায় খেলা শেষ হয়ে যায়, বেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে। তাই আসুন, সংসারের সবাইকে নিজের সামর্থ্যের কথা, সঙ্গতির কথা, সংযমের কথা অকপটে জানিয়ে দেই, নিজের দায়ভার কমাই। তাহলেই দেখবেন, আপনার পরিজনরা না পেয়েও আপনার প্রতি বিষণ্ন হবে না, বরং প্রসন্ন থাকবে এবং তখন আপনাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

২৮. অতি প্রশংসার কুফল

প্রশংসার বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। আমরা অনেক সময় মানুষকে একটু বেশি প্রশংসা করে বসি, যা অনেককে অহংকারী, লোভী, স্বার্থপর এবং সংঘাতী বানায়। ফলে তারা দুর্নীতি করে বসে। এর কুফলে তারা ভোগে, সমাজ ভোগে। তাই প্রশংসা করতে হবে মানুষের কাজকে, মানুষকে নয়। কেউ ভালো কাজ করলে তাকে মাথায় তুলে বলতে হবে, এরপর খারাপ কাজ করলে বেশি আঘাত দেয়ার জন্য মাথার ওপর থেকে জোরে আছাড় মারা হবে। অর্থাৎ আগের ভালো কাজের রেশ না টেনে এখনকার খারাপ কাজের জন্য তাকে বেশি করে তিরস্কার করা হবে। এরূপ করলে অতি প্রশংসার কুফল দমিত হবে। সবাই সজাগ হবে এবং সতর্ক থাকবে। খারাপ কাজ এড়িয়ে ভালো কাজ করবে এবং তাতে তাকেও তিরস্কার শুনতে হবে না। মনে রাখতে হবে, সব প্রশংসা স্রষ্টার; তার অনবদ্য সৃষ্টির কারণে। সব মানুষ এরূপ করলে দুনিয়ায় অশান্তি কমবে। মিথ্যা প্রশংসা পেতে এবং ক্ষণস্থায়ী সম্পদের লোভে একে অপরের ঘাড়ে পা দিয়ে ওপরে ওঠার মতো আত্মঘাতী তৎপরতা ও অসম প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে। বিভ্রান্তি কমে যাবে। প্রশংসা বা ভক্তি পেতে মানুষ যে কতটা উদগ্রীব হয়, তা একটা কবিতার দুটি লাইন থেকে আরও পরিষ্কার হবে।

‘রথ-যাত্রা লোকারণে মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে সবে করিছে প্রণাম।
রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।’

তাই আমরা একনিষ্ঠ হয়ে, লক্ষ্য স্থির করে, অন্তর্যামীকেই ডাকব। তার কাছেই চাইব, তাহলেই নিজেকে তার শ্রেষ্ঠ মাখ্‌লুকাত হিসেবে প্রমাণ করতে পারব। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ প্রকৃতির মধ্যেও আছে। যেমন, সব মাখলুকাতের মধ্যে মানুষের মাথাই কেবল উঁচু হয়ে থাকে। আর একটা প্রমাণ এভাবে দেয়া যায়, আল্লাহ্‌ অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে বা উপকারে কাজে লাগার জন্য।

ওপরের অনুচ্ছেদের মূল শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ হল্লায় গোল্লায় যায়, উল্লাসে ফেটে পড়ে, দিকবিদিক হারায়। প্রশংসা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে দুঃসাহসী কাজ করে বসে। মনে রাখতে হবে, প্রশংসা হচ্ছে Reward of Good Work. ভালো কাজ না করেও কেউ প্রশংসা করলে অথবা কাজের চেয়ে বেশি প্রশংসা করলে সতর্ক হতে হবে, সাবধান হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কারও অযাচিত বা অতি প্রশংসার পেছনে তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা স্বার্থপর কোনো পরিকল্পনা থাকতে পারে। প্রশংসার লোভ এবং মোহ প্রতিরোধ না করতে পারলে খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়বেন। নিজেরই ক্ষতি হবে তাতে। আপনার প্রশংসাকারী আপনাকে বিপাকে ফেলে, নিজে লাভ করে, নিশ্চিন্তে পার পেয়ে যাবে।

তাই কাউকে অযথা প্রশংসা করব না, অতি প্রশংসা করব না, কারও প্রশংসা কানেও তুলব না। কারণ, সব প্রশংসাই সৃষ্টিকর্তার - এটাই নিয়ম, এটাই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মেনে চলব।

২৯. খারাপ হওয়ার কারণ ও প্রতিকার

মানুষ খারাপ হয় অভাবে ও স্বভাবে। স্বভাবের খারাপ আসে লোভের কারণে। অভাবের খারাপ আসে সুস্থ চিন্তার ঘাটতি ও মনোবলে দুর্বলতার কারণে। অর্থাৎ, দুর্বলচিত্ত মানুষ অনেক সময় আর্থিক অনটনের চাপে কাবু হয়ে যায় বেসামাল চাহিদার কাছে। দিশেহারা হয়ে ব্যক্তিত্ব হারায়, মনের বল হারায়। তাই তারা সক্রিয় হয় অসৎ হতে, নিস্তেজ হয় খারাপ কাজে নিষ্ক্রিয় হতে। অসৎ কাজে সক্রিয় হলে লোভ তাদেরকে গ্রাস করে, পাপী বানায়। আরও অসৎ হতে ইন্ধন জোগায়। তারা সব সময় সেই চিন্তায়ই থাকে, কখন কার ক্ষতি করে নিজের লাভ করবে। তারা ভাবে, কার কী ক্ষতি হলো তা তার দেখার বিষয় নয়, তার লাভ

হতেই হবে। অর্থাৎ উপসংহারে বলা যায়, দুশ্চিন্তা বা Worries ঠিক নয়। তাই আবারও বলি, 'Worries achieve Nothing.' অতএব, অহেতুক দুশ্চিন্তা করে জীবনের দাম কমাবেন না, ঝুঁকি বাড়াবেন না। সীমার মধ্যে চলুন, ভালো থাকুন। লোভ সংবরণ করুন, চাহিদাকে জোগানের সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলুন, তাতে ঠিক থাকবেন, খারাপ হবেন না। জীবনকে উপভোগ করতে পারেন। আপনার ভবিষ্যৎ বংশধররাও এরূপ করলে ভালো থাকবে। এটা পরীক্ষিত সত্য।

তৃতীয় অধ্যায়

আচার- আচরণ, নম্রতা- ভদ্রতা এবং আদর্শ (Etiquette, Manner)

১. আচরণ

জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ-নির্বিশেষে মানুষের আচার-আচরণ তার চরিত্রের এবং জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব সমাজের বেলায় প্রযোজ্য। ভালো মানসিকতা, সৎ স্বভাব, নম্র ব্যবহার, বিনয়ী আচরণ, ভদ্র ভঙ্গি এবং সর্বোপরি সদা হাসিমুখ, মানুষের রুচি-প্রকৃতি, মন-মানসিকতা এবং চরিত্রের প্রতিবিম্ব হিসেবে কাজ করে। ওই গুণাবলি মানুষের নিজের এবং তার পরিবারের মর্যাদার বা মানের পরিচয় বহন করে। মানুষের মুখের দিকে তাকালেই ওই সময়ে তার মনের অবস্থা কেমন তা অনেকটা আঁচ করা যায়। তাই তো ইংরেজিতে বলে **Face is the Miror of Mind.**

কর্মীদের ভালো আচার-ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বাড়ায়, যা গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আস্থা বাড়ায়। অপরদিকে গোমড়ামুখী বা ভণ্ড লোকেরা প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক তাড়ায়, ব্যবসা কমায়। ব্যাংকের ব্যাপার বলতে গেলে বলতে হয়, ব্যাংকের অতিথি মানেই তার গ্রাহক। ব্যাংকারের ব্যবহার সন্তোষজনক হলে, গ্রাহক ভালো ব্যবহার পেলে, তার কাজ না হলেও তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই ভালো ব্যবহারই ব্যাংকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। To say `No' is an Art & a Banker must know, how to say `No'. তাই সব গ্রাহককে আন্তরিকতার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, স্বাগতম জানাতে হবে নিজের অঙ্গনে। কারণ, **গ্রাহকই আমাদের প্রভু, আমরা তাদের সেবক।** এটা মনেপ্রাণে মানতে হবে। না মানলে সহজ হওয়া যাবে না। সহজ না হলে নমনীয়তা আসবে না। নমনীয়তা না থাকলে ভালো ব্যবহার এবং সেবা দেয়া যাবে না।

আগেই বলা হয়েছে, ব্যাংক-ব্যবসা টাকা তথা সেবা লেনদেনের ব্যবসা। ব্যাংকের ব্যবসা সাধারণত টাকার বিনিময়ে, দৃশ্যমান বস্তু বা জিনিসের আদান-

প্রদান বা কোনো দৃশ্যমান বস্তু কেনা-বেচার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কেনা-বেচা হয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বস্তুগত পণ্যের। এই বেচা-কেনার সহায়ক শক্তি হচ্ছে টাকা এবং ওই টাকা লেনদেনের মধ্যস্থতাকারী হচ্ছে ব্যাংক। ব্যাংকের এই মধ্যস্থতা-কাজের বিষয়টি অদৃশ্য অথচ মূল্যবান। এর নামই পণ্য বা মানসম্পন্ন সেবা। সেবা দিতে লাগে শুধু দৃঢ়প্রত্যয় এবং সেই প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রয়োজন হয় কঠোর পরিশ্রম। এ দুটোতে কোনো খরচ হয় না। অর্থাৎ প্রত্যয় ও পরিশ্রম এই দুটি উন্নতির চাবিকাঠি এবং এটা শুধু ব্যাংকারদের জন্যই নয়, সব মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এভাবেও বলা যায়, ব্যাংক কার্যক্রমের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেবা এবং উপলক্ষ ব্যবসা। তাহলে ব্যাংক অতি লাভের লোভে বিপদে পড়বে না। আর এই কারণে কীভাবে, কোন কৌশলে ব্যাংকের সেবার মানকে গ্রাহকের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তার কিছু অনুশীলন এবং উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

২. প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ

■ গ্রাহক সামনে এলেই বা অধস্তনদের কাউকে ডাকলে অর্থাৎ সাহায্য চাইলে তাদের সামনে এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং প্রথমেই 'স্যার' বলে সম্বোধন করে আন্তরিক ও প্রসন্ন মুখে সালাম দিতে হবে এবং বিনয়ের সঙ্গে নম্র সুরে 'কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' এই কথাগুলি বলে, তাকে স্বাগতম জানাতে হবে।

■ গ্রাহককে **কখনও কড়া সুরে বলা যাবে না,** 'হ্যালো কী চাই?' বা 'এই যে, কী চাই?' বা 'ভাই কী চাই' ইত্যাদি।

■ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়, (গেঞ্জি এবং আন্ডারওয়্যার ইত্যাদি পরিচ্ছদ প্রতিদিন ধোয়া) জুতা পরিধান করা। গায়ে বা পরিধেয় বস্ত্রে কোনো প্রকার উগ্র গন্ধ বা দুর্গন্ধ না থাকা।

■ মোনাফেকি করে অর্থাৎ কানকথা বলে একের সঙ্গে অন্যের বিবাদ বাধিয়ে দেয়া মারাত্মক অপরাধ। এটা কখনও করা যাবে না। পারলে বিবাদ মেটাবেন, না পারলে বাধাবেন না। বিবাদ মেটানো স্বর্গীয় কাজ।

■ গ্রাহকের প্রতি মনোযোগ দেয়া তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রথম শক্তিশালী উপাদান।

■ স্বাভাবিকভাবে কথা বলার সময় শ্রোতার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা, অন্যদিকে না তাকানো। বক্তার চোখে যেন উগ্রতা বা উদ্বিগ্নতা না থাকে; প্রশান্তি এবং সাবলীলতা থাকে যেন সেদিকে যত্নবান হতে হবে।

■ মনোযোগ দিয়ে গ্রাহক বা অতিথির কথা শোনা ও সঠিকভাবে জবাব দেয়া এবং তার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ভাব প্রকাশ করা।

- বলার সময় প্রতিটা শব্দ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে উচ্চারণ করুন। গলার স্বর পরিষ্কার ও সরস রাখুন, ঠোঁটে হাসির আভা রাখুন, তবে দাঁত বের করে নয়। কখনও দ্রুত বা ঘন কথা বলবেন না। কথা বলার সময় বাহ্যিক অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি করবেন না। সাবলীল থাকুন।
- কথা বলা বা শোনার সময় কখনও ঘাড় ঝাঁকুনি দেবেন না বা উদাসীন বা উপেক্ষার ভাব দেখাবেন না।
- একই সময়ে বা একসঙ্গে একাধিক লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না। আগে বলেছি, আবারও বলি, বিশেষ প্রয়োজন হলে প্রথম ব্যক্তিকে Excuse me বলে অর্থাৎ তার অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে সংক্ষেপে কথা শেষ করুন। তারপর প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে এসে sorry বলে, পুনরায়, যেখান থেকে ছেড়ে গেছেন সেখান থেকে কথা বা আলাপ শুরু করুন।
- কথা বলা বা শোনার সময় গুপ্ত কলাকৌশল দেখাবেন না বা কোনো রকম চালাকি করবেন না।
- ছেলেদের চুল লম্বা না রাখা, নিয়মিত চুল ছেঁটে রাখা বাঞ্ছনীয় । চুল লম্বা হলে পেছনে সুন্দর করে বেঁধে রাখতে হবে।
- **শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে** প্রতিদিন সাবান বা জেল দিয়ে শরীর এবং শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়া বা পরিষ্কার করা এবং তারপর অল্প সরিষার তেল হাতের তালুতে নিয়ে ভালো করে ফেটে হালকা করে চুলে, গায়ে, মাথায় মেখে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলা আবশ্যক। তাহলে তেলে কাপড় নষ্ট হবে না। তাতে তেলের গন্ধ গায়ে থাকবে না, অথচ ত্বক ও চুল মসৃণ থাকবে। সামর্থ্যে কুলালে Olive oil-ও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া শরীরের অবাঞ্ছিত লোম নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- আবারও বলি, কথা বলা বা শোনার সময়, Body Language অর্থাৎ দেহের ও মুখের ভাব-ভঙ্গি সুশীল এবং সাবলীল করা, যাতে গ্রাহক বা অতিথি খুশি হয়। কথা শোনার সময় মাঝে মাঝে 'স্যার', 'স্যার' বলে সম্মতি দেয়া, যাতে গ্রাহক বা বক্তা বুঝতে পারেন যে তার কথা শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন এবং বুঝছেন।
- কথা শোনার মাঝখানে স্টাইল করে 'সমস্যা নেই' বলা এবং পরে সমস্যার কারণে তার কাজে বিলম্ব করা যাবে না। সমস্যা থাকলে প্রথমেই বিনয়ের সঙ্গে জানাতে হবে। এতে আপনার ওপর তার আস্থা বাড়বে।
- চুল, নখ, দাঁড়ি ও শরীর পরিষ্কার, পরিপাটি রাখতে নিয়মিত Manicure এবং Pedicure করানো।
- **মুখের দুর্গন্ধ এড়াতে** এবং দাঁত ভালো রাখতে ধূমপান, পান-জর্দা, গুল ইত্যাদি নেশাজাতীয় বদভ্যাস (যদি থাকে) ছাড়তে হবে। ধূমপান না করাই উত্তম। এছাড়া দিনে দু'বার পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে হবে। খাওয়ার পর

ডেন্টাল ফ্লস বা টুথপিক দিয়ে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা বের করে ব্রাশের সাহায্যে মুখগহ্বর ঈষৎ গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে হবে। মাঝেমধ্যে মাউথওয়াশ দিয়ে কুলকুচি এবং ঘন ঘন লবণ মিশ্রিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা ছাড়াও ফ্রেশ নিঃশ্বাসের জন্য প্রয়োজনে মাউথ স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন।

- মুখের মধ্যে কিছু রেখে অতিথির সামনে চিবানো ঠিক নয় এবং কখনও চিবানোর সময় মাড়ি বা দাঁত দেখানো বা শব্দ করা যাবে না।
- দাড়ি-গোঁফ নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং ছেঁটে রাখা বাঞ্ছনীয়।
- নাকের চুল নিয়মিত ছেঁটে রাখা আবশ্যক।
- সবার সামনে নাক খোঁটানো, দাঁতে নখ কাটা, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানো এবং কানে কটন বার বা কিছু দিয়ে খোঁচানো যাবে না।

৩. দাফতরিক পোশাক- পরিচ্ছদ (Dress Code)

❖ কাজে যাওয়ার পূর্বে শার্ট-প্যান্ট বা কর্মস্থলের দেয়া ইউনিফর্ম (যদি থাকে) ধুয়ে ইস্ত্রি করে পরা, বোতামসহ প্যান্ট-শার্ট পরা এবং মোটামুটি রুচিসম্মত বকলেসসহ বেল্ট সুন্দর করে পরা বাঞ্ছনীয় এবং আগের রাতেই এসব গুছিয়ে রাখতে হবে, যাতে সকালে কোনো টেনশন করতে না হয়।

❖ অফিসে এসেই প্রথমে নিজেকে settle করা এবং তারপর অফিসের কাজের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রস্তুত করা, যাতে কাজ করার সময় কোনো বিরক্তি বা বাধা না আসে।

❖ শার্টের বুকপকেটে কলম ছাড়া অন্য কিছু রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

❖ খাওয়ার সময় শার্টের আস্তিন না গোটানো, সাবধানে খাওয়া যাতে কাপড় নষ্ট বা নোংরা না হয়।

❖ জুতা পলিশ করে পরতে হবে। পরিষ্কার মোজা পরতে হবে, যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। একই মোজা পরপর দু'দিনের বেশি পরা উচিত নয়। পা ঘামলে প্রতিদিন মোজা বদলাতে হবে। কালো জুতা এবং কালো মোজা ব্যবহার করা শ্রেয়। ঘড়ি জুতার সঙ্গে ম্যাচিং হলে ভালো হয়।

❖ কাজের সময় মোবাইল সেট সাইলেন্ট মোডে রাখা, যাতে নিজের এবং অন্যের মনোযোগ নষ্ট না হয়।

❖ কোট বা জ্যাকেটের বোতাম বসার সময় খোলা রাখা, তবে দাঁড়ানোর সময় একটা বোতাম লাগিয়ে রাখা শ্রেয়।

❖ ২ বোতামের কোট হলে চলা বা দাঁড়ানো অবস্থায়, প্রথম (ওপরের) বোতামটি লাগিয়ে রাখা এবং ৩ বোতামের কোট হলে দ্বিতীয় বোতাম লাগিয়ে রাখা ভালো।

❖ প্যান্টের চেইন বা জিপার সময়মতো পরখ করা, যাতে স্বাভাবিক সময়ে খোলা না থাকে।

❖ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়ানো বা হাঁটা উচিত নয়।

❖ মানিব্যাগে (Walet) অন্য কোনো কাগজপত্র নয়, শুধু মুদ্রার নোট এবং কার্ড রাখা।

❖ সাদা, পরিষ্কার এবং ইস্ত্রি করা রুমাল ব্যবহার করা উত্তম।

❖ ভ্রমণে যাওয়ার আগে নিজের প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এবং কাগজপত্র **নিজে গুছিয়ে নিতে হবে**। বিদেশ ভ্রমণের সময় নিষিদ্ধ কোনো জিনিস যেমন, ধারালো ছুরি, বিস্ফোরক, তরল এবং পাউডার জাতীয় জিনিস সঙ্গে নেয়া যাবে না। নির্ধারিত ওজনের মালামাল (লাগেজ) দুই সুটকেসে নেয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশে চলাফেরার সময় পাসপোর্ট, পারমিট ইত্যাদি সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

৪. অফিস আচরণ

➢ প্রতিদিন সকালে সময়মতো (অফিস শুরুর আধা ঘণ্টা আগে) অফিসে ঢুকেই হাসিমুখে উপস্থিত সবাইকে সালাম দেয়া এবং হাজিরা খাতায় সময় উল্লেখ করে স্বাক্ষর করা বা মেশিনে আঙুল পাঞ্চ করা। এই প্রথা নিজেকে দেরি করে অফিসে না আসতে বাধ্য করবে, লজ্জা দেবে, প্রতিরোধ করবে।

➢ দরজায় নক্ বা টোকা না দিয়ে কারও কেবিনে ঢোকা অশোভন।

➢ কোনো অপরিহার্য কারণে কখনও সময়মতো অফিসে আসতে না পারলে বা দেরি হলে ট্রাফিক জ্যাম ইত্যাদির অজুহাত না দেয়া এবং আন্তরিকভাবে Sorry বলা। আর কখনও দেরি হবে না বলে বসকে আশ্বস্ত করা। কারণ ট্রাফিক জ্যাম নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং এটা ম্যানেজযোগ্য। এরূপ করলে Sorry না বলতে Serious হওয়া যাবে এবং তাতে রোজ রোজ Sorry বলার লজ্জা বা বিড়ম্বনা এড়ানো যাবে। প্রতিদিন সময়মতো অফিসে এলে ACR-এর Punctuality কলামে A+ রেটিং দাবি করা যাবে।

Sorry-এর কথা আগেও বলা হয়েছে, আবার এখানেও বলা হচ্ছে। কারণ, চলতে, বলতে, করতে সব সময়ই আমরা Sorry শব্দটির অপব্যবহার করে যাচ্ছি সুচতুরভাবে।

মনে রাখতে হবে, Sorry একটি আমদানিকৃত শব্দ। বিনা এলসিতে, বিনা পরিবহন ব্যয়ে বা বিনা পাসপোর্টে, বিনা ভিসায় এই শব্দটা আমদানি হয়ে এসেছে আমাদের সভ্যতার বাজারে। আমরা অন্যায়ভাবে এর ফায়দা লুটছি। বিদেশে এই শব্দটাকে অপমানকর হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। তাই তো নতজানু বা মাথা হেঁট করার এই শব্দটি ব্যবহার করতে তারা খুব অনীহ হয় এবং সজাগ বা সতর্ক

থাকে, সচরাচর কেউ সহজে ব্যবহার করে না। আমাদের দেশে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। এখানে মনে করা হয়, Sorry বলা মানে স্মার্টনেস দেখানো, কাজ না করে পার পাওয়া। Sorry বলে বসকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো যায়। এরূপ আচরণ আমাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে হেয় করে, মনুষ্যত্বকে খাটো করে, অপমান করে।

➢ অফিসে পৌঁছাতে দেরি হবে মনে হলে যতটা সম্ভব পর্যাপ্ত সময় আগে বসকে সরাসরি জানানো (কারও মাধ্যমে না হলেই ভালো)। অর্থাৎ, অফিসে রওনা দেয়ার আগে অথবা পথিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে ওই অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে বস্‌কে জানানো (ফোনে বসকে না পাওয়া গেলে SMS করে)। পরে অফিসে পৌঁছেই অথবা সুযোগ বুঝে তাঁকে বিস্তারিত জানানো। তবে পুনরায় জোর দিয়ে বলি, দেরির সপক্ষে ট্রাফিক জ্যাম, যান বিকল বা অন্য কোনো অসুবিধা বা সমস্যার অজুহাত দেখানো যাবে না। কারণ তা ম্যানেজযোগ্য এবং এটা একতরফাভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব সমস্যা, এটা অফিসের সমস্যা নয়। তাই এসব সমস্যা নিজেদেরই ম্যানেজ করতে হবে। অফিসের ঘাড়ে এর দায় চাপানো যাবে না। অফিস আমার সমস্যা বা সমস্যার অজুহাত ক্রয় করেনি, ক্রয় করেছে আমার সার্ভিস অর্থাৎ অফিসের সময়ে আমার কাজকে।

➢ ছুটি পাওনা থাকলেও সামান্য বা পরিহার্য কারণে বা কোনো হালকা অজুহাতে বা অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বা পারিবারিক সমস্যার কথা বলে অফিসে না এসে বাসায় আরাম করা বা নিজের কোনো কাজ করা উচিত নয়। এতে আপনার প্রতি অফিসের ধারণা খারাপ হয়। তাই এরূপ করা যাবে না। এটা আত্মপ্রবঞ্চনা। এছাড়া মনে রাখতে হবে, আমার প্রতি বসের বিশ্বাস থাকলে এবং অফিসের প্রতি আমার আন্তরিকতা থাকলে কোনো অজুহাতের বাহানা আমার কাছে প্রশ্রয় পাবে না। কারণ, আমার দুটি সংসারের মধ্যে প্রথম সংসার আমার চাকরি বা কর্মস্থল এবং দ্বিতীয় সংসার আমার পরিবার বা ঘর। তাই জানতে এবং মানতে হবে, আমার প্রথম সংসার দ্বিতীয় সংসারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রথম সংসারের টাকা দিয়েই দ্বিতীয় সংসার চলে।

➢ অফিসে কাজ করার জন্য প্রতিদিন শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত (ফিট) থাকা অতীব জরুরি।

➢ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বা বসের নির্দেশ মেনে মনোযোগ দিয়ে আগ্রহ সহকারে কাজ করুন। গোচরে বা অগোচরে কোনোভাবেই বসের নির্দেশের অবমাননা, সমালোচনা বা বিরোধিতা করা অসমীচীন এবং অগণতান্ত্রিক। কারণ বসের নির্দেশ তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানপ্রসূত, অভ্যাসগত বা ভাবপ্রবণ নয়। সর্বোপরি, এটা অফিসের ভালোর জন্যই। তবে বসের নির্দেশ ভুল বা খারাপ হলে বা নিরপেক্ষ না হলে তাকে সময় বুঝে, সন্তর্পণে এবং সঙ্গোপনে জানিয়ে দিন। অবশ্যই তিনি তা মানবেন এবং আপনাকে তার জন্য যথাযথ মূল্যও দেবেন।

কারণ আপনি তার ভুল ধরে দিয়ে তাকে সংশোধন হতে সুযোগ দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, Everybody is blind to his own fault. ভালোভাবে চললে অফিসের প্রতি আপনার অনুরাগ বাড়বে এবং অফিসে আপনার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে। তবে বস্ আপনার কথা শোনেন বা মানেন বলে নিজের আচরণের গণ্ডি বা স্তর অতিক্রম করা, স্বেচ্ছাচারী হওয়া বা বসকে উপেক্ষা করে অফিসে মাতব্বরি করা যাবে না। শালীনতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে, অফিস ডেকোরাম মেনেই কাজ করতে হবে।

➢ সার্ভিসের ত্রুটির কারণে গ্রাহক অযৌক্তিক মেজাজ দেখালেও তার উত্তরে অভদ্র আচরণ করা যাবে না। যেমন– তার ওপর গরম হওয়া, রূঢ় স্বরে জবাব দেয়া বা কথার উত্তর না দেয়া, অন্যদিকে তাকানো, তাকে অগ্রাহ্য করা অথবা 'এটা আমার কাজ নয়' বলে তাকে অন্যদিকে যেতে বলা ইত্যাদি করা যাবে না। বরং নমনীয় হয়ে, তাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে তার অনুমতি নিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এসব করতে অপরিহার্য অপারগতা থাকলে বিনয়ের সঙ্গে তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে তিনি রুষ্ট না হন, কষ্ট না পান।

➢ হাঁচি-কাশি দেয়া বা হাই তোলার আগে, প্রথমে Excuse me বলে, সঙ্গে সঙ্গে নাকে-মুখে রুমাল বা কাপড় দিয়ে হাঁচি দিন। যাতে হাঁচির ছিটা কারও দিকে না যায়। হাঁচির আগে Excuse me বলতে না পারলে হাঁচির পরপরই অবশ্যই Sorry বলতে হবে। এই Sorry আর সেই Sorry এক নয়। এই Sorry মাফ চাওয়া আর ওই Sorry অনুতপ্ত হওয়া।

➢ অন্যের সামনে ঢেকুর তোলা যাবে না।

➢ আবারও বলি, নিয়মের বাধ্যবাধকতায় গ্রাহক আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশিত কাজ না পেলেও তিনি যেন ভালো ধারণা নিয়ে যান, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ, আদরের সঙ্গে **না** বলতে হবে। কারণ, এটা একটা কৌশল এবং যোগ্যতা। ব্যাংকারকে অবশ্যই এই কৌশল রপ্ত করতে হবে।

➢ গ্রাহকের বা কারও প্রশ্নের জবাবে কখনও পাল্টা প্রশ্ন করা বা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দেয়া যাবে না। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাব স্পষ্টভাবে এবং সংক্ষেপে অর্থাৎ To the Point-এ দিতে হবে। প্রশ্নের উত্তর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তাতে আপনার কাছ থেকে তিনি কাজ না পেলেও খারাপ ধারণা নিয়ে যাবেন না। আপনাকে অন্তত অভদ্র ভাববেন না এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিও তিনি ভালো ধারণা নিয়ে যাবেন। এটাই আপনার সম্মান, আপনার পরিবারের সম্মান। প্রতিষ্ঠানের Good will নষ্ট করা যাবে না। নিজের কাজ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, অন্যের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে নিতে হবে এবং এটা আপনার কর্তব্য।

➢ ব্যক্তিগত যত অসুবিধাই থাকুক না কেন, কর্মক্ষেত্রে এসে বা কাজে এসে মুখ ভার করে থাকা এবং অফিসের কারও কাছে তা প্রকাশ করা বা মেজাজ দেখানো যাবে না। নিজের অসুবিধা বা দুঃখ-কষ্টের কথা গ্রাহকদের কাছে তো বলাই যাবে না। অফিস সহকর্মীদের কাছেও চেপে রাখা ভালো। কারণ, কেউই অন্যের অসুবিধার কথা শুনতে চায় না। বিপদে অধৈর্য না হয়ে বরং ধৈর্য ধরতে হবে। সমস্যার সমাধান সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইতে হবে এবং সমাধানের চেষ্টা নিজেদেরই করতে হবে এবং তাতে সমাধান আসবেই। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়;

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

এছাড়া আরও দুটি মর্মবাণীর কথা এখানে বলা যায় :

(১) সময় সবচেয়ে বড় সমাধান (Time is the great healer)

(২) আল্লাহ্ দিলে ফুরায় না, বান্দা দিলে কুলায় না।

গরিব হলেও নিজের দৈন্যের কথা অপরের কাছে প্রকাশ করে, সাহায্য চেয়ে আত্মসম্মান খোয়ানো যাবে না।

➢ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে ভুল ধরলে কখনও অধস্তনের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না বা কখনও বলা যাবে না, আরও অনেক ভুল ছিল, আমি বলে সংশোধন করিয়েছি। আবার এও বলা যাবে না, আপনি তো এমনই করতে বলেছেন। মনে রাখবেন, বসের কাছে আপনার স্বাক্ষরে ফাইল যাচ্ছে। সেই ফাইল নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব আপনার, অধস্তনদের নয়। ঊর্ধ্বতনের প্রত্যাশা, তার অধস্তনদের কাছ থেকে নিখুঁত কাজ পাওয়া।

➢ বস্ কোনো নির্দেশনা বা পরামর্শ দিলে কখনও বলা যাবে না **আমিও এ রকমই ভাবছিলাম**। এরূপ বক্তব্য একদিকে অধস্তনকে 'বাচাল' এবং শঠ প্রমাণ করে অপরদিকে তা বসকে খাটো করে। এতে তিনি অধস্তনকে শুধু বেয়াদব নয়, অপদার্থও ভাবতে পারেন, যা অধস্তনের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অধস্তনের কাজ শুধু ভেবে বা হুকুম দিয়ে বসে থাকা নয়, অর্থাৎ মিছামিছি দাদাগিরি করা নয়, কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা বা করিয়ে নেয়া।

➢ বস্ কোনো কাজের জন্য তাগিদ দিলে কখনও বলবেন না, 'আমি already বলে দিয়েছি নিচে।' মনে রাখবেন, অন্যকে নির্দেশ দিয়েছেন– এই উত্তর শোনার জন্য বস আপনাকে জিজ্ঞেস করেননি বা জানতে চাননি। কাজের নিষ্পত্তি-ফলাফল জানতে চেয়েছেন। Delegation of Power-এর কার্যকারিতা এভাবে কাজ বাটোয়ারা করে বসে থাকা নয়। আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আপনি ইমাম, মোক্তাদি নন যে শুধু আকামত দিলেই আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। ডিজিটাল যুগে অনেক জায়গায় মাইকের ব্যবহার যেমন মোক্তাদির

অবস্থানের বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, তেমনি পুরানা জামানার মতো হুকুমের রেশ টেনে নিজের অবস্থানকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন না। ভালো বস্ হতে, কাজের সমাপ্তি পর্যন্ত নজর রাখুন।

➢ বস্ কোনো কাজ দিলে কখনও বলবেন না, 'আমার হাতে কাজ আছে, এখন করতে পারব না বা পরে করছি।' কারণ, এটা বেয়াদবি। আপনার হাতে অতি জরুরি কাজ থাকলে বসকে বিনয়ের সঙ্গে বলতে হবে, 'স্যার, হাতের কাজটি সেরে কি আপনার এখনকার এই কাজটি করা যাবে?' তাহলে দেখবেন, বস আপনার দায়িত্ববোধের প্রতি খুশি হবেন। তখন তার কাছ থেকে যথার্থ দিকনির্দেশনা পাবেন। দেখবেন, সে নির্দেশনা হয়তো আপনার ইচ্ছার সঙ্গে মিলে গেছে এবং তাতে সব কুল রক্ষা হবে।

➢ বস্ কোনো কাজ করতে দিলে তা তারিখ দিয়ে নোট করে নেবেন বা স্বাক্ষর করে রিসিভ করবেন, যাতে ব্যস্ততার কারণে ওই কাজ ভুলে না যান। কাজ ভুলে গেলে আপনার ক্ষতি, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। কাজ নোট করে নিলে এবং প্রাধান্য দিয়ে তা করলে এ ক্ষতি রোধ করা যায়।

➢ বস যদি আপনার সম্মুখে মেঝেতে পড়ে থাকা কোনো জিনিস নিজে নিচু হয়ে ওঠাতে যান, তাহলে এগিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করুন। অন্যের এমনকি পিয়ন বা মেসেঞ্জারের ভরসায় থাকবেন না। এতে আপনার সতর্কতা প্রকাশ পাবে এবং বসের প্রতি আপনার সহমর্মিতা দেখানো হবে। বস্ তাতে খুশি হবেন। মনে রাখতে হবে, বসকে খুশি করা মানে তাকে তোয়াজ করা নয় বা আপনার ব্যক্তিত্ব খাটো করা নয়, বরং এটা আপনার দায়িত্ব। বসকে খোশমেজাজে রাখলে তাকে দিয়ে অফিসের জন্য আরও বেশি করে কাজ করিয়ে নেয়া যাবে এবং তাতে সবারই লাভ হবে।

➢ ঊর্ধ্বতনদের অনুমতি ছাড়া তাদের সামনে কখনই নিজের ইচ্ছায় বসা উচিত নয়, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

➢ বাসায় গৃহস্থালির কাজে, মা-বোনদের সাহায্য করা উচিত। এ ব্যাপারে ওপরের অনুশাসনের অনেকগুলোই বাসায় এবং বাড়িতে সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। মা-বাবাকে বা গুরুজনদের বসের জায়গায় বসিয়ে বা অফিসের মতো ওইসব অনুশাসন অনুশীলন করলে সুফল পাওয়া যাবেই।

৫. ওয়াশ/রেস্ট রুম ব্যবহার

- রেনাল সিস্টেম অর্থাৎ মল-মূত্র নিঃসরণ ব্যবস্থা সচল রাখতে সদা সতর্ক থাকতে হবে।
- কখনও মল ও প্রস্রাবের বেগ ধারণ করা বা চেপে রাখা যাবে না।

● ওয়াশ রুমের বা রেস্টরুমের ভেতরে ঢুকে দরজা লক করুন। সেখানে পানি, টয়লেট পেপার, সাবান ইত্যাদি আছে কি-না পরীক্ষা করুন। টয়লেট পেপার এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে হাতে ময়লা না লাগে। তাই বলে টয়লেট পেপার বা পানি অপচয় করবেন না। শৌচকাজ শেষ করার পর হাত সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর টয়লেট পেপার বা ভ্যাকুম মেশিন থাকলে তাতে হাত শুকিয়ে নিন। ভেজা হাতে অন্যের সামনে যাবেন না, প্লিজ!

● ব্যবহারের পর ওয়াশ রুমের আয়না, মেঝে, কমোড বা প্যান, সেলফ বা সিট কভারে পানি লাগলে নিজে পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে ওয়াশ রুম থেকে বের হন। ফ্লোরে পানি পড়লে তাও মুছে দিয়ে আসুন। শাওয়ার অর্থাৎ গোসলের পর বাথট্যাব, বেসিন, ট্যাপ ইত্যাদির পানিসহ নোংরা অবস্থায় ফেলে রেখে আসবেন না। কমোডের ওপর পা দিয়ে বসবেন না।

● টয়লেট ব্যবহারের পর প্রথমে পুশ শাওয়ারের পানি দিয়ে কমোডের গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করুন। তারপর আবার পুশ শাওয়ার ছেড়ে একই সঙ্গে কমোড বা প্যান ব্রাশ করুন, পরে ফ্লাশ করুন এবং সেই সঙ্গে আবারও ব্রাশ করুন। দেখবেন, ওয়াশ রুমে আর কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না। একবার ফ্লাশ করাতেই পর্যাপ্ত পরিষ্কার হবে, পানি অপচয় হবে না।

● ওয়াশ রুমের মোছামুছির কাজে ভেতরে কোনো স্পঞ্জ বা কাপড় না পাওয়া গেলে টিস্যু দিয়ে সবকিছু মুছে অন্যের ব্যবহার-উপযোগী করে রেখে আসতে হবে, যাতে পরবর্তী ব্যবহারকারীর অসুবিধা না হয় এবং এর জন্য তার কাছ থেকে আপনাকে পরোক্ষ গাল শুনতে না হয়।

নিজের ব্যবহারের পর টয়লেট নিজে পরিষ্কার করতে খারাপ লাগবে না। বরং এরূপ না করলে পরবর্তী ব্যবহারকারীর কাছে তা খুবই খারাপ লাগবে এবং এ কারণে সে জাত তুলে মনে মনে গাল দেবে। কারণ, হয়তো তার বাথরুম ব্যবহারের ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে তার শরীর খারাপ হবে।

● ওয়াশ রুম থেকে বের হওয়ার আগে নিজের কোনো জিনিস (ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি) ভেতরে ফেলে এলেন কি-না, কমোড ফ্লাশ করলেন কি-না, ভেজা সবকিছু মুছলেন কি-না, সব পরিষ্কার হলো কি-না তা ভালো করে দেখুন এবং নিশ্চিন্ত হোন। অপরদিকে, ওয়াশ রুমের বা রেস্টরুমের কোনো জিনিস ভুল করে পকেটে তোলা হয়ে গেলে তা অবশ্যই ফেরত রেখে আসতে ভুলবেন না।

৬. খাওয়ার নিয়মাবলি (Table Manner)

● প্রথমে ফ্রেশ হয়ে অর্থাৎ প্রয়োজনে মলমূত্র ত্যাগ করে হাত-মুখ সাবান দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে খেতে বসতে হবে।

- খাওয়ার বা অফিসের টেবিলে গিয়ে বসার সময় চেয়ার টেনে শব্দ করে বসা যাবে না। অর্থাৎ, এমনভাবে চেয়ার টানতে হবে যাতে এতটুকু শব্দ না হয়।
- দৈনিক খাদ্য তালিকায় চর্বিজাতীয় খাবার কম রেখে শাক-সবজি, ফল-মূল, তরি-তরকারি ইত্যাদি পর্যাপ্ত রাখতে হবে। পাক করার বা খাওয়ার আগে প্রিজারভেটিভ মিশ্রিত আইটেম ঈষদুষ্ণ গরম পানির সঙ্গে ছিরকা মিশিয়ে বেশ কিছু সময় ভিজিয়ে রেখে কয়েকবার ভালো করে ধুয়ে Preservative-মুক্ত করে তারপর পাক করতে হবে। তা না করলে ধীরে ধীরে মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়বেন। **প্রিজারভেটিভ দূষণ কমান, সুস্থ থাকুন।**
- খাওয়ার সময় কথা বলা বা কোনো রকম বিরক্তিকর শব্দ করা যাবে না।
- পেট কিছুটা খালি রেখে খেতে হবে।
- বেশি তৈলাক্ত ও লবণাক্ত জিনিস না খাওয়া ভালো। তেল অধিক ক্ষতিকর। Edible না হলে তো ক্ষতি অনেক বেশি হতে পারে। লবণও কম যায় না। অর্থাৎ Sodium, Potassium, Cloride, Bi-carbonet ইত্যাদির সমন্বয়হীনতাকে ইলেকট্রলাইট Imbalance বলে। এর হাত হতে নিজেকে রক্ষা করতে হলে নিয়ম করে সুষম বা উপযোগী খাবার পরিমিত খেতে হবে। স্বাভাবিক খাদ্য থেকে এসবের ঘাটতি পূরণ না হলে লবণ, ডাবের পানি, কলা (দুপুর ১২টার পরে নয়) ইত্যাদি খাওয়া আবশ্যক। তবে প্রয়োজন-অতিরিক্ত পানি খেয়ে কিডনির ওপর চাপ সৃষ্টি করাও যাবে না।
- টক, ঝাল, মসলা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় রুচি মেটাতে এবং তরকারির স্বাদ বাড়াতে। তবে অতি স্বাদের জন্য ব্যবহৃত মশলা শরীরের ক্ষতি করে। তাই উন্নত বিশ্বের লোকেরা খাবারের স্বাদ দেখে নয়, Food Value দেখে খাবার বেছে নেয়। সারকথা হচ্ছে, ব্যালান্স ডায়েটসহ সবকিছু পরিমিত খেতে হবে। প্রয়োজন হলে Dietitian-এর পরামর্শ নিতে হবে।
- চামচ দিয়ে প্লেটে অল্প অল্প করে খাবার উঠিয়ে নিয়ে পরিমাণমতো মুখে দিয়ে মুখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে। খাওয়ার সময় পানি না খাওয়াই ভালো। তবে, সারাদিনে পরিমিত পানি খাওয়া আবশ্যক। শরীরে পানি বা পানীয়ের প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্য অনেক বেশি।
- মাংসের হাড্ডি, মাছের মাথা বা কাঁটা ইত্যাদি চিবানো বা চুষে খাওয়া যাবে না। আবার গরু, খাসি এবং মুরগির চামড়া, চর্বি, গিলা, কলিজা, মগজ ইত্যাদি Organ খাওয়া উচিত নয়। উচ্ছিষ্ট সব হাড় বা কাঁটা ইত্যাদি বোন প্লেটে ফেলতে হবে, টেবিলে নয়। এগুলো কুকুর, বিড়াল ও পোকা-মাকড়রা খায়। এটা সৃষ্টিকর্তার বিধান। তার ১৮০০০ মাখলুকাতকে তিনি এভাবেই বিভিন্ন কৌশলে খাওয়ান।

- গুড়, চিনি, মিষ্টি, ফাস্টফুড ইত্যাদি যতটা সম্ভব কম খাওয়া উত্তম। এগুলোর প্রয়োজন নরমাল খাবার থেকেই মেটানোর ব্যবস্থা সৃষ্টিকর্তা করে দিয়েছেন। তাই এগুলো যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো।
- ডাল বা অন্য কোনো তরল খাবার খাওয়ার সময় প্লেট মুখের কাছে উঠিয়ে শব্দ করে বা চুমুক দিয়ে খাওয়া যাবে না। ডালে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে, যা শরীরের উপকারে আসে।
- খাওয়ার সময় হাত দিয়ে খেলে শুধু আঙুলের মাথা ব্যবহার করতে হবে, হাতের তালু নয়। খাওয়ার পর হাতের তালু এবং আঙুল জিভ বা ঠোঁট দিয়ে চাটা যাবে না। এককথায়, খাওয়ার পর হাত চাটা যাবে না।
- কাঁটা চামচ ব্যবহার করলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে শব্দ না হয়। বাম হাতে ফর্ক এবং ডান হাতে ছুরি ধরে খাওয়া উন্নত বিশ্বের স্বীকৃত পদ্ধতি। ছুরি মুখে দেয়া বিপজ্জনক।
- ফর্ক, ছুরি ইত্যাদি ধরার স্টাইল রপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ, ফর্ক দিয়ে সলিড খাবার চেপে ধরে ছুরি দিয়ে সাইজমতো কেটে কেটে মুখে পুরে পর্যাপ্ত চিবিয়ে খেতে হবে। যাতে সলিড খাবার কাটার সময় অসাবধানতাবশত অন্যের গায়ে গিয়ে ছিটকে না পড়ে।
- খাওয়ার পর সর্বসমক্ষে দাঁত বের করে টুথপিক বা দাঁত খোঁচানি বা ডেন্টাল ফ্লস দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা যাবে না। এ কাজ টেবিলে বসে করতে হলে এক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অন্য হাতে টুথপিক ব্যবহার করতে হবে।
- খাওয়ার পর মুখ ধোয়া বা গড়গড়া করার সময় শব্দ করা যাবে না।
- চা, কফি ইত্যাদি বেভারেজ বা পানীয় খাওয়ার সময় ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পান করতে হবে। শব্দ করা যাবে না।
- গরম চা বা কফি সহনীয় ঠাণ্ডা না করে চুমুক দেয়া যাবে না। অতিরিক্ত গরম পানীয় পীড়াদায়ক এবং পরে তা বিপজ্জনক হতে পারে।
- মেহমানকে চা দিলে কাপ ইত্যাদি অবশ্যই ট্রেতে উঠিয়ে এনে দিতে হবে। মেহমানের সঙ্গে একই বৈঠকে বাড়ির বা অফিসের লোক থাকলে বা বস থাকলেও প্রথমে মেহমানকে পরিবেশন করতে হবে। চা দেয়ার আগে কাপ-পিরিচ, চামচ, প্লেট ইত্যাদি ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে নিতে হবে, যাতে কাপে বা পিরিচে এক ফোঁটা পানিও লেগে না থাকে বা পানির ফোঁটা শুকিয়ে গ্লাসে স্পট পড়ার সুযোগ না থাকে।
- কাপ ভরে চা দেয়া যাবে না। সঙ্গে টিসু বক্স বা ২-১ পিস টেবিল টিস্যু তিন-কোনা ভাঁজ করে দিতে হবে। দুধ, চিনি আলাদা দিতে হবে। চা বা কফি তৈরি করে বা বানিয়ে দিলে দুধ-চিনির পরিমাণ, বিশেষ করে চিনি কয় চা চামচ

তা মেহমানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে দিতে হবে। চায়ে চিনি দেয়ার পর চামচ দিয়ে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

- একই পদ্ধতিতে, কাউকে পানি খাওয়াতে হলে পানির গ্লাস পিরিচের ওপর বসিয়ে ট্রেতে করে এনে তারপর পরিবেশন করতে হবে। তবে তার আগে গ্লাস, পিরিচ ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে ধুয়ে, গ্লাস কিছুটা খালি রেখে পরিষ্কার পানি ভরে মেহমানের সামনে দিতে হবে। পুনরায় বলি, গ্লাসের গায়ে পানির ফোঁটা বা শুকনো পানির দাগ বা চিহ্ন থাকা চলবে না। পানি দেয়ার সময় মেহমান উপস্থিত না থাকলে ওই পিরিচ দিয়ে পানি ঢেকে দিতে হবে। পানির গ্লাস, নাশতা ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ট্রে ফেরত আনতে হবে এবং পানি খাওয়া হয়ে গেলে আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যবহৃত গ্লাস, পিরিচ ইত্যাদি ট্রের ওপর বসিয়ে ফেরত আনতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, কখন মেহমানের খাওয়া শেষ হয়। চা-নাশতা খেতে দেয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে, যা আগেই বলা হয়েছে।
- ভোজন বা খাওয়ার পরপরই পানি খাওয়া উচিত নয়। বরং খাওয়ার আধা ঘণ্টা পর পানি পান করা স্বাস্থ্যসম্মত এবং উত্তম।
- খাওয়ার পর নিয়ম থাকলে উচ্ছিষ্ট বা বোনস্, ট্রাশ ইত্যাদি বোন প্লেট থেকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বা ট্রাশ-ক্যানে ফেলে ট্রে নির্ধারিত জায়গায় রেখে আসা বাঞ্ছনীয়।
- খাওয়ার পর অবশ্যই নিজের ব্যবহৃত বাসন ইত্যাদি নিজেই ধুয়ে দিতে হবে (অবশ্য হোটেলে বা পার্টিতে নয়)। এবং বাসার বা বাড়ির সবাইকে তা করতে অভ্যস্ত করতে হবে। তাতে বাড়ির লোকজনকে (মা, বোন, স্ত্রী প্রমুখ) যারা সচরাচর এগুলো করে থাকেন তাদেরকে সাহায্য করা হবে। Maid-দের কাজও কমে যাবে। এতে মেহমান খেলেও Maid-রা বিরক্ত হবে না। এর ফলে নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা বাড়বে। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বাড়বে।
- খাওয়ার পর রান্নার বা পাকের প্রশংসা করা এবং দাওয়াতে গেলেও খাবারের প্রশংসা করা উত্তম। রান্না বা পাক ভালো বা সুস্বাদু না হলে সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করাই শ্রেয়। বাসায় রান্না খারাপ হলে সন্তর্পণে মৃদু স্বরে, উপদেশের ভঙ্গিতে বলতে হবে, লবণ বা ঝাল বা তেল ইত্যাদি একটু কম বা বেশি হলে ভালো হতো ইত্যাদি। মেজাজ করে 'কী রান্না হয়েছে? খাওয়া যায় নাকি!' ইত্যাদি বলে রাগারাগি করা বা ঝাড়ি দেয়া অশোভন। কোনো কারণেই খাবার ছুড়ে ফেলা যাবে না। মনে রাখতে হবে, সাধারণত পাক বা রান্না কেউ ইচ্ছা করে খারাপ করে না। হাতের আন্দাজ সব দিন সমান হয় না। মন বা শরীর খারাপ হলে রান্না খারাপ হতে পারে। তাই পাচক-পাচিকার মন বুঝে, সমঝোতার সুরে রান্নার মান বা গুণ সম্পর্কে তাদের জানাতে হবে। এতেও রান্না পছন্দমতো না হলে পাচক বা পাচিকা বদলাতে হবে। সাবধান, নিজের স্ত্রী পাচিকা বা Chef

হলে বদলানোর মতো বোকামি করবেন না। কারণ, আপনার সহধর্মিণী আপনার জীবনসঙ্গী, অন্ধের যষ্ঠি। সঙ্গী হারালে পঙ্গু হয়ে যাবেন, পঙ্গু হলে একা উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। তখন আপনাকে সাহায্য করবে কে?

- দাওয়াত খাওয়া শেষ করে নিমন্ত্রণকারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভোজনালয় থেকে প্রস্থান করা সমীচীন এবং ভদ্রোচিত।

- পানি বা যে কোনো প্রকার তরল পানীয় (Beverage) পান করার সময় মুখ অল্প খুলে, মুখে গ্লাস লাগিয়ে ঠোঁট দিয়ে দাঁত ঢেকে এবং শব্দ না করে পান করতে হবে, যাতে স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসের ভেতর দিয়ে সামনের লোকেরা আপনার দাঁত দেখতে না পায়।

- আবারও বলি, ভাত বা অন্য কিছু খেতে গেলে চিবানোর সময় মুখ বন্ধ করে চিবাতে হবে এবং কোনো প্রকার শব্দ করা যাবে না। মুখে খাবার দিয়ে কথা বলা যাবে না।

- রাতে ডিনার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় না গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করা এবং দুপুরে খাওয়ার পর একটু ন্যাপ (চোখ বন্ধ করে শুয়ে বিশ্রাম) নেয়া উত্তম।

৭. লিফট ব্যবহারে করণীয়

প্রায়ই দেখা যায়, লিফটে ওঠার জন্য লিফটের দরজার সামনে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা মৌমাছির মতো ভিড় করে দাঁড়ায়। এর ফলে ভেতরের আরোহীরা লিফট থেকে বাধাহীনভাবে নামতে পারেন না। আবার দু'একজন বের হতেই বাইরে অপেক্ষমাণ সবাই মিলে হুড়োহুড়ি করে লিফটে উঠতে চেষ্টা করে। হয়তো মনে করে, আগে উঠতে হবে, নইলে ট্রিপ মিস করবে, লিফট চলে যাবে এবং এই ট্রিপ মিস হয়ে গেলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, ইত্যাদি। এই ভাবনা অযৌক্তিক। এতে লিফটে ঢোকা এবং বের হওয়া দুটো প্রক্রিয়াই বাধাগ্রস্ত হয়, অযথা সময়ক্ষেপণ হয়, রাস্তার ট্রাফিক জ্যামের মতো। সবাই আগে যাব বলে আগায়, তাতে জট বাধে। কেউ এগোতে পারে না, কারও সময় বাঁচে না, বরং নষ্ট হয়।

আবার লিফটে ঢোকার পর দূরপাল্লার আরোহীরা দরজার মুখে আর নিকট যাত্রীরা পেছনে দাঁড়ায়। এর ফলে পিছনে দাঁড়ানো নিকট পাল্লার যাত্রীকে লিফট থেকে আগে নামতে দিতে সামনে দাঁড়ানো দূরপাল্লার যাত্রীকে লিফটের বাইরে গিয়ে সুযোগ করে দিতে হয়, তাতে সময় নষ্ট হয়, বিরক্তিও বাড়ে। এতে দুর্বল বা অসুস্থ মানুষের নার্ভের ওপর চাপ পড়তে পারে। ঠেলাঠেলিতে, হার্ট-দুর্বল ব্যক্তিদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই বিরক্তিকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা

এড়িয়ে সঠিকভাবে লিফট ব্যবহার করার জন্য অত্যাবশ্যক কিছু টিপস নিচে দেয়া হলো :

ক) লিফট হতে নামার বা যাত্রীদের সহজে বের হওয়ার সুবিধার্থে লিফটে ওঠার জন্য, অপেক্ষমাণ যাত্রীগণকে লিফটের দরজা ফ্রি রেখে বাইরে সোজা একলাইনে (Queue দিয়ে) দাঁড়াতে হবে।

খ) লিফট সম্পূর্ণ খালি হওয়ার পর অপেক্ষমাণ যাত্রীদের লাইনের সম্মুখ থেকে ক্রমানুসারে এক এক করে লিফটে উঠতে হবে।

গ) লিফটম্যান না থাকলে, লিফটে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিকে, লিফটে উঠেই, লিফট খুলে রাখার জন্য নির্ধারিত বোতামটি চেপে ধরে অন্যদেরকে লিফটে ওঠার সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে লিফটে ওঠার সময় কাউকে চমকে উঠে চাপা পড়তে বা ধাক্কা খেতে না হয়। এটা বিপজ্জনক এবং ভীতিকর।

ঘ) নির্ধারিত ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে লিফটে না উঠে সবাইকে ঝুঁকিমুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) লিফটের বোতামে জোরে চাপ দেয়া যাবে না। ফ্যান চালিয়ে রেখে লিফট থেকে নেমে যাওয়া যাবে না।

চ) বিকল্প সিঁড়ি থাকলে ১ হতে ৩ ফ্লোর থেকে নামার সময় লিফট ব্যবহার না করাই শ্রেয়। স্টপেজ কমলে লিফটের আয়ু বাড়ে। হেঁটে নামলে যাত্রীদের মেদ-ভুঁড়ি কমে। দূরপাল্লার যাত্রীদের হয়রানি কমে।

ছ) নামার জন্য ওপরে যাওয়া লিফটে ওঠা যাবে না।

জ) নিজের সুবিধার জন্য Common লিফট ধরে রাখা অন্যায় ও অপরাধ।

ঝ) Cargo লিফট ছাড়া মানুষবাহী লিফটে ভারী মালামাল ওঠানো উচিত নয়।

ঞ) কখনও সিগারেট খাওয়া বা খেয়ে দুর্গন্ধ মুখে লিফটে ওঠা ঠিক নয়। বায়ুদূষণ হয়। ধূমপান ক্ষতিকর, Passive হলেও। লিফটের ভেতরে কোনো উচ্ছিষ্ট ফেলা যাবে না।

ট) লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় অথবা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার আগে সব ফ্লোর থেকে লিফটে কল দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

৮. কাজ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা

আবারও বলি, নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হলে সবাইকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পর্কে এবং বিশেষ করে ব্যাংকারদের ব্যাংকের প্রাথমিক কাজ

সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নিতে হবে। এতে বাইরের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বা দফতরে এ ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসার জবাবে একেবারে নিরুত্তর থাকতে হবে না। মোটামুটি জবাব দেয়া যাবে। যেমন, ব্যাংকের চাকুরেদের ব্যাংক সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর ন্যূনতম প্রাথমিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় :

- হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি
- রেমিট্যান্স পদ্ধতি
- ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড নিয়মাবলি
- এফডিআর বা ডিপিএস সংক্রান্ত বিষয়াদি

এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১নং অধ্যায়ে দেয়া আছে বলে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আরও দু-একটি বিষয়ের অবতারণা করব।

৯. নামে নয় আচরণে পরিচয়

মানুষের আচরণ জীব-জানোয়ারের আচরণের মতো অশোভন বা অশালীন বা অবিবেচনাপ্রসূত হওয়া উচিত নয়। অনেকেই নিজের পরিচয় বাড়িয়ে বলতে মজা পায়, সম্মানবোধ করে। এর কুফল অনেক। বিষয়টি একটি উপমা দিয়ে শুরু করা যায়। যেমন, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার বাড়ি কোথায়?' তার উত্তরে, অনেককে সচরাচর বলতে শোনা যায়, চেয়ারম্যান বা অমুক ডাইরেক্টর সাহেবের বা অন্য কোনো নামী-দামি লোকের বাড়ির কাছে। আবার, কেউ কেউ বলে থাকেন, আমি অমুক ডাইরেক্টর বা অমুকের (কোনো প্রসিদ্ধ লোকের) ভাই বা আত্মীয়।

এমন পরিচিতি তার নিজস্ব পরিচয় ও সত্তাকে খাটো করে, ঢেকে দেয়, অমর্যাদা করে এবং এতে তার পিতা-মাতা, পরিবার এবং সমাজ অপমানিত হয়। বাবা বা অভিভাবক গরিব বলে সংকোচ করে তাদের পরিচয় না দিলে তাদের মানহানি করা হয়, তাদের খাটো করা হয়। এতে ওই ব্যক্তির মনের দৈন্য বা হীনম্মন্যতা এবং নীচুতা প্রকাশ পায়। এরূপ যারা করে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হয়। যেমন, যার কাছে এরূপ ধাপ্পাবাজি করবেন, তিনি ওই ধাপ্পাবাজ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবেন না। অবশ্যই খারাপ ভাববেন, সামনে হয়তো কিছু বলবেন না। এমন ভ্রান্ত পরিচয় দিয়ে তিনি বড় হওয়ার জন্য যে চেষ্টা নেবেন, সেটা কখনই সফল হবে না, বরং তিনি আরও নিচে নেমে যাবেন। যারা এরূপ করবেন তাদের সন্তানরা বা আত্মীয়-স্বজনরা তার চেয়ে ওপরের অবস্থানে গেলে (সেটাই নিয়ম) তারাও তাকে ভবিষ্যতে একইভাবে উপেক্ষা করবে। তখন তিনি বুঝবেন কেমন লাগে। তাই কোনো বিষয়েই কখনও এরূপ ধোঁকাবাজি বা ধাপ্পাবাজি করা উচিত নয়। নিজের যোগ্যতা দিয়ে সততার সঙ্গে চললে নামের কাঙালিপনা ঘুচে যাবে।

ধাপ্পাবাজি এড়িয়ে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। সম্মান পেতে রং-ঢং করা সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিতে হবে না, কোনো জ্যাঁকালো পোশাক বা বেশভূষাও লাগবে না। সঙ্গে ব্যাটম্যান, ধামাধরা বা চামচাও রাখতে হবে না। তাই কারও সঙ্গে জুড়ে বা কারও সাপোর্ট নিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই উত্তম। অন্যের নাম ভাঙিয়ে চলা শঠতা এবং নিচুতা, যাকে বলে ছোটলোকি। নিজের পরিচয়েই নিজেকে বড় করা উচিত। কারণ নিজের পরিচয়ই বড়, যত সামান্যই হোক না তা!

১০. বড়দের মর্যাদা

বড় সব সময়ই বড়। গুরুজন বা বড়রা শ্রদ্ধেয়। তাদেরকে ভক্তি করা ছোটদের কর্তব্য। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পিকনিকে গিয়ে খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে হিতাহিত জ্ঞান ভুলে যদি ভাবা হয়, গুরুজন বাড়িতে, বস্ অফিসে, এখানে নয়; এখানে আমরা সবাই সমান এবং এই ভেবে যদি বড়দের উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বেয়াদবি এবং অসম্মানের। এর থেকেও বড় বিষয় এই যে, বড়দের রেখে, মেহমানদের রেখে যদি কখনও অধস্তনরা কোনো অনুষ্ঠানে বা বাড়িতে নিজেদের ইচ্ছায় জোর করে খেতে বসেন এবং বড়রা তখন জায়গার অভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন, তাহলে তা হবে চরম বেয়াদবি এবং অসৌজন্যমূলক। তাই কখনও এরূপ করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, বড়রা বড় বলে ছোটদের কাছ থেকে সম্মান পাওয়াটা তাদের অধিকার এবং ছোটদের এটা দেয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য। বড়রা দুনিয়ায় আগে এসেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে তারা আগে চলে যাবেন। তাই দুনিয়ার সব সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে আগে ভোগ করতে সুযোগ দিতে হবে। এই কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করলে, ছোটরা অর্থাৎ অনুজরা যখন বড় অর্থাৎ অগ্রজ হবে তখন তারাও তাদের অনুজদের কাছ থেকে অনুরূপ অসম্মানজনক আচরণই পাবেন। তাই ছোট-বড় বা অগ্রজ-অনুজ সবারই এ বিষয়টির দিকে খেয়াল করে তার ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত।

এখানে আর একটি উপমা দেয়া যায়। যেমন, স্ত্রী বা পরিবারের সঙ্গে থাকা অবস্থায় বাইরে কোথাও বস্‌দের বা সিনিয়রদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে নিজের স্ত্রীকে স্বামিত্ব এবং সন্তানদেরকে (যদি থাকে) বাবাত্ব দেখানোর জন্য যদি বসের সামনে অসৌজন্যমূলক বা অবজ্ঞাসূচক আচরণ করা হয় তাহলে তা হবে চরম বেয়াদবি। স্ত্রী ভালো ঘরের সন্তান হলে আপনার এ আচরণে তিনি খুশি হবেন না, বরং মনে মনে আঘাত পাবেন। হয়তো সংকোচ করে আপনাকে কিছু বলবেন না। সঙ্গে ছেলেমেয়ে থাকলে এরূপ অসদাচরণ তারাও শিখে যাবে। তখন আপনার পরিবারের পরিবেশটাই হয়ে উঠবে অভদ্র। একটা কথা মনে রাখতে হবে, 'Courtesy begets Courtesy.' তাই গুরুজনকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদাভেদ ভুলে

অকৃপণভাবে ভক্তি করলে, আদব-কায়দার সঙ্গে চললে, নিজের ও নিজের বংশের গৌরব বাড়বে এবং ভবিষ্যতে সবার কাছে সম্মান পাওয়া যাবে। আপনি তখন সবার অনুকরণীয় হবেন, অনুসরণীয় হবেন। এটা একটা বিরাট পাওয়া। অসংযমী হয়ে, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে এই পাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না।

আবারও বলি, অফিসের বস পিতা বা মাতার সমতুল্য। তাকে কখনও কোনো অবস্থাতেই অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অপমান করা যাবে না।

১১. আলাপচারিতা

অন্যের কথা শুনতে বা বুঝতে না পারলে -

- Sorry অথবা Beg your pardon বলতে হবে।

অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বা তাকে ডাকতে -

- Hello নয়, নম্র সুরে Excuse me বলুন।

অন্যের কথার প্রতিবাদ করতেও -

- আপত্তির সুরে, দৃঢ়তার সঙ্গে Excuse me বলুন।

কেউ Favour (সাহায্য বা অনুগ্রহ) **করলে তাকে -**

- Thank You **বলতে হবে।**

কেউ Thank You **বললে উত্তরে বলতে হবে -**

- ❖ You are Welcome

  or

- ❖ My pleasure

  or

- ❖ Mention Not **বলতে হবে।**

কেউ প্রসংশা করলে -

- ❖ Thanks for the compliment (আপনার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ)।

ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে -

- ❖ Excuse me বলুন। Side Plz নয়।

এবার আসা যাক্, একটু অন্য প্রসঙ্গে।

১২. অডিটের ওপর ট্রেনিং

চলতে গেলে, বলতে গেলে, ভুলভ্রান্তি হতে পারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। ভুল সংশোধন বা প্রতিরোধ করতে ব্যবস্থা লাগে। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে, ভুল শনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ। ব্যবসায়িক ভাষায় একে অডিট বা ইন্সপেকশন বলা

হয়। আসলে অডিট বলতে কী বুঝায়, অডিটে কী দেখা হয়? সাধারণত, প্রতিষ্ঠানের লিপিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের বাইরে অনিয়মিতভাবে যদি কোনো কাজ করা হয়ে থাকে, সেই সব অনিয়মিত কাজকে চিহ্নিত করে, প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ করে দেয়াই অডিট বা ইন্সপেকশনের কাজ বা উদ্দেশ্য। পারিবারিক পরিমণ্ডলে এই অডিটের কাজটি হয় সাধারণত সিনিয়র বা অগ্রজ বা মুরব্বিদের মাধ্যমে। তারাই অপেক্ষাকৃত অনুজদের ভুল ধরিয়ে দেন। অনিচ্ছাকৃত ভুল নিজে ধরা যায় না। তাই সেই ভুল অডিটররা বা মুরব্বিরা ধরিয়ে দেন। আসলে ভুল কেন হয়? হয় অজ্ঞতা না হয় অনভিজ্ঞতার জন্য অথবা কাজে অমনোযোগিতার কারণে। অজ্ঞতা দূর করা যায় শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু অমনোযোগিতা দূর করতে লাগে সতর্কতা, বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়। কোনো বিষয় বা কাজ প্রত্যয়ের সঙ্গে নিলে বা কোনো কিছু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে এবং তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতার সঙ্গে পর্যাপ্ত শ্রম দিলে ভুল এড়ানো বা প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার ফলে কাজে সফল হয়ে ওই কাজ সম্পন্ন করে প্রতিজ্ঞা পূরণ করা যায়।

এ ব্যাপারে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যায় এভাবে যে, প্রতিষ্ঠানে বা পরিবারে, যেখানেই হোক না কেন, কাজ করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং গাইডলাইন থাকে। পরিবারের বা সংসারের নিয়ম-কানুন অলিখিত কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ থাকে বা থাকা উচিত। আসলে ঘরের মতো প্রতিষ্ঠানও দাঁড়িয়ে থাকে ৪টি Pillar-এর ওপর। ঘরের Pillar হয় বাঁশের, কাঠের বা কংক্রিটের। কিন্তু কাজের Pillar হচ্ছে (১) Law of the Land (২) Rules of the Institution (৩) Procedure of the Institution & (৪) Ordinary Prudence বা Bankers' Wisdom, উল্লিখিত ৪টি পিলারের মধ্যে প্রথম তিনটি লিখিত। যেমন, Law পাওয়া যাবে আইনের বইতে, Rules পাওয়া যাবে Manual-এ এবং Procedure পাওয়া যাবে সার্কুলারে। বিষয়গুলো লিখিত। তাই এগুলো কেউ ঠিকমতো পড়ে কাজের নিয়ম শিখে সে মোতাবেক কাজ করলে তার কাজে ভুল হওয়ার কথা নয়। তথাপি ভুল হয়, হতে পারে। ওইসব ভুল ধরে দেয়ার জন্য প্রতি প্রতিষ্ঠানকে Audit বা ICC Dept.-এর মতো বিশাল বহরের ব্যয় টানতে হচ্ছে। এতে কার ক্ষতি হচ্ছে? সবাই বলবেন, প্রতিষ্ঠানের, অর্থনীতির, দেশের, বা পৃথিবীর ক্ষতি হচ্ছে। যারা এরূপ বলেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমার যুক্তিতে, তাদের উপলব্ধি সঠিক নয়। কারণ, এতে মূলত প্রথম ও প্রধান ক্ষতি হচ্ছে আমার। অর্থাৎ, আমরা যারা কর্মী তাদের। আগে বলেছি, আবারও বলছি, Audit-এর বহর ছোট করে তার পেছনের অযথা খরচ কমানো গেলে প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়বে। এটা করা সম্ভব। আমরা যে কাজ করি বা করছি, সেই কাজে যদি কোনো ভুল না করি, নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকি, নিয়ম মেনে

চলি এবং চলতে দৃঢ়প্রত্যয় নিই এবং পর্যাপ্ত শ্রম দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে সব কাজ করে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করি তাহলে ভুল হবে না। এতে, Audit-এর বিশাল বহরের প্রয়োজন কমানো যাবে, যায়। এবং তার সুফল সব পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেঃ ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয়। এসব নিয়ম-কানুন-পদ্ধতি সম্পর্কে আগেকার ট্রেনিং সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিবৃত আছে।

যাহোক, আমাদের দেশের একঘেয়ে অডিট কার্যক্রম পদ্ধতির সংস্কারসহ তার উপযোগী বিস্তার ঘটানো গেলে অডিটের মাধ্যমে আরও অনেক বেশি উপকার পাওয়া সম্ভব হতে পারে। যেমন, প্রচলিত Accounting Audit বা ভুল ধরার Audit-এর সঙ্গে Development Audit, প্রশাসনিক Audit, Cost Benefit Audit, Manpower Utilization Audit-এর ওপর কাজ করলে Audit বিভাগের খরচ এবং উপকারিতা অধিক কার্যকর বা ফলপ্রসূ হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এর মাঠ পর্যায়ের ধ্যান-ধারণার নিবিড় এবং অধিক সক্রিয় যোগসূত্র ও সমন্বয় ঘটাতে পারলে প্রতিষ্ঠান অবশ্যই লাভবান এবং বেগবান হবে। উন্নত বিশ্বে বর্ণিত কাজের কিছুটা সমাপন করা হয়ে থাকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ICC দ্বারা। তবে তারা এর বিস্তৃত সুফল নেয় বহিরাগত কনসালট্যান্ট নিয়োগের মাধ্যমে। তাই অডিট সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে যে, ব্যাংকে বা প্রতিষ্ঠানে বা পরিবারে, যেখানেই হোক না কেন, সব জায়গায়ই, অডিটের উপকারিতা পেতে হলে অডিটরকে পুলিশি মনোভাব (যদি থাকে) নিয়ে ভয় দেখানো পরিহার করতে হবে। সহনশীল হয়ে, সহমর্মী হয়ে, দরদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে নিজের এবং পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভাবতে হবে। অডিটিং কাজের উপকার বেশি বেশি করে প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে এবং অডিট ডিপার্টমেন্ট একটি ডাম্পিং ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সাধারণ অফিসারদের মনে যে ধারণা আছে, তা পরিবর্তন করতে হবে নিজেদের এবং অডিটরদের সততা এবং দক্ষতা দিয়ে, সেখানে দৃশ্যমান কিছু করে।

১৩. মিটিংয়ে অযথা কথা বলা অনাচার

অনেকের বদভ্যাস আছে মিটিংয়ের মধ্যে অযথা কথা বলার। তারা মনে করেন, মিটিংয়ে কথা না বললে নিজের অস্তিত্ব বা প্রাধান্য প্রকাশ পায় না বা কৃতিত্ব এবং গুরুত্ব বাড়ে না, ব্যক্তিত্বও না। কিন্তু তারা একথা ভাবেন না, অসার কথা, অবান্তর কথা, অযৌক্তিক কথা অথবা যে বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করার মতো অপ্রয়োজনীয় কথা অনভিপ্রেত এবং বিরক্তিকর। এরূপ অপাঙ্‌ক্তেয় বক্তারা কথা বলতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করেন শুধু সম্বোধন আর ভূমিকার আড়ম্বর দিয়ে, তারপর মিটিংয়ের এবং চেয়ারের প্রশংসা করে সময়

নষ্ট করেন এবং তাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন; মিটিংয়ের বিষয়বস্তুর ওপরে বাস্তব, গঠনমূলক বা যৌক্তিক কোনো কথা থাকে না, থাকলেও তা হয় বিতর্কিত। যার ফলে শ্রোতারা তার ওইসব অসার কথায় যে বিরক্ত হয়, নির্বোধ বক্তারা তা বোঝে না। নির্বোধ কেন, তাকে নির্লজ্জও বলা যায়। তাই মিটিং করার বা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদের সবারই কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলা উচিত, যা নিম্নরূপ হতে পারে :

অফিসের বা প্রতিষ্ঠানের বস হিসেবে মিটিং আহ্বান করলে বা সদস্য হিসেবে মিটিংয়ে হাজির থাকলে :

ক) ডায়েরি দেখে আগেই তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে সময় এবং শিডিউল দিতে হবে বা নোট করে নিতে হবে।

খ) প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সভায় আগত অতিথিদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

গ) প্রয়োজন হলে মিটিংয়ের লোকদেরকে সভাস্থলে Escort করে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) মিটিংরুমের মধ্যে তাদের বসার স্বচ্ছন্দ আয়োজন করতে হবে।

ঙ) মিটিং শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত অফিসের একজন প্রতিনিধি দিয়ে আগতদের খেদমত করতে হবে।

চ) মিটিংয়ের টেবিলে সবার সামনে খাওয়ার পানি এবং নোট-প্যাড, পেন্সিল ও মিটিং সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ইত্যাদি রাখতে হবে।

ছ) নির্ধারিত সময়ে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি মিটিং আহ্বান করেছেন, তিনি মিটিং রুমে ঢুকবেন, সবাইকে সালাম দেবেন, কুশল বিনিময় করবেন, তারপর প্রয়োজনে ভিজিটিং কার্ড বিনিময় করবেন। দেরি হলে যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

জ) বহিরাগতদের ভিজিটিং কার্ড তাদের বসার ক্রমানুসারে টেবিলের ওপর সামনে রাখতে হবে, যাতে মিটিং চলাকালে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্টভাবে নাম ধরে সম্বোধন করে কথা বলা যায়।

ঝ) স্বাগত জানিয়ে এবং ধন্যবাদ দিয়ে মিটিং শুরু করতে হবে।

ঞ) সবার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে। বক্তব্যে সব points পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। অথবা মিটিংয়ে আগতদের কোনো এজেন্ডা বা পয়েন্টস থাকলে তা ধৈর্যসহকারে শুনতে হবে।

ট) সভাপতি মিটিং Order-এ রাখবেন এবং এজেন্ডার ক্রমানুসারে মিটিং পরিচালনা করবেন। নির্ধারিত এজেন্ডার ওপর আলোচনা শেষ হলে উপস্থিত অন্য

কারও কোনো বিষয়ে বলার থাকলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে তা উপস্থাপন করতে হবে।

ঠ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুবিধার্থে নির্ধারিত দায়িত্ব বণ্টন করে ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সভাপতি মহোদয় বা তার পক্ষে সেক্রেটারি সাহেব সবাইকে তা পড়ে শোনাবেন। যাতে সভায় উপস্থিত সবাই নিশ্চিন্ত হন যে, সভায় গৃহীত সব সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে লেখা হয়েছে। সম্ভব হলে তাতে সবার স্বাক্ষর নিতে হবে।

ড) উপরোল্লিখিত Formal কার্যবিবরণী বা Minutes সেক্রেটারি এবং সভাপতির স্বাক্ষরে অথবা প্রচলিত বিধি এবং প্রথা অনুযায়ী সব সদস্যকে দিতে হবে এবং তার কপি অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি মিটিংয়ের শুরুতে, সর্বপ্রথম পূর্ববর্তী সভার (যদি থাকে) সিদ্ধান্ত সমর্থন, দ্বিতীয়ত ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং তারপর চলতি মিটিংয়ের এজেন্ডা আলোচনায় আসবে।

ঢ) আগ্রহী হয়ে মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব সহকারে মিটিংয়ের আলোচনা শুনতে হবে এবং প্রয়োজনে নোট করতে হবে। যাতে সার্বিক বিষয়ের ওপর যে আলোচনা হয় সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার সহায়ক হয় এবং সে মোতাবেক সবাই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে।

ণ) মিটিংয়ে সরাসরি এবং রূঢ়ভাবে Negative কিছু বলা যাবে না। Negative বলার থাকলে তা ভূমিকা করে ও যুক্তি দিয়ে Merit / demerit, Cost Benefit Analysis-সহ উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সবাই আপনার মতের সঙ্গে একমত হতে পারেন এবং বিরোধের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পয়েন্ট বা যুক্তি সেখানে স্ট্যান্ড করাতে না পারে।

ত) মিটিংয়ে বসে কখনও রেগে ওঠা যাবে না। মনে রাখতে হবে, **রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন**। আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, মিটিংয়ের লোকজনকে সমকক্ষ ভাবতে হবে (অধস্তন না হলে)। অধস্তন হলেও মিটিংয়ে আপনার অযৌক্তিক কথা ও কার্যকলাপের কারণে তারা যেন অসহযোগিতা করতে না পারেন, শত্রুতা করতে না পারেন, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ মিটিংয়ে একে অপরের সঙ্গে সংযত আচরণ করতে হবে।

থ) আবার কেউ নেগেটিভ পয়েন্ট তুলে মিটিং ভেঙে বা পণ্ড করে দিতে চাইলে রাগারাগি না করে বিনয়ের সঙ্গে সেই পয়েন্টের weight analysis করে তার এবং আপনার যুক্তির তুলনামূলক গুরুত্ব সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া এবং তদনুযায়ী ভালো পয়েন্টের ওপর সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এটাই মিটিংয়ের সফলতার চাবিকাঠি। স্বার্থপর সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য অন্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

দ) কোনো কারণে উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে মিটিং সমাপ্ত করা না গেলে সর্বসম্মতভাবে বর্ধিত মিটিংয়ের সময় নির্ধারণ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে ওই সময়ের জন্য মিটিং Adjourn (মুলতবি) করার পরিষ্কার ঘোষণা দিতে হবে।

ধ) মিটিং সংক্ষিপ্ত হলে চা-কফি এবং দীর্ঘ হলে হালকা ওয়ার্কিং লাঞ্চের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, তবে ব্যয়বহুল নয়। খেয়াল রাখতে হবে, মিটিং যেন Sitting, Eating & Gossiping-এর অভিযোগে না পড়ে।

ন) অতঃপর আলোচনার আর কিছু না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মিটিং শেষ করার ঘোষণা দিতে হবে।

১৪. অধস্তনদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো

কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও বলি, আসলে এই এপিসোডের আবেদনটি বেশ স্পর্শকাতর। ঊর্ধতনদের ব্যক্তিগত কাজ অধস্তনরা করে দেবে কি-না, সে বিষয়ে অধস্তনদের তরফ থেকে কোনো প্রশ্ন এলে, সেটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা নির্দিষ্ট করে বলা ঠিক হবে না। কারণ, অধস্তনরা মনে করেন, অফিসে চাকরি করি শুধু অফিসের কাজ করার জন্য। অপরদিকে, ঊর্ধ্বতনরা মনে করেন, অধস্তনরা তাদের সব নির্দেশ পালন করার জন্য। এহেন বিপরীতমুখী পরিস্থিতির সমঝোতা না করে বা এ ব্যাপারে যথেষ্ট না ভেবে চট করে কিছু বলা যায় না।

এখানে সাবলীল বিষয় হচ্ছে, বসের বা ঊর্ধ্বতনের ব্যক্তিগত কাজ, পারিবারিক কাজ, এমনকি বাজার করে দেয়ার মতো বিশেষ ব্যক্তিগত কাজ আসলে কাজ, অকাজ নয়। বরং এটা আবশ্যকীয় (Essential) কাজ। বসকে তার নিজের এসব কাজ নিজেই করতে হবে। এ কাজে সময় ও মন দিতে গেলে বসের অফিসের কাজের ক্ষতি হতে পারে। বসের বেতন অনেক বেশি বিধায় তার সময়ের মূল্য অধস্তনদের সময়ের মূল্যের চেয়ে বেশি। তাদের এ ধরনের বিশেষ ব্যক্তিগত কাজ করার জন্য অনেক অফিস থেকে বড় বসদের সহকারী দেয়া হয়। তবে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের বসদের বিষয় ভিন্নতর। অবশ্য এসব বসদের সময়ও কম মূল্যবান নয়। তাই বসের এই মূল্যবান সময় যত বেশি অফিসের কাজে লাগানো যাবে, অফিস তত উপকৃত হবে, যার সুফল সবাই ভোগ করবে। আবার, অধস্তনদের চাকরির প্রথম শর্ত হচ্ছে বসের নির্দেশ মেনে চলা। যাকে বলে Chain of Command with United Spirit. তাই বস না পারলে সবার মঙ্গলের জন্য অফিসের কাজের সমান গুরুত্ব দিয়ে বসের বা ঊর্ধ্বতনের ব্যক্তিগত বা বাসার কাজ করে দেয়া অযৌক্তিক নয় বলে মনে হয়।

এই মতবাদের সমর্থনে বলা যায়, বসের দায়িত্ব হচ্ছে তার কর্মীবাহিনীর সম্মিলিত সহযোগিতা নিয়ে অফিসের কাজ পর্যাপ্ত পরিমাণে করে অফিসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা করতে হলে প্রায়োগিকভাবে অধস্তনদের ওপরও দায়িত্ব এসে যায়, বসকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে তাকে মানসিকভাবে চিন্তামুক্ত, শারীরিকভাবে সুস্থ এবং জোরেশোরে কাজ করানোর জন্য সব সময় প্রস্তুত রাখা। যাতে বস অফিসের বাইরের এমনকি বাসার বা নিজের ব্যক্তিগত কাজের কোনো টেনশন মাথায় না নিয়ে অফিসের জন্য অধিক কাজ করতে পারেন, ক্লান্ত না হয়ে পড়েন।

উপরোক্ত যুক্তিই বলে দেয়, বসের ব্যক্তিগত কাজ, বাসার কাজ, এমনকি বাজার করে দেয়ার মতো কাজেও তাকে সাহায্য করা অফিসের সবার দায়িত্ব (তবে খারাপ বা অসামাজিক এবং দুর্নীতিমূলক কাজে নয়)। তাই বসের সব কাজ অধস্তনদেরই করে দিতে হবে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের একটি অংশ হিসেবে। তবে বস বিচক্ষণ হলে অধস্তনদের দিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যতটা সম্ভব কম করাবেন। কারণ, নিজের সংসারের কাজ নিজেকেই ম্যানেজ করতে হবে এই ভেবে যে, যাদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করাবেন, তাদেরও ব্যক্তিগত কাজ থাকতে পারে। তাদের কাজ রয়ে যাবে আর বসের কাজ হয়ে যাবে তাদের দিয়ে– এটা তাদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজের কাজ নিজে করা ব্যবস্থাপনা যোগ্যতার একটি মাত্রা। এই ভেবে বস যখন তার ব্যক্তিগত বা বাসার কাজ অফিসের কাজের সঙ্গে মেলাবেন না, তখন বসকে সবাই নিরপেক্ষ ভাববে, ভয় করবে, ভক্তিও করবে। বসের কাছ থেকে তারা দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতা অনুশীলনের শিক্ষা পাবে এবং নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করে স্ব-স্ব পরিবারে এবং সমাজে এক সাবলীল, সুস্থ, কর্মচঞ্চল গতি সঞ্চার করতে সহায়তা করবে।

যাহোক, বসের ব্যক্তিগত কাজ অফিসের কাজ নয় বলে করব না, এটা বলা চলবে না। এই মানসিকতা অহেতুক বিতর্ক আনে; অশান্তি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাড়ায়। তাতে দফতরে কাজের সমন্বিত উদ্যোগ কমে যায়। মনে রাখতে হবে, অফিসের কাজ সম্মিলিত। তাই সবাই প্রফুল্ল চিত্তে, প্রসারিত মনে, পার্থক্য ভুলে সব কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করব। হিংসা-বিবাদ করব না। কেউ ইট মারলে পাটকেল মারব না; বরং ওই ইটটি দিয়েই বিল্ডিংয়ের ভিত গাঁথা শুরু করব। স্বার্থপরতা ত্যাগ এবং হীনম্মন্যতা পরিহার করলে এবং জিদ দমন করলে এটা করা সম্ভব। সবশেষে একটি কথাই বলব, উর্ধ্বতনদের সম্মান করলে প্রতিদানে স্নেহ পাওয়া যায়। এরূপ করলে অধস্তনেরা বা তাদের সন্তানরা যখন ঊর্ধ্বতন হবেন তখন তারা তাদের অধস্তনদের কাছ থেকে সম্মান পাবেন। তাই আসুন, ঊর্ধ্বতনদের সম্মান করে নিজের সম্মানপ্রাপ্তির পথ সুগম করি বর্তমানের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্যও। তবে তা ইমানদারির সঙ্গে করতে হবে।

১৫. উদ্বুদ্ধকরণ

প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ বা Motivation এক শক্তিশালী এবং পরীক্ষিত পন্থা। হুকুম করে অধস্তনদের দিয়ে কাজ করানোর দিন শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এটা হতো বিখ্যাত কবি লর্ড টেনিসনের আমলে। তাই তো তিনি লিখেছিলেন, 'There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die, into the Valley of death road the six hundred.' ওই জামানায় বোধ করি সেটা আর্মিতে কার্যকর ছিল বেশি। কবিতার এই উদাহরণ বলে দেয় Obey my order. কিন্তু এখন আর্মি সমাজেই নির্দেশের ধরন পাল্টেছে। এখন তারা আর বলে না, Obey my order বরং কাজ শুরু করে বলে, Follow me অর্থাৎ, ছোট-বড় সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে তারা কাজ করে। একটা বাস্তব উদাহরণ দিলেই এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে আশা করি। একবার দেশের বৃহত্তম ব্যাংক অর্থাৎ সোনালী ব্যাংকের এমডি ক'দিন ধরে গাড়ি থেকে অফিসে নামার আগে গাড়ির মধ্য থেকে লক্ষ করলেন, তার অফিসের অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়ের অফিস বিল্ডিংয়ের রাস্তার দিকে বিভিন্ন ফ্লোরের জানালায় নোংরা শপিং ব্যাগ (পলিথিন) ঝুলছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওইসব ব্যাগে প্রতিদিন লাঞ্চের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এটা দূর করার জন্য অফিস নির্দেশ জারি করলেন। সেই নির্দেশ পদ্ধতিগতভাবে পর্যায়ক্রমে ডিএমডি হয়ে একের পর এক গ্রেডে নামতে নামতে অর্থাৎ মার্ক হতে হতে অবশেষে পিয়ন পর্যন্ত গড়াল। পিয়নের কাছ থেকে সেটা সুইপারের কাছে গেল সুইপার তা ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিল। কারণ, তারা না জানে তেমন লেখাপড়া, না আছে তাদের অত জ্ঞান-গরিমা। এতে এমডির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, বলতে গেলে, এমডির ইমেজ ভূলুণ্ঠিত হলো। দু'দিন পর এমডি সাহেব জানালার ওই অপরিবর্তিত বেহাল অবস্থা আবারও লক্ষ করলেন। সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞেস করাতে তিনি তার পূর্বেকার অফিস নির্দেশের উপরোল্লিখিত করুণ পরিণতির বিষয় জানতে পারলেন। তিনি রাগলেন না, দুঃখও পেলেন না, বরং বিস্মিত এবং বিচলিত হলেন এই ভেবে যে, ব্যাংকে দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতার কতটা অধঃপতন ঘটেছে। এতগুলো উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ ও দায়িত্বশীল নির্বাহী এবং কর্মকর্তা, সবাই এত উদাসীন! তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, এই দায়িত্বে অবহেলার বিষয়টি শুধু কি ওই প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান? উত্তর পেলেন, হয়তো না, অধিকাংশ সরকারি এবং আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানেও এরূপ অচলাবস্থা অনুপস্থিত নাও হতে পারে।

যাহোক, এমডি সাহেব তখন উল্টো পথ ধরলেন। অর্থাৎ, সামনে এগোনোর স্ট্রাটেজি পরিবর্তন করলেন। 'টপ-টু-বটম' পথ ছেড়ে নতুন করে 'বটম-টু-টপ' পথ ধরলেন। যথা চিন্তা, তথা কাজ। তিনি একদিন সুইপারদের নিয়ে একটি

মিটিং করে তাদের বিষয়টি জানালেন। তারা বললেন, 'আমরা অস্পৃশ্য, ছোট কাজ করি। ছোট জাত বলে অফিসের ক্লার্করাই আমাদেরকে মূল্য দেয় না, নিগ্রহ করে, ওপরের স্তরের কথা তো বলাই বাহুল্য। ঊর্ধ্বতনরা আমাদের জানালেই আমরা এ কাজ করে দিতাম। আপনি আমাদের বড় সাহেব, ব্যাংকের সর্বোচ্চ পদে আসীন। আপনি বলেছেন, এটা আমাদের জন্য শিরোধার্য। কাল থেকে আর কোনো ব্যাগ জানালায় ঝুলতে দেখবেন না।' তাদের চোখের মুগ্ধতা, বাগের সরলতা এবং ভক্তিমণ্ডিত দৃঢ়প্রত্যয় এমডি সাহেবকে অভয় দিল, Wait & See করতে।

পরে দেখা গেল, তাদের কথাকে তারা উপযুক্ত সম্মান দিয়েছে, অর্থাৎ, তাদের প্রত্যয় ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। তারপর থেকে আর কোনো ময়লার ব্যাগ জানালায় ঝুলতে দেখা গেল না। তিনি ভাবলেন, এরাও মানুষ, আবার ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন অফিসিয়ালরাও মানুষ। মানুষে মানুষে কত ব্যবধান! এতে কী শিখলাম? অফিস চালাতে শুধু ব্রিটিশ আমলের মতো প্রশাসনিক অর্ডার নয়, আন্তরিক অভিব্যক্তি ও সহমর্মিতা লাগে, যেটা এখানে সফলভাবে কাজ করল। এও শেখা গেল, অনেক শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিত মানুষ অপেক্ষাকৃত ভালো। এটা শিক্ষার অপমান, শিক্ষার কলঙ্ক। কিন্তু আমি বলি, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার বিরুদ্ধে এ অপবাদ অহেতুক এবং খুবই দুঃখজনক। আসুন, শিক্ষাকে দূষণমুক্ত করে তার দুঃখ ঘোচাই।

১৬. কথা এবং মেজাজ

কোনো মানুষের কথার সুর, স্বর এবং উচ্চারণভঙ্গি তারই কথার অর্থে বিপুল তারতম্য ঘটাতে পারে, শব্দটি যত ছোটই হোক না কেন। যেমন, ২ বর্ণের একটি ছোট্ট শব্দ 'যাও'। নরম সুরে, মিষ্টি করে বললে একরকম মানে বোঝায়, আবার ওই শব্দটি কর্কশ এবং মেজাজ করে বললে তার মানে অন্য রকম হয়ে যায়। অর্থাৎ, দু'রকম স্বর বা ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি পজিটিভ, অপরটি নেগেটিভ। শ্রোতার প্রতি বক্তার প্রসন্ন বা বিষণ্ন ভাব এই সুর এবং স্বরেই প্রকাশ পায়। তাই মানুষকে আচরণে বিনয়ী হতে হলে সব সময় সুরে নম্র, স্বরে মধুর হতে হবে। সুরে নরম হতে হলে মেজাজ ভালো রাখতে হবে। ভালো আচরণের মানুষ হতে হলে সংযমী হতে হবে। মনকে শরীরের আগে চলতে দেয়া যাবে না, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, যদিও মন শরীরের চেয়ে অধিক দ্রুতগামী। আসলে মন সংযমের কথিত গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অনেকে ভাবতে পারেন, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে ও নরম সুরে কথা বললে সে কথায় কমান্ড থাকে না, একথা সঠিক নয়। তাই এমনটি ভাবা অনুচিত। কথা এক জিনিস, কমান্ড অন্য জিনিস। কথার বা

কমান্ডের দৃঢ়তা নির্ভর করে কথার বিষয়বস্তু, উচ্চারণের স্পষ্টতা, প্রকাশের ভঙ্গি, ঢেউ বা রিদম্ এবং উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন এবং তার চয়নের ওপর, স্বরের তাপের ওপর নয়। সর্বোপরি, কোন্ শব্দের ওপর কখন এবং কতটুকু জোর দিয়ে কথা বলা হচ্ছে তার ওপর কমান্ডের ওজন। তদুপরি, জোরে বা আস্তে, যেভাবেই কথা বলা হোক না কেন, সেই কথার মাধ্যমে নির্দেশিত বা প্রত্যাশিত কাজের অগ্রগতির উপর, যদি পরবর্তীতে তদারকি না রাখা যায় সেই কাজ হয় না, হবে না। কর্কশ স্বরের বিষয়টি তখন 'বজ্র আঁটুনি, ফসকা গেরো'র মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তাই বক্তার বা ঊর্ধ্বতনের দেওয়া কাজের নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য বা ওই কাজের সফলতার জন্য বক্তার মনের ও চরিত্রের দৃঢ়তার গুরুত্ব সর্বাধিক। তথাপি, ভাবে, ভাষায়, স্বরে এবং সুরে সদা সংযমী হওয়া বাঞ্ছনীয়। **কথা বলার সময় অযথা বেশি জোরে কথা বলা উচিত নয়, তা অশোভন এবং অভদ্রতা।** নিম্নস্বরে কম কথা বলতে হবে। মনে রাখতে হবে, **ভালো কথা বলা হয়েছে, ভালো কাজ বাকি রয়েছে।**

১৭. বক্তাকে সম্মান না দেওয়া

প্রায়ই দেখা যায়, মিটিংয়ে বা সভায় বক্তব্য শোনার সময় কোনো কোনো শ্রোতা এমনকি সহবক্তারা বা অতিথিরা ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকান। পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলেন। অর্থাৎ বক্তৃতা শোনেন না। শ্রোতার এরূপ আচরণ বক্তাকে অবজ্ঞা করে তার বক্তৃতার সময় শ্রোতার গ্যালারি থেকে।

এহেন আচরণ অশোভন এবং অশালীন। এটা বক্তাকে বিব্রতও করে, বিভ্রান্ত করে, অপমান করে। ফলে বক্তা বিচলিত হয়ে বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন, ফেলেনও কেউ কেউ। এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে খুবই সাধারণ। অথচ বিদেশে ঠিক উল্টো। কোনো ঘরোয়া মিটিংয়ে বক্তার বক্তব্য যদি শ্রোতা বুঝতে না পারেন তাহলে বোঝার চেষ্টা করেন, বক্তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সহযোগিতার সুরে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি 'এই' বলতে চেয়েছেন? এটা তারা করেন বক্তাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য। যেমন, ক্যামেরাম্যানরা একাধিক Repeat Shot নেন, তার ছবির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং Subject-এর স্বাভাবিক অবস্থা ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে। যতক্ষণ সাবজেক্টের ভেতর থেকে স্বাভাবিকতা প্রতিভাত না হয় ততক্ষণ ক্যামেরাম্যান বা ফটোগ্রাফার শট নিতেই থাকেন। একটার পর একটা। ফটোগ্রাফিতে ভালো ছবি তোলার এটাই গোপন রহস্য। যাহোক, ফিরে যাই বক্তৃতার কথায়।

ওপরে বলা হলো, বিদেশে শ্রোতা বক্তাকে সাহায্য করেন; তিনি কী বলতে চাচ্ছেন সেটা বের করে আনতে। তার বক্তব্য সবার কাছে পরিষ্কার করে দেয়ার

জন্য শ্রোতারা বক্তার সঙ্গে সংযত আচরণ করেন, সমবেদনা দেখান। সভ্য-বিদেশে, জনসভায় শ্রোতারা শান্ত হয়ে থাকেন। বক্তৃতা পছন্দ না হলেও খোলাখুলিভাবে React করেন না। ফলে সেখানে বক্তা নিরুৎসাহিত হন না। আমাদেরও উচিত এরূপ করা। অর্থাৎ, বক্তার বক্তব্য ভালো না লাগলে পরিবেশের খাতিরে ভদ্রতা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে Point of Order-এ দাঁড়িয়ে অর্থাৎ সভাপতির অনুমতি নিয়ে যুক্তি দিয়ে বক্তব্যের সমালোচনা করা উচিত। তাতে বক্তা আহত হন না, বরং নিজের ভুল হলে সেটা শুধরে নিতে পারেন। নিজেকে উন্নত করতে সুযোগ পান। এটা গণতান্ত্রিক বা পার্লামেন্টারি পন্থা। তাই কেউ কথা বলার সময় বা কারও কথা বা বক্তৃতা শোনার সময় আমরা ঘড়ির দিকে তাকাব না। পাশের শ্রোতার সঙ্গে কথা বলব না। প্রয়োজনে সভাপতির মাধ্যমে বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করার জন্য স্লিপ পাঠাব। এভাবে পরিবেশ শান্ত রাখব। কোনো জরুরি কাজ থাকলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করব। আমি যদি এরূপ না করি, অর্থাৎ, অসভ্য আচরণ করি, তাহলে আমার প্রতিও অন্যেরা অনুরূপ আচরণ করবেন। এতে পরিবেশ ভালো হবে না। আসুন, আমরা সবাই ভালো থাকার চেষ্টা করি, বক্তাকে সম্মান করি।

১৮. শিক্ষাজীবন বনাম চাকরিজীবন

বাল্যজীবন, শিক্ষাজীবন এবং কর্মজীবনের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মানুষের জীবন ধারণ ও তার পরিচালন পদ্ধতি ভিন্নতর হয়। শিশুরা বাসা বা বাড়ি থেকে শিক্ষাঙ্গনে গিয়ে পৃথক আচরণ ও আদব-কায়দা শেখে এবং শিক্ষাঙ্গন বা বিদ্যাপীঠ থেকে চাকরি অঙ্গনে গিয়ে আরও বেশি রকম কিছু শেখে বা শিখতে হয়। বাল্যকালে পরিবারের মমতার কিছু শিক্ষা ধাক্কা খায় বিদ্যাপীঠে গিয়ে। Hetrogenious অনেকের সঙ্গে অনেক কিছু বাধ্য হয়ে Share করতে হয়। তবে নিজে খুব ভালো ছাত্র বা ছাত্রী হলে এরূপ পরিবেশ কিছুটা অনুকূলে আসে। কারণ, অনেকেই তাকে অনুকরণ করে তার সাহায্য নেয়। চাকরি অঙ্গনেও তেমনি ভালো কর্মী হলে অন্য অনেকে তাকে মূল্যায়ন করে, যদিও প্রতিযোগিতা থাকে মনে মনে। তাই জীবনের সব স্তরই গুরুত্বপূর্ণ। যারা সব স্তরকে Seriously নেয়, তারাই ভালো করে। লেখাপড়ায় ভালো হলে চাকরির জন্য কম ঠেকতে হয় এবং চাকরি অঙ্গনে গিয়েও ভালো কাজ করা যায়, যদি কাজে পর্যাপ্ত মনোযোগ দিয়ে নিজের মনে করে তা করা যায়।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের শিক্ষাঙ্গন আজ আর আগের মতো নেই। রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি আর স্বজননীতি এখানে বেশ ভালো অবস্থান করে নিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে অনেককেই আজকাল বৈষয়িক

স্বার্থপরতার শিকারে পরিণত হতে দেখা যায়। আবার নতুন নতুন যারা চাকরিতে ঢুকছে তাদেরও লেখাপড়ার মানে এবং কাজের প্রতি মনোযোগে কমতি দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গন থেকে নৈতিকতার শিক্ষা ঠিকমতো পাওয়া গেলে ব্যতিক্রম ছাড়া এমন হওয়ার কথা নয়। এ কারণেই বলা যায়, এখন আগের জামানার শিক্ষক-ছাত্রদের পরস্পর লেখাপড়া শেখানো এবং শেখার মহৎ নৈতিকতা পদে পদে পরাস্ত হচ্ছে। মানুষের জীবন অল্প সময়ের, তার মধ্যে শিক্ষাজীবন আরও কম সময়ের। এ সময়টুকুর জন্য লোভ-লালসা, হিংসা-ঘৃণা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ভুলে কি আমরা ভালো হতে পারি না? একবারও কি ভাবা যায় না যে, মা-বাবা না খেয়ে, কম খেয়ে, কত কষ্ট করে আমার জন্য টাকা পাঠাচ্ছে আর সে টাকা আমি অপচয় করছি পড়াশোনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত না করে? ধনী লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমি গোল্লায় যাচ্ছি। শুধু কি বাবা-মা? পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন আমাকে কত আদর ও স্নেহ দিয়ে আগলে আমাকে বেড়ে উঠতে পরোক্ষ সহযোগিতার ঋণে আবদ্ধ করেছে। এছাড়া, গরিব মানুষের প্রাত্যহিক খরচের মাধ্যমে পরিশোধিত ট্যাক্সের টাকায় আমি অপেক্ষাকৃত কম খরচে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া করার সুযোগ নিয়ে তাদের কাছে আমি দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাদের সবার ঋণ পরিশোধ করতে হবে না? ঋণ রেখে মরলে তো বেহেশতে যাওয়া যাবে না। এখন রক্ত গরম আছে বলে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এসব ভালো দর্শনকে পাত্তা না দিলেও তেজ কমে এলে এগুলোর জন্য অবশ্যই অনুতাপ হবে। তখন শোধরানোর কোনো পথ খোলা থাকবে না। তাই ছাত্রজীবন থেকেই সাবধান হতে হয়। কারণ, ভিত মজবুত না হলে বিল্ডিং টেকসই হয় না।

আর একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, বর্তমান জেনারেশনের মধ্যে উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত নামী-দামি বিদ্যাপীঠে এবং বিদেশে লেখাপড়া করে চাকরিতে না গিয়ে ব্যবসায় ঢুকছে। ওই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্পৃক্ত অফিসিয়াল কাজে তাদের সঙ্গে সমানতালে চলতে গেলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানের অফিস কর্মকর্তাদের মনোযোগ দিয়ে কাজ শিখতে হবে এবং সিরিয়াস হয়ে তা করতে হবে। তা না হলে নিজে টিকে থাকা যাবে না এবং প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে যাবে। তাতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাংকাররা এখন মুনাফার তাড়নায় শুধু বিনিয়োগের অঙ্ক কষছে। ওই স্মার্ট ব্যবসায়ীদের চাহিদার পরিমাণ ঠিকমতো নিরূপণ করতে পারছে না বা করছে না। এছাড়া ডিমান্ড-গ্যাপ বিশ্লেষণের ওপর পর্যাপ্ত নজর না দেয়ার ফলে সিন্ডিকেশনের ছত্রছায়ায় ওইসব ব্যবসা Over Saturated হয়ে ব্যাংকের টাকা আটকে দিচ্ছে। তাদের ঋণের বিপরীতে যথাযথ ও পর্যাপ্ত সিকিউরিটি না থাকায় তা দীর্ঘস্থায়ী

অনড় ঋণে পরিণত হচ্ছে। ফলে আয় কমে ব্যাংক দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যেসব অফিসারের লেখাপড়ায় ধার থাকে এবং সেই সঙ্গে নৈতিকতা ভালো হয়, তারা দুর্নীতি করতে পারে না। তারা ঋণপ্রস্তাবের সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য এবং ঋণগ্রহীতার ব্যবসার স্থিতিপত্র ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে। সেখানে দুর্ঘটনা কম হয়। কিন্তু এরূপ প্রফেশনাল এবং সৎ ব্যাংকারের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তাই তো বিভিন্ন ব্যাংকের জালিয়াতির খবর ইদানীং পত্র-পত্রিকায় বেশ ফলাও করে প্রচার হচ্ছে। ব্যাংকাররা সজাগ ও নিরপেক্ষ হলে এ ভয়াবহ দশা কেটে যাবে। ব্যাংকারদের নৈতিকতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতনদের কড়া তদারকিই ব্যাংকের ভালো অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। এখনও সময় আছে, তাই এদিকে আমাদের খেয়াল দিতে হবে।

এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, শুধু লেখাপড়ায় মনোযোগ নয়, পাশাপাশি Extra Curricular Activity-এর দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। তার ফলে চাকরি পাওয়ার সুযোগ সহজতর হবে। ভালো রেজাল্ট আছে বলে, ভালো স্কুলে পড়েছি বলে নামী-দামি সরকারি এবং বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ছাড়া চাকরি করব না- এমন জিদ করলে বিপদও হতে পারে। তাই বিদেশি সংস্থায় চাকরি পেতে গেলে প্রথমে ইন্টার্নশিপ করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। লেখাপড়ার ফাঁকে স্বনির্ভর হওয়ার চিন্তা মাথায় নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। এমন বহু উদাহরণ দেখা গেছে, সর্বোচ্চ লেখাপড়া শিখে চাকরি না করে শিল্প বা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা হয়ে অনেকে অনেক ভালো করছে। আবার এও দেখা গেছে, ব্যাংকের সহযোগিতা ছাড়াই ভিক্ষুক থেকে কলাচাষি বনে স্বনির্ভর হয়েছে। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ এই যে, আমরা অধিকাংশ ব্যাংকারই ওইসব গরিব লোকজনের কাছে ঋণী, যা আগেই বলেছি। তাদেরকে ব্যাংক থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে স্বাবলম্বী করার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায়। এসএমই ঋণ কর্মসূচি এ কাজের জন্য একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এ জন্যই তো এ কর্মসূচি আজ বিশ্বনন্দিত। আমাদেরকে বসে না থেকে এদিকে খেয়াল দিতে হবে। তাহলেই বেকারত্বের জ্বালা ঘুচবে, দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছবে এবং ব্যাংকও স্থিতিশীল অবস্থায় যাবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, পড়ালেখা থেকে শুরু করে চাকরি বা কাজ পর্যন্ত সব জায়গায় ভালো করতে হলে প্রয়োজন হয় দৃঢ়প্রত্যয়ের এবং কঠোর শ্রমের। ফিল্ড ওয়ার্ক এবং কমিশন-ভিত্তিক চাকরি দেখে ভয় পেলে চলবে না। যে কোনো চাকরিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিরিয়াস হয়ে কাজ করলে চাকরিতে মজা পাবেন এবং তাতে ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন। এরূপ করলে

জীবন অবশ্যই সুখের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের হতে পারে। লেখাপড়ার গোল্ড মেডেল পেয়ে কাজের বাছাবাছি করে কাজ না পেয়ে বসে থাকার চেয়ে প্রকৃত মানবিক শিক্ষা নিয়ে তা কাজে লাগানো উচিত।

মানুষ ও জীবন এবং ব্যাংক ও ব্যাংকিং বইয়ে এসব দর্শনই দেয়া আছে। এগুলো জানলে এবং মনেপ্রাণে মানলে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমালোচনা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা

সমালোচনা ভালো, যদি তা হয় আত্মসমালোচনা। অর্থাৎ যদি নিজের শুদ্ধি বা নিজের সংশোধনের জন্য হয়। আবার বিরূপ সমালোচনা যদি যথার্থ গঠনমূলক (Productive) এবং পরিপালনীয় হয়, তাহলে তাও খারাপ নয়। পক্ষান্তরে, সমালোচনা যদি হিংসাত্মক, উদ্দেশ্যমূলক এবং স্বার্থকেন্দ্রিক হয়, তবে তা অবশ্যই খারাপ, জঘন্য। এরূপ জঘন্য কাজ যিনি করেন এবং যার বিরুদ্ধে করা হয় তারা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই বিরূপ সমালোচনা করা আদৌ উচিত নয়। একইভাবে, পরচর্চা এবং পরশ্রীকাতরতার মতো অশোভন বিষয়গুলোও মানুষের অনেক ক্ষতি করে। ওইসব বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনা নিচে করা হলো।

১. তর্জনী উঁচিয়ে খারাপ বলা

জনৈক গ্রিক দার্শনিক বলেছেন, একজন মানুষ যখন অপরকে খারাপ বলেন, তখন তার দিকে একটি অঙ্গুলি (তর্জনী) নির্দেশ করে বা উঁচিয়ে বলেন, ওই লোকটি খারাপ। কিন্তু তিনি কি কখনও খেয়াল করেন যে, ওই অবস্থায় তার নিজের তিনটি আঙুল তারই দিকে নির্দেশ করা হয়ে আছে? এর অর্থ কী? প্রাকৃতিক শিক্ষা। অর্থাৎ, প্রকৃতি শিক্ষা দেয় এই যে, এ ধরনের সমালোচনার ভঙ্গি স্বর্গীয়- কারণ তিনটি আঙুল অধিক জোর দিয়ে বোঝাচ্ছে যে, তুমি অন্যের দুর্নাম করছ এক আঙুল দেখিয়ে আর তোমার দিকে তিন আঙুল। অর্থাৎ, অন্যকে খারাপ বলার আগে তুমি একবার ভাবো, তুমি নিজে কতটুকু ভালো? এমনটি করলে তোমার মধ্যে সঠিক বুঝ আসবে। তুমি নিবৃত হবে পরনিন্দা থেকে। এতে তোমার উপকার হবে, তুমি বিবাদ এড়াতে পারবে। তিন আঙুলের ইশারায় সৃষ্টিকর্তা এই নির্দেশই দিয়েছেন মানুষের ভালোর জন্য।

যিনি আত্মসমালোচনা এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন, সর্বোপরি যিনি নিজের দোষত্রুটি নিজেই ধরতে পারেন, তিনি নিজেকে সংশোধনও করতে পারেন। অর্থাৎ, তিনিই যথার্থ মানুষ। তাই কিছু করার বা বলার আগে

ভাবা উচিত, যা বলতে চাচ্ছি তা বলা ঠিক হবে কি-না, এটা না বললে কি কোনো ক্ষতি হবে ইত্যাদি। না শুনে, না বুঝে, হঠাৎ করে কিছু না করা বা না বলাই ভালো। **গুলি** আর **বুলি** একবার বের হয়ে গেলে তাকে আর ফেরানো যায় না। তাই অযথা অবান্তর কথা বলে নিজের বিপদ ডেকে আনা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা অন্যায়, অপরাধও বটে। কারণ তা বিবাদ ডেকে আনে। এ ব্যাপারে আরও একটি ঐশ্বরিক অনুশাসন উল্লেখ করা যায়। যেমন, মানুষের শরীরে অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ২টি করে, শুধু মুখ একটি। এর মানে, কম কথা বলতে হবে, কম খেতে হবে, তাহলেই ভালো থাকা যাবে।

পরশ্রীকাতর, পরচর্চাকারী, পরনিন্দাকারী এবং বিরূপ বা মিথ্যা সমালোচনাকারী মানুষ নিকৃষ্ট। তারা আঁস্তাকুড়ের কীট। লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি মানুষকে মিথ্যা সমালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, পশু বানায়। মানুষের মনে জিঘাংসার মতো হিংস্র নারকীয় উপসর্গ সৃষ্টি করে, তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তথাপি বলি, সমালোচনাকারীকে শত্রু ভাবা ঠিক নয়। কারণ, তার সমালোচনা যদি সঠিক হয়, তাহলে তা আমার দোষ ধরিয়ে দিচ্ছে, যা আমি নিজে কখনও ধরতে পারিনি বা আমলে নিইনি (অধিকাংশ মানুষই নেয় না)। তাই সমালোচনাকারীকে শত্রু নয়, বন্ধু ভাবতে হবে এই যুক্তিতে যে, **সমালোচনা শত্রুতা আনে, শত্রুতা সতর্কতা আনে, সতর্কতা সফলতা আনে**। এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হলো সমালোচনার ইতিবাচক দিকটা বোঝানোর জন্য।

২. চাটুকারিতা

চাটুকারিতা গোলাপ জলের মতো যার গন্ধ নেয়া যায়, কিন্তু গেলা যায় না। যে মানুষ সব কথায় সায় দেয়, তাল দিয়ে চলে, সে ভণ্ড, প্রতারক এবং ভয়ঙ্কর খারাপ মানুষ। তার কাছ থেকে সতর্ক থাকুন, দূরে থাকুন। কারণ, সুযোগ পেলেই সে আপনার ক্ষতি করবে, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে। তাকে দিয়ে আপনার কখনও কোনো উপকার হবে না। সে সাপের মতো, মুখ লুকিয়ে, পথ ভাড়িয়ে চলে। সুযোগ পেলেই পেছন থেকে ছোবল মারে। এটা তার দুর্বল মানসিকতা, ভীরু স্বভাব এবং হিংস্র অপতৎপরতা। তাই তার থেকে সাবধান থাকুন। অপরদিকে, যিনি ঠোঁটকাটার মতো, মুখের সামনে উচিত কথা বলেন, শালীনতা বজায় রেখে যৌক্তিক বিরোধিতা করেন, তিনি বরং ভালো মানুষ। তিনি প্রতিষ্ঠানের এবং আপনার পরোক্ষ শুভাকাঙ্ক্ষী।

তিনি আপনার ভালো না চাইলেও খারাপ চান না। তাই কারও মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে বা তার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে গলে গিয়ে তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না, আবার তাকে বুঝতেও দেবেন না যে আপনি তাকে বিশ্বাস করছেন

না, তাহলে তথ্য পাবেন না। তাই তথ্য প্রদানকারীর (Informer) আচরণ এবং তার দেয়া তথ্য কৌশলে যাচাই করুন, তারপর প্রাপ্ত তথ্যের ওপর যথার্থ ব্যবস্থা নিন।

আগে বলেছি, আবারও বলি, 'মুখ গোমড়া' লোক সম্পর্কেও সচেতন থাকুন। কারণ, তারা কখনও কারও ভালো চায় না। ব্যাংকে চাকরি করেন, তাই Love all but trust none blindly (সবাইকে ভালোবাসা, কিন্তু অন্ধভাবে কাউকে বিশ্বাস না করা) - এই সূত্রটি মেনে চলুন, তাহলেই নিরাপদ থাকতে পারবেন।

সবার মন রাখতে বা সবাইকে খুশি করতে গিয়ে যে যা সামনে ধরবে তাতেই স্বাক্ষর করবেন না। যে যা বলবে তাতেই সম্মতি দেবেন না, অর্থাৎ ৭-এও হু, ৫-এও হু বলবেন না। কারণ, মানুষের এহেন আচরণ ক্ষতিকর। সমাজে-সংসারে ওইসব ব্যক্তি অবশেষে মূল্যহীন বা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, আপনি নির্বাচন করছেন না যে সবাইকে খুশি রাখতে হবে বা রাখার চেষ্টা করতে হবে। আবার এও ভুলে যাবেন না যে, আপনি সহজ হলে জালিয়াতকারীরা আপনাকেই টার্গেট করবে। তাই না দেখে, না বুঝে কোনো কাজ করবেন না, অর্থাৎ আপনি যেটা বিশ্বাস করেন না, সেটা করবেন না। আপনি সতর্ক হলে জালিয়াতকারী বা ধোঁকাবাজরা আপনাকে এড়িয়ে চলবে এবং তাতে আপনার বিপদের ঝুঁকি কমে যাবে। বিড়াল মারতে চাইলে প্রথম রাতেই মারতে হবে। তা না পারলে ওই বিড়াল পরে বাঘ হয়ে আপনার ক্ষতি করবে।

৩. পশ্চাতে পরচর্চা বা পরনিন্দা

কারও অনুপস্থিতিতে তার বদনাম করার নামই গিবত। একজন অন্য আর একজনের মনমতো বা পছন্দমতো না চললেই আমরা তার বদনাম করি, বিরোধিতা করি । এ দ্বন্দ্ব আপন থেকে পর এবং ঘর থেকে বাহির, সর্বত্র বিস্তৃত। এরূপ অহরহ হচ্ছে এখানে-সেখানে। এ ব্যাপারে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন এক বড় বস্ তার সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সামনে তোমার কোনো সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন যদি তোমার বস সম্পর্কে সমালোচনা করে বা খারাপ বলে, বদনাম করে, তাহলে তুমি কী করবে? তুমি কি বসকে জানাবে? তখন ওই সহকর্মী বললেন, স্যার, গিবত করা পাপ, তাই বলব না বা জানাব না। আবার গিবতকারী ঊর্ধ্বতন হলে তার বিরুদ্ধে নালিশ করা ঠিক নয়। তাই শুনে চুপ থাকব। বস্ তখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিজের জিনিস যেমন, শার্ট, ঘড়ি ইত্যাদি যদি কেউ চায়, তাহলে কি তা তুমি তাকে দেবে? তিনি বললেন, 'না।' জোর করে নিলে? তাও না, বাধা দেব। তখন বস্ বললেন, কেন

বাধা দেবে? উত্তরে অধস্তন বললেন, ওইগুলো তো আমার জিনিস, আমি অন্যকে দেব কেন? প্রতি-উত্তরে বস তাকে বললেন, দেখেছো, গিবত সম্পর্কে তুমি যে কত ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছো, তার একটু নমুনা তোমাকে দেখাই।

যে ব্যক্তি তোমার বসের সম্পর্কে গিবত করেছে, তুমি তার প্রতিবাদ না করে চুপ করে শুনলে এবং তার কথাটা তোমার কাছে গিবত মনে হলো না। কিন্তু তুমি বস্‌কে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলে সেটা গিবত হয়ে যাবে? অথচ ওই গিবতকারীর কথা সত্য না মিথ্যা, তা যাচাই না করে গিবত করা পাপ ভেবে ধর্মের অন্ধ ভয়ে সে সম্পর্কে তোমার বসকে কিছুই জানালে না। গিবত করা যদি পাপ হয় তাহলে কথিত ঘটনায় তোমার সহকর্মীর (গিবতকারী) যতটুকু পাপ হলো, তার দ্বিগুণ পাপ হবে তোমার। কারণ, তোমার সহকর্মী তোমাদের বস্ সম্পর্কে তোমার কাছে গিবত করার সময় তাকে তুমি নিবৃত না করে নীরবে তা শুনে তাকে ওই খারাপ কাজ করতে প্রশ্রয় দিয়ে সমর্থন করে এবং উৎসাহ দিয়ে একবার পাপ করলে। আবার দ্বিতীয়বার পাপ করলে বসের বিরুদ্ধে তার করা গিবত সম্পর্কে তাকে না জানিয়ে।

বসের রাগারাগি বা বকাঝকা যদি অফিসের স্বার্থের বা কাজের জন্য হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত বদনামের কথা তাকে না বলে ব্যাংকের ক্ষতি করেছ। কারণ, এই গিবতের কথা বসকে জানালে বা জানানোর হুমকি দিলে গিবতকারী ভয় পেত, সংযত হতো। গিবতকারীর সামনে, সবাই এভাবে চুপ থাকলে গিবত সমর্থন পাবে এবং তাতে প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকের ক্ষতি হবে, লোকসান বাড়বে এবং ওই বাড়তি লোকসান বা ক্ষতি তোমার-আমার স্বার্থহানি করবে। তাহলে এই গিবতের ভুল ধারণা নিয়ে নিশ্চুপ থেকে তুমি কি তোমার নিজের তথা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করলে না? পক্ষান্তরে, তুমি যদি তোমার সহকর্মীকে চার্জ করতে এবং বসকে বলে দিতে তাহলে কতগুলো উপকার হতো, নিচের বর্ণনা থেকে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে :

১) দুর্নামকারী সহকর্মী বাধা পেত এবং সে আর এরূপ করত না। বরং সে কাজে Serious হতো এবং তার ফলে হয়তো সে আর গিবত করার সুযোগ পেত না। এভাবে অফিসের অন্য কেউই আর এরূপ করতে সাহস পেত না। ক্ষতি করে বকা খেলেও বসের বিরুদ্ধে দুর্নাম করা বন্ধ হয়ে যেত এবং অপরদিকে সবাই কাজের প্রতি যত্নবান হতো, বসের বকাঝকাও কমে যেত।

২) বস্ তোমার ওপর খুশি হতো, নির্ভর করত, তুমি প্রশাসনের অংশীদার হয়ে যেতে। তোমার দেখাদেখি অন্যরাও এরূপ সৎ আচরণ করত। বসের সঙ্গে সহযোগিতা করে গোটা অফিসের পরিবেশ ভালো করতে পারতে। আমরা সবাই এরূপ করলে সবাই লাভবান হব। অফিস সম্পর্কে ক্ষতিকর কোনো বিষয় বসকে

না জানানো, দুর্নাম করার সময় দুর্নামকারীকে বা সহকর্মীকে না থামানো শুধু ব্যাংকের নয়, তোমার নিজেরও ক্ষতি, যা আগেই বলেছি।

আবার, তুমি ধর্মান্ধ হয়ে গিবত সম্পর্কে ভুল বুঝে ভয়ে নিশ্চুপ বসে থেকে আরও যে ক্ষতি করেছ তা নিম্নরূপ :

১) তোমার অভিযোগকারী সহকর্মী আরও বেয়াড়া ও কর্মবিমুখ হলো। তার দেখাদেখি অন্যরাও বেয়াড়া ও কর্মবিমুখ হওয়ার অনুপ্রেরণা পেল। ফলে অফিসে একটা নেগেটিভ গ্রুপ তৈরি হলো। তাতে কাজ বাদ দিয়ে সমালোচনা করে ব্যাংকের ক্ষতি করার পরিবেশ উস্কানি পেল, আগুনে ঘি ঢালার মতো।

২) এর সংখ্যা যত বাড়বে, অফিসের পরিবেশ তত বেশি নষ্ট হবে। সবাই পরনিন্দায় মশগুল হবে। তোমার বিরুদ্ধেও একদিন সে এভাবেই বদনাম করবে এবং তাতে দফতরে কর্মবিমুখতা বাড়বে, কাজের প্রবৃদ্ধি কমবে এবং তার জন্য আমি-তুমি সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। অপরদিকে, আমাদের সংসারের ব্যয় বাড়বে, নিজের আয় কমবে, আমাদের ব্যাংক অন্য ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে আমাদের চাকরি যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। তাই সিনিয়রদের ভয়ে অথবা ভ্রান্ত পাপের কথা ভেবে কথিত ব্যাপারে এবং পরিস্থিতিতে নীরব থাকা উচিত নয়। গিবত বন্ধ করতে সরব হওয়া উচিত, হতেই হবে; কারণ তা সার্বজনীন কল্যাণকর।

কথিত গিবতের ওপর আরও একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

বস ভুল করে, অন্যায় করে কাউকে বকাঝকা করলে ওই সহকর্মীকে সান্ত্বনা ও সাহস দিতে হবে। ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দিতে হবে। কোনোভাবেই তাকে উস্কানি দেয়া যাবে না। অপরদিকে, শালীনতা বজায় রেখে সুযোগ বুঝে, সঙ্গোপনে, বসের মেজাজ বা মুড বুঝে এ বিষয়টি তাকে জানাতে হবে। বস্ ভালো মানুষ হলে অবশ্যই তিনি মানবেন এবং নিজেকে সংশোধন করবেন। এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে নিবৃত হবেন এবং সতর্কও হবেন। এমনকি তিনি অভিযোগকারীকে সান্ত্বনাও দিতে পারেন। এতে বসের ভালো হবে, অভিযোগকারীও মনোকষ্ট ভুলে যাবে, সবাই খুশি হবে, ব্যাংকের ভালো হবে।

পক্ষান্তরে, বস্ অধিক রেগে গিয়ে যদি ওই অভিযোগকারীকে আরও কষ্ট দেন, বিপদে ফেলেন, তাহলে বস নিজেই একদিন অধিক বিপদে পড়বেন, যা এই মর্মবাণীই বলে দেয়, **দয়ার মতো ধর্ম নাই, হিংসার মতো পাপ নাই**। তাই হিংসা করে নয়, উদার হয়ে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য অফিসের মধ্যে একটা ভালো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কেউ কারও বদনাম নয়, বরং একে অপরের খারাপ কাজকে প্রতিরোধ করব, সম্মুখে খোলাখুলি সমালোচনা করব এবং তার সুফল সবাই ভোগ করব। বস্ বা ঊর্ধ্বতন বা অগ্রজ বা অফিস বা শাখাপ্রধান, তাই

তাকে সম্মান করব, কারণ তিনি পজিশনে পিতার মতো। এরূপ করলে, ভবিষ্যতে আমিও যখন বস হব, অনুরূপ ভক্তি-সম্মান পাব। এতক্ষণ বলার পর অধস্তন বস্‌কে বললেন, এতটা তো আগে বুঝি নাই। তখন বসের মনে হলো, অধস্তন হয়তো বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু কতটুকু পালন করবেন অর্থাৎ এই বুঝ কাজে লাগাবেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এভাবেই কিন্তু মানুষ Devoted হতে পারে। না হলেও কিছু করার নেই। কেউ Motivated হচ্ছে না বলে আপনি খারাপ হবেন কেন, অন্যের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন কেন?

৪. কোনো মানুষই খারাপ নয়

আসলে এই দুনিয়ায় কোনো মানুষই খারাপ নয়। খারাপ বা ভালো হয় তার আচরণ। সব মানুষ সব সময় সবার কাছে ভালো বা খারাপ নয়। যেমন, কেউ 'ক'-এর কাছে ভালো হলে 'খ'-এর কাছে খারাপ বা তার উল্টো। অর্থাৎ, যাদের মধ্যে মনের মিল থাকে, তারা পরস্পরের কাছে ভালো। চোরের সঙ্গে চোরের বন্ধুত্ব, সাধুর সঙ্গে সাধুর। ভালো-মন্দ বিষয়টি আপেক্ষিক এবং তা মানুষের আচরণ এবং স্বার্থনির্ভর। তাই আমাদের নিঃস্বার্থ হতে হবে, আচরণ ভালো করতে হবে, নিরপেক্ষ থাকতে হবে, তাহলেই সবার কাছে ভালো থাকা যাবে। অন্যের কাছ থেকে শুনে বা অনুমান করে কাউকে খারাপ ভেবে দূরে ঠেলে দেয়া যাবে না। খারাপ মানুষকে ভালো করার দায়িত্বও ভালো মানুষকেই নিতে হবে।

'আকাশে থুথু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে।' অর্থাৎ, অন্যের দুর্নাম করলে নিজের দুর্নামও অন্যে করবে। তাই দুর্নামকারীকে কেউ পছন্দ করে না, ঘৃণা করে, এই ভেবে যে সে আমার বিরুদ্ধেও দুর্নাম করতে পারে। কারণ, এটা তার স্বভাব। দুর্নামকারীকে উপদেশ দিয়ে দমানো না গেলে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে, সেটাই উত্তম পথ। আসুন, আমরা কারও দুর্নাম না করি। সবাইকে ভালো হিসেবে নিই, এভাবেই দুর্নাম করার হীন মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে কমাই। সমাজ থেকে দুর্নামের ভয়ঙ্কর চাপ লোপ পাক। কেউ মারাত্মক খারাপ বা ক্ষতিকর কিছু করলে দুর্নাম চেপে রাখা ঠিক নয়। তাতে দুর্নামকারী এবং অভিযুক্ত উভয়েরই ক্ষতি হয়।

৫. কানকথা খারাপ

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, যিনি কানকথা বলেন এবং যার কাছে কানকথা বলা হয়, এ দুয়ের মধ্যে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ? আমি মনে করি, সরল-সহজ উত্তর আসবে, যার কাছে বলা হয়, তিনি পজিশনে বড় বা ঊর্ধ্বতন, তাই তিনিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সব সময় একথা সঠিক নয়। কারণ, একজন অতি চালাক বা ধূর্ত

সহকর্মী অধস্তন হয়েও যদি তার অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য ঊর্ধ্বতনকে সুচতুরভাবে একটা স্বার্থপর প্রস্তাব দেয় এবং বস সেটা বুঝতে না পেরে বা Verify না করে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, (সরল মানুষের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক) এবং সে মোতাবেক কাজ করেন তাহলে তাতে প্রতিষ্ঠানের এবং তথায় কর্মরত নিরীহ মানুষের ক্ষতি হবে বা হতে পারে। বস্ যদি বিচক্ষণ হন, তথ্য যাচাই-বাছাই করে সত্য চিহ্নিত করার পর কাজ করেন, তাহলে সবাই উপকৃত হবেন। ওই টাউট লোক ধরা খেয়ে যাবেন, তার চালাকিও বন্ধ হয়ে যাবে। এতে বস্ বিপদে পড়বেন না, তার দফতর বা প্রতিষ্ঠানেরও ক্ষতি হবে না। তাই বসকে কখনই ভুল তথ্য দেয়া যাবে না, বিপথগামী করা যাবে না। আবার গুরুত্বপূর্ণ বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর এমন তথ্য না দিয়ে চুপচাপ বসেও থাকা যাবে না। এটা মুনাফেকি এবং অপরাধমূলক তৎপরতা। এতে প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবার ক্ষতি হবে। বস্ পিতার মতো, পরিবার বা দফতরের নেতা বা মাথা। তার সঙ্গে সৌজন্য এবং সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে। তাকে মানতে হবে, যেমন পিতা অশিক্ষিত হলেও আমরা তাকে মানি। মনে রাখতে হবে, আমি বসের সঙ্গে ভালো আচরণ করলে আমি যখন বস্ হব তখন আমিও ভালো আচরণ পাব, সহযোগিতা পাব। পরিবেশ নষ্টকারী এবং পরিবেশ রক্ষাকারী, উভয়ই পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য একসঙ্গে কাজ করলে পরিবেশ বাঁচবে, প্রতিষ্ঠান বাঁচবে, আমরাও বাঁচব। তাই কথা লাগানোর মতো বা কানকথা বলার মতো জঘন্য কাজ করব না। তবে, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা দফতরের অন্য কারও বিরুদ্ধে কখনও কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের কথা শুনলে চুপ করে বসে থাকা যাবে না। তা ঊর্ধ্বতনদের অবহিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এতটুকু করার ক্ষমতা এবং অধিকার সবারই থাকে এবং এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতার দায়িত্ব অনেক বেশি।

৬. ধূর্ত বন্ধু অপেক্ষা বোকা শত্রু ভালো

ধূর্ত অধস্তনের কাছে দুর্বলচিত্ত, অদক্ষ ও নির্বোধ ঊর্ধ্বতনরাই ধরা খেয়ে ধরাশায়ী হন। আবার ওই ঊর্ধ্বতনরা সহজ, সরল এবং স্পষ্টবাদী অধস্তনদের সহসা পাত্তা দেন না, বেওকুফ ভাবেন। ধূর্ত লোকেরা ধাপ্পাবাজি করে দু'জন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব নষ্ট করতে পরঙ্গম। তাই পুনরায় বলি, **Love all but trust none blindly,** এই সূত্র পালন করুন। নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, অন্যের সঙ্গে আলাপ করুন। কানকথা শুনেই উত্তেজিত হবেন না। মনে রাখতে হবে, **রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।** যাচাই করে তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।**

তবে ক্ষতিকর বা ধূর্ত হলেও এরূপ Source বা Informer-কে চটানো যাবে না, Good Humour-এ রাখতে হবে। তা না হলে Information পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, তার তথ্যে কখনও কখনও কিছু সত্যতা থাকতেও পারে। যে মিথ্যা বলে সে দুষ্ট। অন্যের ক্ষতি করে নিজের লাভ করাই তার প্রধান কাজ। তাই আত্মবিশ্বাসী হউন। বোকা বা সরল মানুষকে **পাগলে কি-না কয়, ছাগলে কি-না খায়** বলে দূরে ঠেলে দেবেন না, অবজ্ঞা করবেন না। কারণ, একটা কথা মানতে হবে, পাগলে যা কিছুই বলুক না কেন, মিথ্যা বলে না, আর ছাগলে সবকিছু খেলেও ঘুষ খায় না। তাই পুনরায় বলি, নিরীহ সৎ মানুষকে বোকা ভেবে দূরে ঠেলে দেবেন না। তা করলে সত্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে মিথ্যার অনাচার বেড়ে যাবে। তাতে মানুষ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সবার অভিন্ন টার্গেট হতে হবে, **মিথ্যা বলব না, সদা সত্য কথা বলব**। নিজে ভালো থাকব, অন্যকে ভালো থাকতে সাহায্য করব। Live & Let Live সূত্র মেনে চলব। কারও অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজকে প্রশ্রয় দেব না। প্রতিবাদ করব, নিজের স্বার্থে, অপরের স্বার্থে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। একে অপরকে স্ব-স্ব গণ্ডির মধ্যে থেকে সহযোগিতা করব, পাহারাও দেব। তাহলেই **প্রশাসনের চার চোখ** কথাটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা পাবে এবং সবাই তার উপকার পাবে। এর ফলে দফতরের মধ্যে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কেউ কারও বিরুদ্ধে বলার আগে তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখবেন যে এটা ব্যাংকের স্বার্থের অনুকূলে না প্রতিকূলে। প্রতিকূলে হলে প্রতিবাদ করবেন, প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবেন, অনুকূলে হলে সমর্থন দেবেন প্রতিষ্ঠানের অনুশাসন এবং শৃঙ্খলা মেনে। তাতে সবার মঙ্গল হবে।

৭. সেবা, মৌলিক অধিকার

অফিসের পরিবেশ সুষ্ঠু, সুস্থ এবং সার্বজনীন কল্যাণকর রাখার দায়িত্ব অফিসে কর্মরত সবার। সেবাসহ অফিসের ভালো পরিবেশের উপকার পাওয়াটা ব্যাংকার ও গ্রাহক উভয়ের মৌলিক অধিকার এবং এ অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের সবার সচেষ্ট হওয়া দরকার। তবে ব্যাংকে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব কর্মীদেরই বেশি। কারণ তারা হোস্ট। তাই গ্রাহক-ব্যাংকার সবাইকে একমত হয়ে, একে অপরের প্রতি সহমর্মী হয়ে দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখার জন্য পরিবেশ ঠিক রাখতে সচেষ্ট হতে হবে; যাতে গ্রাহক আমাদের ব্যাংকে লেনদেন করতে আকর্ষণ বোধ করেন, স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন এবং আমরা ভালো গ্রাহকদেরকে উপযোগী সেবা দিয়ে নিরাপদ এবং স্বস্তি অনুভব করাতে পারি এবং তাতে ব্যাংক মজবুত হয়ে আমাদের চাকরি নিরাপদ করতে পারে।

আবারও বলি, নিজের সুবিধার জন্যই কোনো গ্রাহক একটি ব্যাংক এবং তার কোনো শাখাকে পছন্দ করেন। আমরা পরিবেশ ঠিক রেখে সার্ভিস ভালো দিয়ে যদি সম্মানিত গ্রাহকের আস্থা অর্জন করতে পারি এবং তাদেরকে আমাদের ব্যাংকে ধরে রাখতে পারি, তাহলে তারা আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। অপরদিকে, কোনো শাখার কর্মীকুলের খারাপ আচরণের কারণে সব গ্রাহক ওই শাখা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে সেই ব্যাংক-শাখা বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে, অন্য সবার চেয়ে আমরা অর্থাৎ ওই শাখার কর্মীবাহিনীর লোকেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব। কারণ, ওই শাখায় কর্মরত সব কর্মী অর্থাৎ আমরা ব্যাংকে তখন প্রয়োজন-অতিরিক্ত (Redundant) হিসেবে চিহ্নিত হব এবং তখন আমাদের চাকরি যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। মালিকগণ ভাববেন, এদের অযোগ্যতার কারণেই শাখাটি বন্ধ হয়েছে। তাই এদেরকে চাকরিতে রেখে লাভ নেই। Branch Banking System আছে বলেই আমরা এখনও টিকে যাচ্ছি। ইউনিট ব্যাংকিং প্রথা হলে আমরা ধরা খেয়ে যেতাম অনেক আগেই।

আমি দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, নিজের উন্নতি নিজের হাতে। তাই আমার ও আমার পরিবারের উন্নতি, ব্যাংকের উন্নতি এবং সর্বোপরি দেশের উন্নতিকল্পে আমি সত্যবাদী হব এবং সৎ থাকব, স্পষ্টভাষী হব, নিরপেক্ষ থাকব, দক্ষ কর্মী হব এবং সততার সঙ্গে পর্যাপ্ত শ্রম দিয়ে কাজ করব। বিশ্বাস করতে হবে, আমি সৎ না হলে, দক্ষ না হলে বা নিরপেক্ষ না হলে এবং সে মোতাবেক কাজ না করলে আমার প্রতিষ্ঠান বা আমার দেশ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। দেশের বেশিরভাগ মানুষ ভালো না হলে দেশও রক্ষা পাবে না।

৮. গণতন্ত্রমনা

আমি প্রকৃত গণতন্ত্রমনা হব, দেয়া-নেয়াতে বিশ্বাসী হব, স্বার্থপরের মতো শুধু নেব, দেব না, তা হবে না। তাই আমরা অন্যের কাছ থেকে নেব এবং অন্যকে দেবও। অন্যের কাছ থেকে শিখব এবং অন্যকে শেখাবও। এরূপ উদারতা সার্বজনীন কল্যাণকর। তাই তো বিদ্যা অর্জন সম্পর্কে কবি বলেছেন, **এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে, যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।** এখানে আমি বলতে আমাদের সব কর্মীকে বোঝানো হয়েছে। আমরা সবাই যদি কাজে প্রত্যয়ী হই এবং কঠোর পরিশ্রম করি তাহলে প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল হবে। ফলে আমাদের সবার উন্নতি হবে। তাই আসুন, মনের সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলি এবং একটি স্মরণীয় কবিতা অনুসরণ করি, **সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।**

৯. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

অবৈধভাবে কিছু পাওয়ার নির্বোধ আকাঙ্ক্ষার অপর নাম লোভ। ধ্বংসকারী লোভের উর্বর বীজ বিষাক্ত মহীরুহ হয়ে মানুষের অনিবার্য ক্ষতি করে অক্টোপাশের মতো। লোভে পড়লে মানুষ বিবেক হারিয়ে চলার শক্তি খোয়ায় এবং তখন তার নিজের ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতাও লোপ পায়। লোভ রিমোট কন্ট্রোলার হয়ে ওই হতভাগা লোভী মানুষকে তার নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করে রোবটের মতো। ফলে তখন সে আর নিজের ক্ষতি রোধ করতে পারে না। তাই, কাজ না করে, কম করে বা জালিয়াতি করে বেশি সুবিধা পাওয়ার লোভে পড়ে নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করা অনুচিত। মানতে হবে, আমার প্রতিষ্ঠান দৈনিক সোনার ডিম দেয়া একটি দামি হাঁস। তাকে বাঁচিয়ে রাখব, প্রতিদিন ডিম পাওয়ার জন্য। একদিনে সব ডিম পাওয়ার লোভে হাঁসটিকে একবারে জবাই করে মেরে ফেলার মতো বোকামি করব না। কারণ, হাঁস মরে গেলে ডিম পাওয়া যাবে না। যেমন গাছ মরে গেলে ফল পাওয়া যায় না। আমার প্রতিষ্ঠানও ওই হাঁস বা গাছের মতো। যা আমার মূল পুঁজি। অতএব, কোনোভাবেই এই পুঁজিকে নষ্ট করা যাবে না, সততার সঙ্গে শ্রম দিয়ে, একনিষ্ঠভাবে কাজ করে আমরা আমাদের পুঁজিকে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানকে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখব এবং একে উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যাব। নিজেদেরই স্বার্থে। **লোভে পাপ পাপে মৃত্যু** - এই অমোঘ প্রবাদের প্রকোপে পড়ব না। ভালোভাবে টিকে থাকব।

১০. তদবির বা ধরপাকড়

কেউ কেউ বলতে পারেন, তদবিরে বা ধরপাকড়ে চাকরি পাওয়া অপরাধ, আমি বলি, না। বরং চাকরি পাওয়ার পর তা টিকিয়ে রাখার জন্য সঠিকভাবে কাজ না করে বা অপরাধ করে তদবিরের সহায়তা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা অপরাধ। যোগ্যতা না বাড়িয়ে তদবির করে পদোন্নতি, পদায়ন নেয়া মহা অপরাধ। এরূপ পদোন্নতি কেউ নিলে তা হবে অপুষ্ট এবং অবোধ। সেই অপুষ্টি তার দেহকে অসাড় এবং মনকে পঙ্গু করে তার কর্মক্ষমতা কমাবে। তাদের অপরিপক্ব সিদ্ধান্ত মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করবে যার অভিশাপ তাদেরই ওপর গিয়ে পড়বে। নিজের এরূপ অযোগ্যতার কথা তিনি কাউকে না পারবেন বলতে, না পারবেন সইতে। একটা অচলাবস্থা তাকে গ্রাস করবে। তার অবস্থান ক্রাশ করবে। তাই আমাদের উচিত হবে কাজে পরিমিত দক্ষ বা পটু না হলে পদোন্নতি না নেয়া। পুষ্ট হওয়ার আগেই কিল মেরে কাঁঠাল পাকানোর মতো করে পদোন্নতি নেয়া ঠিক নয়। তাই কাজ না শিখে, দক্ষতা না বাড়িয়ে, শুধু তদবিরের মাধ্যমে Migration করে, শঠতার আশ্রয় নিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান বদলিয়ে অথবা একই প্রতিষ্ঠানে

অল্প সময়ে তরতর করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করব না। করলে ধপ করে পড়ে যাব এবং তাতে প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠান বাঁচলে আমরা বাঁচব, করে খেতে পারব। যোগ্যতা না থাকলে তা মেনে নিতে হবে। নিজেদের স্বার্থেই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের সৎ চেষ্টা এবং বলিষ্ঠ সমর্থন দিয়ে। এর ফলে আমাদের চাকরিদাতাকে সম্মান করা হবে, সহযোগিতা করা হবে, তারা খুশি থাকবেন, প্রশান্তি পাবেন, আমাদেরকেও দোয়া করবেন।

১১. শাসন ও সোহাগ

শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে। এ বাণী চিরন্তন। অধিকাংশ অবুঝ পিতা-মাতা মমতায় দুর্বল হয়ে তাদের সন্তানদের অতিরিক্ত স্নেহ করে প্রয়োজনের সময় তাদেরকে পর্যাপ্ত শাসন করেন না বা কম শাসন করে থাকেন। ফলে ওইসব সন্তানের অধিকাংশই অকর্মণ্য হয়ে বিপথে যায়, গোল্লায় যায়, ভণ্ড হয়ে প্রতারণা করতে শেখে। তাই সোহাগকে উপলক্ষ এবং শাসনকে লক্ষ্য বানিয়ে কাজ করতে হবে। অফিসের অবস্থা কিছুটা ভিন্নতর। প্রশাসনে কড়া হলে নিজের চাকরি দুর্বল হবে, এই অহেতুক ভয়ে ঊর্ধ্বতনরা অনেক সময় শক্ত কাজে নমনীয় হয়ে যান। প্রয়োজনে অধস্তনদের শাসন করেন না, শোধরান না। অপরদিকে যারা একটু ভালো কাজ করেন, তাদের দিয়ে অধিক কাজ করিয়ে ঘাটতি পুষিয়ে নেন। তাদেরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, প্রশ্রয় দেন। তাতে দফতরে তাদের অপরিহার্যতা বেড়ে যায়। তারা দুঃসাহসী হয়ে লোভে পড়ে, জালিয়াতি করে বসে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়। অবশ্য তারাও ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পায় না। তাই এ ধরনের ক্ষতি রোধ করার জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী বা Defense Line তৈরি করা দরকার।

উপরোল্লিখিত খুটিনাটি বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্যই ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। মনে করি, ট্রেনিং-কেন্দ্রই শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। তবে কর্মস্থলে হাতেনাতে কাজ করাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অধস্তন কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ তাদের নিজের এবং তাদের অভিভাবকদের বা ঊর্ধ্বতনদের হাতে। তাদেরকে যদি কাজ না শেখানো হয় এবং তারা যদি সঠিকভাবে না শেখে তাহলে তারা করতে পারবে না। অতএব, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বা কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতনরা অবশ্যই অধস্তনদের ভালোভাবে কাজ শেখাবেন এবং অধস্তনরাও সিরিয়াস হয়ে সে শিক্ষা নেবেন। এছাড়া তারা দেখে শিখবেন, পড়ে শিখবেন। শেখার আবশ্যকতা শুধু দফতরে নয়, সামাজিক পরিবেশেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মেয়ে বিবাহের আগে পিত্রালয় থেকে ঠিকমতো শিক্ষা না নিয়ে গেলে শ্বশুরবাড়িতে অসুবিধায় পড়বে। কি কর্মে, কি

ব্যবহারে, সব ক্ষেত্রেই, শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শিখতে চাইলে প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান শেখার অবারিত সুযোগকে, কাজে লাগাতে হবে। প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ শিক্ষার অনেক উপাদান দিয়েছেন। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র, নানান ভাবের নতুন কিছু শিখছি দিবারাত্র।

১২. সৌরভ ও গৌরব

ফুলের সৌন্দর্য আছে, সৌরভও আছে। তাই ফুল সবাই পছন্দ করে। আবার গৌরবও কম মানুষই অপছন্দ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'ফুলের সৌরভ এবং মানুষের গৌরব কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়।' তথাপি আমরা ক্ষণস্থায়ী গৌরবের পেছনে ছুটি, অস্থায়ী সৌরভ নিতে চাই বা তা ছড়াতে মেতে উঠি পর্যাপ্ত কাজ না করে। ত্যাগ না করে গৌরব পাওয়া গেলে তা হবে মেকি বা জোর করে আদায় করা বা কিনে নেয়া। আসুন, প্রতিজ্ঞা করি প্রকৃত শিক্ষা নিতে। আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। বিবেককে সচল রেখে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা উচিত। তাতে ধীরে ধীরে ফুলের সৌরভের মতো ভালো কর্মীর গৌরব ছড়াবে। এভাবেই মানুষ সুনাম কুড়াতে পারে। আবার এও মনে রাখতে হবে, কর্মের ফল দীর্ঘস্থায়ী। তাই ভালো কাজের মাঝেই আমাদেরকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ওই ভালো কাজের সুবাদে বরণীয় হব এবং এর ফলে আমার চাকরিদাতা আমাকে চাকরি দিয়ে যে বদান্যতা দেখিয়েছেন, তার প্রতিদান দেয়া হবে। আমার ঋণ শোধ হবে, আমি বুক ফুলিয়ে চলতে পারব। পক্ষান্তরে, উল্টোটা করলে তিনি অপমানিত হবেন। তখন সবাই অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে বলবেন, আপনার লোক চোর বা খারাপ, তখন তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বেকারত্ব দূরীকরণে এবং সামাজিক কল্যাণ সাধনে চাকরিদাতার অবদানের গৌরব ম্লান হয়ে যাবে। তিনি অনুতাপ করবেন। ভাববেন, 'এমন লোককে চাকরি দিয়ে ভুলই করেছি।' হয় তো ভবিষ্যতে তিনি আর কাউকে চাকরি দেবেন না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসবেন। সেটা কি ভালো হবে? অতএব, আমরা ভালো কাজ করে সার্বজনীন, সুফলের এ সুযোগটা নষ্ট করব না। শুধু তকদিরকে বিশ্বাস করেও বসে থাকব না, তদবির-নির্ভরও হব না। বরং দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে আমাদের বিশ্বাস, সততা ও শ্রম দিয়ে নিজেদের রক্ষা করব। প্রতিষ্ঠানকে গড়ব সবার স্বার্থে। আজ চীনের উন্নতি, ভারতের উন্নতি তাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর কারণে। তারা তাদের ত্যাগ দিয়ে, দক্ষতা দিয়ে, জনগণকে জনবলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা গর্বিত। ভৌগোলিক পরিসরের আঙ্গিকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমরা এ দু'দেশের

কাছাকাছি অবস্থানে। তাহলে আমরা কেন পারব না? আরাম উপেক্ষা করে, জনগণকে কাছে টেনে তাদের কাজে লাগিয়ে সবার সম্মিলিত ত্যাগ দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৌরব অর্জন করতেই হবে আমাদের ।

১৩. প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব

কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার কাজের ওপর, তার Infrastructure-এর ওপর; Superstructure-এর ওপর নয়। হ্যাঁ, মজবুত কংক্রিটস্ট্রাকচার বানালে তা অধিক টেকসই হবে, তবে সেটা যে কাজের জন্য বানানো হয়েছে, সেই কাজ ঠিকভাবে না হলে প্রতিষ্ঠান টিকবে না। অর্থাৎ, ব্যবসার জন্য অফিস-ঘর বা ফ্যাক্টরি জাঁকজমকপূর্ণ করে বানালে ওই ব্যবসা ভালোভাবে না চললে বা চালাতে না পারলে সেই ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের মূল্য কোথায়? আমাদের বুঝতে হবে, Empires of future will not be built of concrete walls stones & Royal Gates. The Empires of future will be the empires of mind. প্রতিষ্ঠান রাখতে হলে, চালাতে হলে সৎ, পরিশ্রমী ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন। তাই যারা কাজে ভালো তাদেরকে মালিক চাকরিতে না রেখে পারেন না, তাদের চাকরি যাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর, অযৌক্তিক, অসম্ভব। কারণ, কোনো বাসায় একাধিক কাজের লোক থাকলে সব দিক দিয়ে ভালো লোকটিই মনিবের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। আমরাও তো কাজের লোক। কাজে পটু না হলে মালিক খুশি হবেন কী করে, আমাদেরকে রাখবেন কেন? অতএব, কাজ জানতে হবে, শিখতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পক্ষান্তরে, কাজ দিলেই আমি এটা জানি না, পারব না বা করতে পারি না এরূপ বলা চলবে না। শিখতে হবে এবং সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এমনটি করলে টিকে থাকা যাবে এবং তাতে চাকরি যাওয়া সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যিনি কাজ শিখবেন না বা ভুল করবেন, কাজ করবেন না বা কম করবেন, তার জন্য চাকরি হারানোর ভয় তো থাকবেই, থাকাই উচিত এবং এটাই স্বাভাবিক। 'ঘরজামাই' বসে বসে খেতে পেলে **শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি** বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে তাকে একদিন শুনতেই হবে, **দু'দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।** অকর্মণ্য হলে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ কাউকে বসে খেতে দেবে না, দেয় না। অর্থাৎ ফ্রি লাঞ্চ কোথাও পাওয়া যাবে না। Survival of the fittest. মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কর্মীদের দক্ষতার ওপর। দক্ষতা নির্ভর করে সৎ প্রচেষ্টার ওপর।

১৪. জনবল বনাম জনশক্তি

তদবিরে চাকরি পাওয়া লোকেরা কাজ করে না, তাদেরকে দিয়ে কাজ করানোও যায় না। কাজের জন্য চাপ দিলে ম্যানেজমেন্টের ওপর চাপ আসে। এরূপ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। আমার বিবেচনায় এটা অপবাদ। এই অপবাদ ম্যানেজমেন্টের গণ্ডিতে সুপ্ত হলেও বাতাসে জোরেশোরে বিরাজমান। এটা পরিবেশ দূষণ করে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করছে। এই অপবাদকে অহেতুক অপবাদই বলব। কারণ, এ ব্যাপারে ব্যাংকের সম্মানীয় মালিক পক্ষের যৌক্তিক অনুভবের উদাহরণ অকাট্য এবং অপেক্ষাকৃত তা বেশি শক্তিশালী। যেমন, মানুষ কাজ শিখে জন্মায় না, জন্মে শেখে এবং শেখানোর দায়িত্ব অভিভাবকদের এবং অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। কথিত অভিযোগ প্রমাণ করে, আমরা অর্থাৎ ঊর্ধ্বতনরা, অধস্তনদের দিয়ে কাজ করাতে পারি না। হয় আমাদের অদক্ষতার জন্য, না হয় দুর্বলতার কারণে। তাই এরূপ অপবাদ মাথায় নিয়ে চলতে হচ্ছে। এটাকে এভাবে চলতে দেয়া উচিত নয়। আমরা সজাগ হলে, স্বচ্ছ হলে, নিরপেক্ষ হলে এবং সর্বোপরি শক্ত হলেই এই অসত্য অপবাদকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে অধস্তনদের দায়িত্ব বা আগ্রহ এবং একনিষ্ঠতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তারা কাজে আগ্রহী না হলে এটা করা সম্ভব নয়। তাদেরকে বুঝতে হবে, কাজে আগ্রহী হলে তাদেরই উপকার বেশি। যাহোক, প্রতিষ্ঠানে বিরাজিত এরূপ কিছু অনীহ লোকের কর্মবিমুখতার কারণে সৃষ্ট সিস্টেম লস্ পূরণ করে ব্যাংকের আউটপুট বৃদ্ধি করতে পারলে আমরা লাভবান হব, মালিকরাও হবেন। শুধু তা-ই নয়, তারা গর্ববোধ করবেন এই ভেবে যে, কর্মহীনদের বা বেকারদের চাকরি দিয়ে তারা পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। কর্মচারী হিসেবে মালিকদের এই মহান উদ্যোগকে সফল করার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আসুন, তদবিরে চাকরিরত লোকদেরকে বিচ্ছিন্ন ভেবে তাদেরকে দূরে সরিয়ে না রেখে সোহাগ করে, শাসন করে, বুঝিয়ে কর্মমুখী করে গড়ে তুলি, যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের সবার দায় মোচন হয়। এরূপ করা হলেই জনবল জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এতে কোনো ভুল নেই। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সমাজে তদবির, স্বজন-প্রীতি থাকবেই। তবে তাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে এবং এর দায়িত্ব আমাদের মতো ঊর্ধ্বতনদেরই।

১৫. চাকরি মজবুত করার কৌশল

সৎভাবে কাজ করার মাধ্যমে চাকরি মজবুত করার আর একটি সুকৌশল হচ্ছে রিলেশনশিপ ব্যাংকিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। প্রত্যেক অফিসার ৫টি করে ডিপোজিট এবং ৫টি করে এসএমই লোন অ্যাকাউন্ট আনলে এবং রিলেশনশিপ

ম্যানেজার হিসেবে ওইসব হিসাব এবং তাদের কর্মকাণ্ডগুলো নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে পরিচর্যা করে তাদেরকে সহযোগিতা করলে, সেই ব্যবসা ভালোভাবে চলবে। তাতে হিসাব করে দেখা যাবে, ওই ক'টি হিসাবের নিট আয় দিয়েই ব্যাংক ওই সংশ্লিষ্ট অফিসারের বেতন-বোনাস পরিশোধ করে আরও কমপক্ষে দু'গুণ বেশি আয় করতে পারবে। এরূপ হলে মালিক বা ব্যাংক আপনাকে বিদায়-ছাঁটাই করবে কেন? প্রশ্নই ওঠে না। মনোযোগ দিয়ে রিলেশনশিপ ব্যাংকিং করলে, আপনার ওপর ব্যাংকের এবং ব্যাংকের ওপর গ্রাহকদের আস্থা জন্মাবে। Normal বদলি হয়ে গেলেও একে অপরের রিলেশনশিপ হিসাবগুলোর দায়িত্ব নেবেন Hand-over বা Take-over-এর মতো। তাতে গ্রাহক ভুগবে না, ব্যাংক ভালো চলবে। ব্যাংকের কলেবর বৃদ্ধি পাবে, ব্যাংকের অবস্থান মজবুত হবে, শুধু টিকে থাকার জন্য নয়, বড় আকারে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্যও। এর ফলে ব্যাংকের কর্মীবাহিনীর ওপরে ওঠার সুযোগ বাড়বে। এই প্রথাকে মিনি ব্যাংকিংও বলা যায়। এর অর্থ, কর্পোরেট ব্যবসার পাশাপাশি SME ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে সবাই মিলে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে, কাজ করলে ঝুঁকি ভাগ হয়ে যাবে। ব্যাংকে Ethical বা Positive Compititon শুরু হবে এবং তাতে ব্যাংক ভালো করবেই। Potential বলেই SME এখন বিশ্বনন্দিত ব্যাংকিং কার্যক্রম। ব্রয়লার মুরগির মতো অফিসের মধ্যে বসে থেকে অচল হব না। ব্যাংকের বিশেষ করে এসএমইর কাজ করতে বাইরে যাব। পর্যাপ্ত ফিল্ড ওয়ার্ক করব, সচল এবং সবল থাকব।

কাজে মনোযোগ দিলে পরনিন্দা, পরচর্চার মতো আত্মঘাতমূলক খারাপ কাজ করার ফুরসত পাওয়া যাবে না। কাজে মজা পেলে ফাঁকি দেয়ার সুযোগও নিতে চাইবে না কেউ। তবে এই রিলেশনশিপ বা মিনি ব্যাংকিংয়ের কাজ খুবই চ্যালেঞ্জিং। এ কাজকে ফলপ্রসূ করতে গেলে এসি রুমে বসে চাকরি করার আরামকে হারাম করতে হবে। বিলাসী মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে হবে। কারণ, কষ্ট এবং আরাম একসঙ্গে হয় না। ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করলে যে কোনো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। দুর্গম সুড়ঙ্গের সামনে যেমন আলো থাকে, আলোর পরে অন্ধকার, দিনের পরে রাত, দুঃখের পরে সুখ; তেমনি আমাদের সামনেও আলো আছে। তাই ভয় না পেয়ে বা হতাশায় না ভুগে কাজকে এড়িয়ে না চলে, ভয়-জড়তা ঝেড়ে ফেলে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে জয় আমাদের হবেই। আমাদের মঙ্গল আমাদেরই হাতে– বিশ্বাস করতে হবে। এরূপ বিশ্বাস মনে নিলে পরাজয় পেছন দরজা দিয়ে পালাবে এবং তাতে আমাদের কল্যাণ হবে।

মানুষের একটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো দাঁড়াতে দিলে বসতে চায়, বসতে দিলে শুতে চায়। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বা হাঁটতে চায় না, খাটতেও চায় না।

কিন্তু একটা কথা মানতে হবে, হাত না বাড়ালে পাত পড়ে না, পাত না পড়লে খাবার পাওয়া যায় না। খাবার সামনে দিলেই খাওয়া হয় না। হাত-মুখ নাড়াতে হয়। সেটাও কাজ। তাই খেতে হলে কাজ করতে হবে। এটাই জাগতিক নিয়ম। এটা মেনে চললে চাকরি মজবুত হবেই। ব্যাংকিং সেক্টর এভাবে চললে দেশের অর্থনীতি সফল হবে, ব্যাংকের অবস্থাও সুদৃঢ় হবে।

১৬. পুরনোকে ছাড়া নতুনকে ধরা

অধিকাংশ মানুষের একটা সহজাত অভ্যাস হচ্ছে পুরনোকে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং নতুনের বিরোধিতা করা। তারা নতুনের বিরুদ্ধে নানা দোষত্রুটি তুলে ধরে নতুনের ভালোত্বকে ম্লান করে দিতে চায়। পুরনোকে নিয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, কারণ, তাতে আরাম করা যায়, হয়রানি-পেরেশানি থাকে না, কাজ করার বাড়তি ঝুঁকি পোহাতে হয় না। তাই দেখা যায়, মিটিংয়ে নতুন কোনো প্রজেক্টের কথা উঠলেই অনেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পয়েন্ট নিয়ে গলাবাজি করে তা স্ট্যান্ড করাতে চায়, অর্থাৎ নতুন কাজে বিরোধিতা করে। তখন মিটিংয়ে অপর নিরীহ মানুষেরা চুপ থাকে এবং তাতে অনেক সময় ভালো কাজের মূল প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এটা তারা করে তাদের নিজের লাভের জন্য। সে লাভ হয় বস্তুগত না হয় অবস্থানগত, অর্থাৎ, নেতা হওয়ার অভিলাষ। অথচ নতুন প্রস্তাবের Merit Demerit নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো দেখা যাবে, Demerit খুবই কম। এই পরিস্থিতিতে সবাইকে নমনীয় এবং সজাগ হতে হবে এই যুক্তিতে যে, নতুন কাজে কিছু দুর্বলতা এবং ঝুঁকি থাকতেই পারে। তবে তা যদি সার্বজনীন স্বার্থের পরিপন্থী না হয়, অর্থাৎ ওই কাজে ক্ষতির তুলনায় লাভের পাল্লা যদি ভারী হয়, তাহলে ওই ন্যূনতম বা ক্ষুদ্র দুর্বলতা বা সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার জন্য সাহসী হয়ে এগোতে হবে। কারণ, প্রবাদ বলে, No Risk No Gain.

ওপরের যুক্তির পক্ষে একটা উপমা দেয়া যায়। যেমন, জার্মানির রনজেন্ট যখন এক্স-রে আবিষ্কার করলেন তখন মহিলা মহল থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতা আসে এই বলে যে, এক্স-রে তাদের শরীরের অঙ্গের গোপনীয়তা নষ্ট করবে। এ কারণে ওই আবিষ্কারককে মহিলা মহল থেকে এক পর্যায়ে মেরে ফেলার দাবি উঠল, যদিও তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু এখন দেখেন, কী হারে আল্ট্রাসনোগ্রাম হচ্ছে, এক্স-রের কথা তো বলাই বাহুল্য। কথিত বাধা যদি ওই উদ্যোগকে বন্ধ করত, তাহলে কি আজকের মানুষ অত্যাধুনিক এক্স-রে বা আল্ট্রাসনোগ্রাম ইত্যাদির মতো উন্নত চিকিৎসার সুবিধা ও সুযোগ পেত? পেত না। না পেলে কী হতো? মানুষ আগের মতো অকালে বেঘোরে মারা যেত। তাই ভাবুন, ভালো কিছু করার

জন্য চিন্তা করলে এবং সেই চিন্তা বাস্তবে রূপ দিতে মনে দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করলে তাতে বাধা এলেও তা টিকবে না, জয় হবেই। এটা সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য। তাই কোনো কাজে বাধা এলেই মনে করতে হবে, সেই কাজটি ভালো। কারণ, ভালো কাজে বাধা থাকবেই। তবে সর্বোপরি আপনাকে Convince হতে হবে যে, কাজটি অবশ্যই ভালো এবং সার্বজনীন উপকারী।

১৭. সততা ও তার উপকারিতা

সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এই মর্মবাণীর বাস্তবতা আমাদের মানসিকতার এবং উপলব্ধির ওপরই নির্ভরশীল। সৎ কাজ করা কষ্টের। কারণ তা সংযমের। অসৎ কাজ আনন্দের। কারণ তা ক্ষণস্থায়ী হলেও নিছক আড়ম্বরের এবং পুলকের। বেহিসাবি উপভোগের পরিণতি ভালো হয় না। সম্পদ নিষ্পাপ না হলে তা ধরে রাখাও যায় না। কর্পূরের মতো নিঃশব্দে উড়ে যায়, যাবেই। অসৎ সম্পদের মালিকরা অতি লোভী হয়। যত পায় তত চায়। অর্থনীতির মূল সূত্রকে অর্থাৎ, **More you get, more you want**-কে ওইসব অসৎ লোক প্রাণে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু আসলে এর অনুসারীরা ধুঁকে ধুঁকে মরে রোগে-শোকে এবং বিপদে-বিপর্যয়ে। এরা ভণ্ড, প্রতারক, শুধু মিথ্যে মেক-আপ দিয়ে চলে। এখানে একটি প্রবাদ পুনঃউল্লেখ করা যায়। **আল্লাহ্ দিলে ফুরায় না, বান্দা দিলে কুলায় না–** তার মানে, অভাব মোচনের জন্য উল্টাপাল্টা কাজ করলেও অভাব মেটে না, বরং বাড়ে। পৃথিবীতে কোনো অবৈধ ভোগবিলাসী মানুষ শান্তিতে আছে, সুখে আছে বলে আমার জানা নেই। আবারও বলি, যার সম্পদ আছে, আরও না পাওয়ার অভাব তাকে পেরেশান করে। যার সম্পদ নেই, তার আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং না পাওয়ার ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক অভাব তাকে বিচলিত করে। এইসব অভাবই মানুষকে কষ্ট দেয়, অশান্তি বাড়ায়। কেউ যদি আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের রিপুকে দমন করতে পারে, তাহলে অভাব তার কাছ থেকে পালাবে। এটাই চিরন্তন সত্য। এই সত্যকে বুঝলে ভোগ ছেড়ে ত্যাগ করবেন, সুখ পাবেন। আবার চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আল্লাহ্ যা দেবেন (অর্থাৎ সৎভাবে যা রোজগার হবে) সেটাতেই চলে যাবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় বিত্তবৈভবের জন্য যারা অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি করেছে, তাদের শোচনীয় পরিণতি ছাড়া শুভ পরিণতি হয়েছে– এমন একটি নজির সমাজ-সংসারে এবং দেশে অথবা বিদেশে কেউ দেখাতে পারবেন না।

১৮. দুনিয়া স্বল্পস্থায়ী, জীবন ক্ষণস্থায়ী

শূন্য হাতে দুনিয়ায় আগমন, আবার শূন্য হাতে বিদায়। তাই স্বল্প সময়ে পৃথিবীতে এসে অস্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা বৃথা। এসব পার্থিব সম্পদ কি কেউ ভোগ করতে পারে বা মহাপ্রয়াণের সময় কবরে বা Tower of Silence-এ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে? না, পারে না। রেখেই তো যেতে হয় বা হবে। যাদের জন্য রেখে যাওয়া হয়, তারা কি ভোগ করতে পারে? পারে না। কারণ, দেখা যায়, Easy got, easy spent হয়ে যায়। কখনও কখনও সম্পত্তি বাটোয়ারা ওয়ারিশদের মধ্যে বিপত্তি ঘটায়। আবার অনেক সময় এমনও হতে পারে, যারা অবৈধ সম্পত্তি বানায় তারা বিষয়টি গোপন রাখে, কাউকে বলে না, এমনকি পরিবারকেও নয়। বিদেশে পাচার করে। সেখান থেকে সে সম্পদ বা টাকা আর সহজে আনতে পারে না। তাই তো বিদেশের অনেক ব্যাংক এসব Private বা গোপন ব্যাংকিং করে বিত্তশালী হয়। কারণ, তারা জমাকারীর মৃত্যুর পর তার হিসাবের জমানো টাকা জমাকারীর মনোনীত ব্যক্তিকে বা উত্তরাধিকারীদের ফেরত দেয় না। ওইসব দেশের আইনে নাকি ফেরত দিতে হয় না। তাই তো শুনেছি। তাহলে অবৈধ সম্পদ সৃষ্টি করে লাভ কী? কত লাগে একটা মানুষের বাঁচতে এবং চলতে? আরও বলি, সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী সম্পদ কখনও এক হাতে, এক পরিবারের কাছে, এক দেশের কাছে থাকে না। বংশধরের জন্য সম্পদ তৈরি করা এবং তা রেখে যাওয়ার তৃপ্তি ও যুক্তি ভ্রান্ত, দুর্বল, ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকর। কারণ, পুনরায় বলি, **সম্পত্তি মানেই বিপত্তি** বা **অর্থই অনর্থের মূল**।

তাই অশুভ পন্থায় অবৈধ উপায়ে সন্তানদের জন্য সম্পদ না বাড়িয়ে, তাদেরকে ন্যায়ের শিক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, ভালো-মন্দ বিচারের শিক্ষার মতো দীর্ঘস্থায়ী সম্পদে বিত্তশালী করে রেখে যেতে পারলে তা তাদের কাজে আসবে। সমাজ ও দেশ তাতে উপকৃত হবে। আগেই বলেছি, 'ভোগে সুখ নেই, ত্যাগে সুখ।' যে মানুষ তার জীবনে এই অমোঘ সত্য উপলব্ধি ও তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারে সেই মানুষই প্রকৃত সুখী। 'লোভ, উচ্চাকাঙ্খা, ক্ষুধা, ঘৃণা এবং চাহিদা'– এই কয়টি মানুষের চরিত্রের খারাপ দিক। এগুলোকে যারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তারাই সবচেয়ে বেশি সুখী হয়। **অভাব সীমাহীন, সম্পদ সীমিত–** অর্থনীতির এই চিরন্তন সূত্রকে তারা হার মানিয়ে দেয়। এটা কঠিন কাজ নয় এই কারণে যে, কেউ যদি চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং তাতেই খুশি হয়, তাহলে যে সম্পদ তার কাছে থাকবে, তাতেই তার অভাব মিটে যাবে এবং এভাবেই অর্থনীতির ওই সূত্র ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। পুনরায় বলি, এটা অসম্ভব, অবান্তর বা অবিশ্বাস্য নয়। সমাজে এমন ত্যাগী মানুষ বহু আছেন এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে এই দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্বের বা টিকে থাকার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন।

১৯. চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

পুনরাবৃত্তি হলেও বলি, প্রবাদে আছে, **লোভ হিংসা ঘৃণা ভয়, এ কয়টি থাকতে নয়**। তাই, ভালো চিন্তা, ভালো কাজ, সৎ গুণাবলি ভালো মানব চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হলে পরচর্চা, সমালোচনা ও পরশ্রীকাতরতার মতো খারাপ অভ্যাসকে (যদি থাকে) কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে, যত দুঃখ এবং ক্ষোভই মনে থাকুক না কেন। কারণ, এগুলোই মানুষকে লোভী এবং হিংস্র বানায়, বিপথগামী করে। তাই ভালো শিক্ষা নেব এবং সবাইকে ভালো শিক্ষা দেব। শিক্ষার স্থান, কাল ও পাত্র নেই। শিক্ষার আওতা ব্যাপক। কোনো মানুষ জীবনে সব শিখতে পারে না। আল্লাহ্‌র অফুরন্ত ভাণ্ডারে শিক্ষার কোনো শেষ নেই। শিক্ষার উপাদান প্রকৃতির সর্বত্র বিস্তৃত, তাই তো কবির ভাষা বলে :

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল, উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হওয়ার শিক্ষা আমি, বায়ুর কাছে পাইরে।

আরও বলতে হয়, শিক্ষার বয়স নেই, সময়ও নেই। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের আওতা বিস্তৃত। তাই তো বিখ্যাত দার্শনিক স্যার আইজাক নিউটন আজীবন গবেষণার পর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেও জীবন সায়াহ্নে অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলেছেন, **আমি এখনও জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে বালু নিয়ে নাড়াচাড়া করছি**। অর্থাৎ, জ্ঞানের অথৈ সাগরের পানিই ছুঁতে পারিনি। কী অপূর্ব বিনয়, মহৎ অনুনয়, নিরংকুশ নিরহংকার এবং সাবলীল অভিব্যক্তি। তাই শিখতে লজ্জা পেতে নেই। শিখে অহংকারও করতে নেই। যে যত শিক্ষিত হবে, বড় হবে, সে তত মাথা নিচু করে চলবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই তো **খাড়া বাঁশ গাছ উঁচু হয়েও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ।**

প্রকৃতির শিক্ষার আর একটা উদাহরণ দেওয়া যায়।

মানুষের হাতে ৫টি আঙুল। আলাদা হলে শক্তি কম, একত্র হলে শক্তি অনেক বেশি। অফিসে, বাসায়, দেশে-বিদেশে, সর্বত্র এই আঙুলের শক্তি এবং শক্তিস্বল্পতার ঐশ্বরিক শিক্ষা কাজে লাগিয়ে, সবাই মিলে বিভেদ ও হিংসা ভুলে, সততার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলে নিশ্চিত সুফল বেশি করে পাওয়া যাবেই, তাতে সন্দেহ নেই। আবার এই পাঁচটি আঙুল কীভাবে 'না' এবং 'হ্যাঁ' বলে মানুষের ভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারে তার নমুনাও দেখুন :

প্রায় সব মানুষই এই চরম সত্য কথাটি বলে থাকেন যে, হাতের পাঁচটি আঙুল সমান নয়, তাই সব মানুষও সমান নয়। এই ভেবে, কেউ যদি নিজেকে কনিষ্ঠ আঙুলের গ্রুপভুক্ত হিসেবে অযোগ্য ভেবে হতাশ হয়ে ভাবেন, আল্লাহ তাকে

কম জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, তিনি সবচেয়ে খাটো আঙুলের মতো নিচের গ্রুপে, তাই তাকে দিয়ে কিছুই হবে না, এই ভেবে কেউ যদি ভেঙে পড়েন, কাজ না করেন, তাহলে তিনি জীবন ও জগতের সক্রিয় দৌড়পাল্লা থেকে ছিটকে পড়বেন। সত্যি সত্যিই তাকে দিয়ে কিছুই হবে না, তিনি কিছুই করতে পারবেন না। একেই বলে হতাশা।

মাটিতে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার কথা ভাবলে সেটা ভাবনাই রয়ে যাবে, কখনও চূড়ায় ওঠা যাবে না। ওঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। তাই তো কবি বলেছেন, 'Standing at the foot boys, gazing at the sky, how can you get up boys, if you never try?' তাই কাজের বা চেষ্টার বিকল্প নেই। আমরা সবাই পরিমিত বা পর্যাপ্ত কাজ করলেই এগিয়ে যাব। ফলে প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে এবং তার উপকার সবাই পাব। একেই বলে অধ্যবসায়ের ফল, যা চরিত্রের ভালো বৈশিষ্ট্য।

২০. রাতারাতি বড় হওয়া

রাতারাতি বড়লোক হওয়া বা ধনী হওয়ার কথা ভাববেন না। এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এরূপ করতে চাইলে হতেও পারবেন না, কখনও হলেও তা টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। কারণ, যে জিনিস যত তাড়াতাড়ি গরম হয়, তা তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। যেমন, লোহা, বালু ইত্যাদি। অনেক অতি চালাক বা ধূর্ত মানুষ শঠতার আশ্রয় নিয়ে, অল্প সময়ে একাধিক পদোন্নতি নিয়ে ওপরে ওঠেন। কিন্তু ওঠার পর তিনি অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অভাবে ততটাই অসহায় ও দুর্বল হয়ে পড়েন। অবস্থান ধরে রাখতে তাকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতেই হয়। অর্থাৎ যে যা বলেন, তিনি তাই করেন, চাকরি হারানোর ভয়ে। কারণ, নীতিবান হয়ে কাজ করার মতো যোগ্যতা, দক্ষতা, মনোবল ও সৎসাহস তার নেই। তাই তিনি পড়ে যাবেনই একদিন। একটি প্রবাদ বলে **ধীরে রাঁধো, সুস্থে খাও, জুড়ালে তার স্বাদ পাও। -** এই নীতি মেনে চলুন। দেখবেন আপনার অবস্থা ভালো হয়েছে। মনে রাখবেন, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ভালো। কারণ **বিন্দুতেই হয় সিন্ধু।**

কাজ না করলে ওপরে ওঠা যায় না, এটা আগে অনেকবার বলা হয়েছে। এখানে কাজের সপক্ষে আর একটি উপমা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যেমন, খাওয়ার জন্য ভাত, তরকারি ইত্যাদি সব সামগ্রী সামনে বেড়ে দিলেই খাওয়া হয়ে যায় না, না খেলে ক্ষুধাও মেটে না। এই খাওয়া পর্বটির মধ্যে কয়েকটি কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন, ভাত-তরকারি পাতে নেয়া, ভাতের সঙ্গে তরকারি মেশানো বা মাখানো, মুখে তোলা, চিবানো এবং গেলা। এতগুলো কাজ না করলে পেট ভরবে না। কখনও ভরবে না। তাই কাজ করতেই হবে। সৃষ্টিকর্তা শরীরে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েছেন ফলদায়ক কাজের মাধ্যমে তা সঞ্চালনের জন্য। শুধু জিম বা ব্যায়ামাগারে গিয়ে, ব্যায়াম করে শরীর ঠিক রাখার জন্য নয়। ব্যায়ামে শরীর ঠিক থাকলেও কাজ না করলে শরীরকে খাওয়াবেন কী? খাওয়ার অভাবে শরীর তো ভেঙে পড়বে। তাই কাজের কোনো বিকল্প নেই।

পাঁচ আঙুলের অন্য একটি দর্শনের উপমায় ফিরে আসি। যেমন, কোনো মানুষই জানে না, সে তার ৫টি আঙুলের মধ্যে কোন আঙুলের গ্রুপভুক্ত। এও খেয়াল করে না যে প্রতিটি আঙুলেই একটি করে শিখর বা শীর্ষস্থান আছে। হতাশাবাদী হয়ে নিজেকে সবচেয়ে খাটো আঙুলের গ্রুপে ফেললেও তিনি যদি প্রতিজ্ঞা নেন, এই আঙুলেরই শীর্ষে উঠবেন, তাহলে তিনি উঠতে পারবেন এবং অপেক্ষাকৃত ভালো থাকবেন। কারণ, এটাও কম নয়। সেটা করতেও তাকে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। কাজে ধ্যান, মন দিতে হবে। তবেই তিনি ছোট আঙুলের Top-এ উঠবেন অর্থাৎ সেখানকার প্রধান হবেন। ভাগ্যে থাকলে সেখান থেকে Shift করে তিনি পরবর্তী বড় আঙুলের গ্রুপেও যেতে পারেন। তাই নিষ্ক্রিয় হয়ে, হতাশা নিয়ে বসে থাকলে কেউ আঙুলের শীর্ষেও কখনও উঠতে পারবে না এবং নিজের পরিবেশ বা এলাকার মাথাও হতে পারবেন না। মাথা লেজের চেয়ে সব সময়ই মূল্যবান। হোক না সে পিঁপড়ার মাথা। তাই সততার সঙ্গে, নিঃস্বার্থ হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করলে যে কোনো পরিবেশে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। সম্মান জোর করে আদায় করা যায় না। ত্যাগ, বিনয় ও পারদর্শিতা থাকলে সম্মান এসে যায়। কাজ না করে, পরিমিত শ্রম না দিয়ে যদি হতাশ হয়ে শুধু দুশ্চিন্তা করা যায় তাতে কোনো লাভ হয় না। আবার মনে রাখতে বলি, Worring is the wasteful activities in Human Civilization.

২১. সন্তান বাবার চেয়ে বড় হবে

এমন কেউ কি আছেন যিনি নিজের অবস্থানের চেয়ে সন্তানদের অবস্থান আরও উঁচু এবং উন্নততর হোক এটা চান না বা এভাবে দেখার কথা ভাবেন না? এমনটি ভাবা খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। মোটেও অবান্তর নয়। কিন্তু যাদের মন-মানসিকতা পঙ্গু, যারা কাজ না করে ফাঁকি দেয়, জুয়াচুরি, বাটপারি করে তারা অবশেষে টিকে থাকে না, ওপরে উঠতে পারে না, ছিটকে পড়ে। এখন পিতা-মাতা হয়ে ওপরে উঠতে না পারলে পরে তাদের সন্তানরা কীভাবে ওপরে উঠবে, কাকে আদর্শ ভেবে অনুসরণ করবে তারা? কে তাদের সাহস জোগাবে, সহযোগিতা করবে কে তাদের ভরসা দেবে এবং কে দেবে তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার অভয় বা প্রেরণা? গ্রামের একজন মজুর তার অসহায়ত্বের কারণে অনেক সময় নিজের

ছেলেকে ভবিষ্যতে একজন মজুর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, অথচ আমি-আপনি নিজেদের চেয়ে আমাদের সন্তানদেরকে আরও ওপরে ওঠানোর কথা ভাবছি। তাই নিজে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করুন, সন্তানদেরকে বস্তু-সম্পদ দিয়ে নয়, শিক্ষার মতো অমূল্য সম্পদ দিয়ে তার নিজস্ব পরিচয়ে বড় হতে সহযোগিতা করুন এবং নিজের পরিচয়ে বাঁচতে এবং টিকে থাকতে দিন। যাতে মানুষ বলে, 'খ'-এর পিতা 'ক', 'ক'-এর ছেলে 'খ' নয়। এই মনোভাবে সন্তানদের গড়ে তুলুন।

২২. কাজে এবং পারিশ্রমিকে সমতা

পর্যাপ্ত কাজ করে সেই কাজের বিপরীতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য পারিশ্রমিকে সমতা আনতে হবে। এবার আরও একটি বাস্তব অবস্থার কথা বলি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কিছু মানুষ বেশি কাজ করে। আবার কিছু মানুষ কম কাজ করে। যারা বেশি করে তাদের ওপর কাজের চাপও বেশি পড়ে, তারা মাথা ওঠাতে সময় পায় না। আবার ওই একই প্রতিষ্ঠানে হয়তো তার পাশের লোক কাজ করে না, কম করে, গলাবাজি করে পরিবেশ নষ্ট করে। তাদের আচরণ বরং অন্যের কাজে বাধা দেয়, অথচ বেতন-ভাতা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা সবাই সমান পেয়ে থাকে। এতে করে সৎ এবং পরিশ্রমী কর্মীরা হতাশায় ভোগেন, কাজে আগ্রহ হারান। তাতে উৎপাদন কমে। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক, সবাই সব কাজে সমান পারদর্শী হয় না। এরূপ হলে কম পারদর্শী লোকদের অধিক সময় কাজ করে তার কাজের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়া উচিত। তা না হলে, ওই ব্যক্তির রুজি হালাল হবে না। কিন্তু সাধারণত তা কেউ করে না।

কাজে সমতা আনতে প্রথমে সবাইকে এই বাস্তব সত্যটাকে উপলব্ধিতে নিতে হবে। অর্থাৎ, সবাইকে পর্যাপ্ত কাজ করতে হবে। অপরদিকে অফিসের পক্ষ থেকেও ভালো কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অপেক্ষাকৃত কর্মবিমুখ কর্মকর্তাদেরকে কর্মমুখী করে গড়ে তুলতে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু প্রতিষ্ঠানের বা কার্যালয়ের প্রশাসনের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেও চলবে না। এ দায়িত্ব ছোট, বড় সবার। আবার যারা দক্ষ এবং বেশি কাজ করেন, অনেক জানেন, তারা স্বার্থপরের মতো অন্যকে কাজ শেখাতে চান না। তিনি একাই তার কর্মস্থলের মধ্যমণি হয়ে থাকতে চান। এটাও করা চলবে না। করতে দেয়া যাবে না। কর্মী বাহিনীর সবাইকে একে অপরের সঙ্গে দায়িত্ব Share করতে হবে। অর্থাৎ Top to Bottom-এর পরিবর্তে Bottom to Top অ্যাপ্রোচ প্রয়োগ করতে হবে। নিজের

আগ্রহে একে অপরের কাছ থেকে সমঝোতার মাধ্যমে পরস্পরের কাজ শিখে নিতে হবে। তাতে উভয়েরই মঙ্গল হবে, ব্যাংকেরও মঙ্গল হবে।

২৩. কর্মবিমুখদের প্রতিক্রিয়া

কিছু মানুষের কর্মবিমুখতার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানে যে সিস্টেম লসের সৃষ্টি হয়, তাদের ধারককে Disguised Inactive লোক বলা যায়। ওইসব অনীহ লোককে কাজ করার কথা বলতে গেলে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আপনাকে চার্জ করতে পারেন এই বলে যে, **আমি কি কাজ করি না?** তার ধারণা, তিনি সারাদিনই কাজ করেন, কখনও বসে থাকেন না, কাজ ছেড়ে উঠে যান না। তার মতে এবং দৃশ্যত এটা সঠিক হলেও বস্তুত নয়। এমন পরিস্থিতি হলে তাকে বলতে হবে, আপনার অবস্থানের একজন কর্মীর কতটুকু কাজ করা প্রয়োজন এবং আপনি কতটুকু করেন? একটা কাজে আপনার কতটুকু সময় লাগে এবং অন্যের কতটুকু সময় লাগে? এই হিসাব করলেই অন্যের তুলনায় আপনার কাজের আউটপুট আপনি নিজেই পরিমাপ করতে পারবেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার জবাবে তিনি হয়তো বলবেন, **আমি অন্যের মতো অত দক্ষ নই। আমাকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করবেন না। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না।** তখন তাকে বলতে হবে, তাই যদি মনে করেন তাহলে সমান বেতন হালাল করতে আপনাকে অন্যের চেয়ে বেশি সময় কাজ করে (প্রয়োজনে ছুটির পর বিনা পারিশ্রমিকে) আপনার কাজের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়া উচিত। কারণ সমান বেতন বা সুবিধা নিলে সমান কাজ করতেই হবে। এতে তিনি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে পারেন, **সেটা আপনার দেখার বিষয় নয়, প্রশাসনের বিষয়। এ বিষয়ে আপনি বলার কে?** তখন তাকে বলতে হবে, আপনার এ ধারণাও ভুল। কারণ, আপনাদের মতো অনীহ কর্মীদের অপরিমিত ও অপর্যাপ্ত কাজের কারণে প্রতিষ্ঠান আউটপুটের অপুষ্টিতে বা ঘাটতিতে ভুগছে, যা ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি কমাচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের আয় কমছে, যা আমাদের বোনাসের সংখ্যাকে দিন দিন কমিয়ে দিচ্ছে; আমারও কমছে। এটাই আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং সেই ক্ষতি রোধ করার প্রয়োজনটাই আপনাকে আমার পক্ষ থেকে বলার কারণ এবং এই বলাটা আমার মানবিক অধিকার। ব্যাংকের সম্মানীয় ও বিত্তশালী মালিকগণ কম ডিভিডেন্ড নিয়ে নীরব থাকতে পারেন, সরকারের ট্যাক্স-ক্ষতি তারা মানতে পারলেও আমার পক্ষে নিজের এই ব্যক্তিগত ক্ষতি মানা কষ্টকর। কারণ, আমার কষ্টের সংসারে আমার শ্রমের ন্যায্য মূল্য (বেতন-বোনাস) আমার কাছে অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বের এটা আদায় করা আমার অধিকার, তাই এটাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। এ কারণে আপনাকেও পর্যাপ্ত কাজ করতে হবে। অথবা

অধিক কর্মঠ লোককে দিয়ে এ কাজ করানোর সুযোগ দিতে হবে। তাকে আরও বোঝাতে হবে, আপনি পর্যাপ্ত কাজ না করাতে আপনারও ক্ষতি হচ্ছে। কারণ, আপনিও ৮টি বোনাস পাচ্ছেন না। তাই সবার লাভের জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত অকপটে এই যুক্তি মেনে নেয়া যে, সবাইকে পর্যাপ্ত কাজ করতে হবে। তবে ব্যাংক চাইলে মানবিক কারণে তার সীমিত সংখ্যক কাজে অসমর্থ্য এবং অনীহ লোকবলের জন্য একটা পৃথক ডিপার্টমেন্ট খুলে সিএসআর-এর আওতায় তাদেরকে নরমাল সুবিধাদির সাপোর্ট দিতে পারে। তাতেও কর্মঠ জনবলের কোনো আপত্তি থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস।

আমার মনে হয়, এভাবে সবাই মিলে বললে এবং যুক্তি দিয়ে বোঝালে সীমিত কর্ম-অনীহ লোকেরাও কর্মমুখী হতে পারে এবং তাতে আমাদের প্রতিষ্ঠান একটি কাজের মেলায় পরিণত হতে পারে। তাই সবাই স্ব-উদ্যোগে কাজ সংগ্রহ করব এবং তা সন্তোষজনকভাবে সম্পাদনও করব। আসুন, আমরা সবাই মিলে একপাতায় আসি। অর্থাৎ, All in one page। আমাদের মেধা ও মনন কাজে লাগিয়ে প্রশাসনিক খড়্গ নয়, অনুকম্পা দিয়ে, সহমর্মিতা দিয়ে আমরা আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনি এবং তার সুখ সবাই মিলেই উপভোগ করি।

২৪. কম কথা বেশি কাজ

পুনরায় বলি, আমরা চাকরি হারানোর অহেতুক ভয়ে ভীত থাকি। কাজের চেয়ে কথা বেশি বলে চাকরি ধরে রাখার ভ্রান্ত চেষ্টা করি। অর্থাৎ আংশিক কাজ করি আর বাকিটা লেকচার মেরে, পরচর্চা করে এবং ফলস্ ভ্যানিটি দেখিয়ে পুরা করি। তাই আসুন, কবির (জীবনানন্দ দাস-এর মাতা কুসুম কুমারী দাস) প্রত্যাশার মতো **আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে,** এই নিষ্ক্রিয় বা প্যাসিভ প্রত্যাশা নিয়েই বসে না থেকে নীরব ধ্বংসের অচল অবস্থাকে ভাঙি এবং সবাই ভালো থাকি। কথা কম বলি, কাজ বেশি করি। কথা ও কাজে সঙ্গতি রাখি। নিজেদের এখতিয়ারের মধ্যে চলে সমস্যার সমাধান করি, বিরূপ সমালোচনা পরিহার করি, মিথ্যা কানকথা না বলি, ঘরের কথা পরকে না বলি। মুখে তালা দিই। অপরদিকে, আমরা অগ্রজরাও সজাগ থাকি, যাতে চতুর অনুজরা আমাদের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আমরা Epistomology অনুসরণ করি। অর্থাৎ, How do you know, what you know? শুধু পড়ে বা শুনে বিশ্বাস না করে যাচাই করে বিশ্বাস করি।

২৫. প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবা

প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবতে পারলে কাজে মনোযোগ আসতে বাধ্য। তাই আসুন, সবাই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে আপন ভেবে নিজের কাজ মনযোগ দিয়ে করি। অফিসের বা অন্যের কাজ মনে করে 'যা হয় হোক আমার কী?'– উপেক্ষার এরূপ আত্মঘাতী মনোভাব পরিহার করি। এ ব্যাপারে আবার একটা বাস্তব ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। একবার এক পিয়ন বা মেসেঞ্জার তার বসকে বললেন, স্যার, কাল থেকে আপনার কেবিনের পর্দা ফাঁক করে রাখি? বস্ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? উত্তরে পিয়ন সাহেব বললেন, চেম্বারের বাইরে বসা অফিসাররা সকালে অফিস শুরু হওয়ার পরও কাজ শুরু না করে পেপার পড়ে, গল্প করে, চা-বিস্কুট খায়। এটা খোলা রাখলে সবাই লজ্জায় এবং ভয়ে অফিস টাইমে এসব করবে না। অফিস শুরুর আগেই এসে ওইসব কাজ সারবে। বস্ রাজি হলেন। পিয়নের পরামর্শ ম্যাজিকের মতো কাজ করল। সব ঠিক হয়ে গেল।

আবার একদিন ওই পিয়নই তার বসকে বললেন, স্যার, কাল থেকে ঠিক ৯টায় হাজিরা খাতাটা আপনার কাছে এনে রাখব (তখন অফিস শুরু হতো সকাল ৯টায়)। কেউ বিলম্ব করে অফিসে এলে ভেতরে এসে আপনার সামনে স্বাক্ষর করতে লজ্জা বা ভয় পাবে এবং তাতে দেরি করে অফিসে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এটাতেও বস্ রাজি হলেন এবং যথারীতি তার সুফলও পাওয়া গেল।

এই দুটি ঘটনাই বাস্তব। বস্ এবং তার অফিস ওই দুটি ঘটনারই উপকার পেল। বস্ যদি পিয়নকে অনুমতি না দিতেন এবং পক্ষান্তরে বলতেন, তুমি পিয়ন, পিয়নের মতো থাকো। এ কাজ তোমার নয়, প্রশাসনের। তাহলে কি ওই অর্জন সম্ভব হতো? না! কারণ, পিয়ন আহত হতেন, টুল নিয়ে বসের কেবিনের দরজার সামনে বসে থাকতেন। তার সামনে অফিসের কোনো ক্ষতি হয়ে গেলেও তিনি নড়তেন না। তখন তাকে চার্জ করা হলে তিনি সাফ জবাব দিতেন, এটা আমার কাজ নয়। বস্ বেল টিপে যখন যেটা হুকুম করবেন, সেটা শোনা বা করাই আমার কাজ, আমার দায়িত্ব।

এরই নাম অফিসকে আপন ভাবা, ভাবতে শেখানো (Sense of Belonging)। কেউ অফিসকে নিজের ভাবলে অফিসের একটি আলপিনেরও ক্ষতি তিনি হতে দেবেন না। ওই পিয়ন সাহেব অফিসকে নিজের ভেবে বসের তথা ব্যাংকের প্রশাসনের কাজে সহায়তা করে নিজে গর্বিত হলেন এবং অফিসেও তার গুরুত্ব এবং মূল্য বেড়ে গেল। বসের চার-চোখের ব্যবস্থাপনা (Four Eyes Concept of Management) [অর্থাৎ ২ চোখ তার নিজের এবং অবশিষ্ট ২ চোখ তার সহকর্মীদের ও পারিপার্শ্বিক লোকের।] সফল এবং সার্থকভাবে কাজ করল। অর্থাৎ এই Concept-এর প্রয়োগ অফিসে কায়েম হলো। বস্ গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়টি

অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করলে সবাই একদিকে সজাগ হবেন এবং অপরদিকে এরূপ বাহবা পেতে অনুপ্রাণিত হবেন। তাই সব সহকর্মীর উচিত একাত্ম হয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা। মনে রাখবেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ থেকে, উস্কানি দিয়ে, অসহযোগিতা করার মাধ্যমে অফিসের তথা নিজেদের ক্ষতি না করে সবাই একমত হয়ে চলতে পারলে ভবিষ্যতে কেউ কোনো অসুবিধায় পড়বেন না।

২৬. অপরিকল্পিত ব্যবসা ধ্বংসাত্মক

কোনো কাজের পূর্বপরিকল্পনা এবং কাজের প্রতি যথাযথ আত্মনিয়োগের অভাবে আমাদের দেশে কোনো কিছুরই ব্যালান্সড গ্রোথ হয় না। সবকিছুই এলোমেলোভাবে বেড়ে ওঠে। একের আচমকা উন্নতি দেখে অন্যেরা প্রলুব্ধ হয়, সেদিকেই দৌড়ায়, পতঙ্গের আগুনে পড়ার মতো। তখন ওইদিকে পাল্লা ভারী হয়। শেষে সেটা ভেঙে পড়ে এবং তার কুফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। কথাটা এজন্য বললাম যে, আমাদের দেশে কোনো কাজে একজন উন্নতি করলে তার ভালো-মন্দ, ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে সবাই সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওই কাজের চাহিদা নিরূপণ করছে না। এতে ওই সেক্টর Over saturated হয়ে যায়। এভাবেই সবাই মার খায়, খাচ্ছে। এ বিষয়টি ব্যক্তি পর্যায় থেকে প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন, গার্মেন্ট শিল্প। ৪৫০০-এর মধ্যে ১৫০০ চলে। অবশিষ্টগুলো চলে না। এভাবে সৃষ্ট অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যাংকই বেশি। কারণ, গার্মেন্ট ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ কম থাকে। যাহোক, যারা রাতারাতি বড় হওয়ার লোভনীয় দৌড়ে শামিল হয়, তারা তখন সংসারের দিকে, সন্তানদের দিকে নজর দিতে পারে না, শুধু টাকা আর টাকা, অর্থ আর অর্থ। তাতে তার পরিবার ধ্বংস হয়। অর্থাৎ **অর্থই অনর্থের মূল।** তাই সংযত হয়ে, সংযমী হয়ে, সামর্থ্যের মধ্যে চলাই উত্তম। আবার অপরদিকে দেখুন, পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত ঢাকা শহরের নগরায়ণ হওয়ার ফলে ডিআইটি এরিয়ার জনজীবনে অনেক ভোগান্তি হচ্ছে। লাশ বের হওয়ার রাস্তা না রেখেই বাড়ি করি সবাই। এতটুকু জায়গা ছাড়তে চাই না।

অতএব, পূর্বপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে ভালো থাকা যাবে।

এ প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয়, ব্যবসা বাড়ানোর আগে তার নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা আবশ্যক। তা না হলে ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই যা সামলানো যাবে না তা করব না, এই হোক আমাদের মন্ত্র।

-

পঞ্চম অধ্যায়

জীবন প্রবাহ

প্রথম অধ্যায়ের যাত্রার রেশ টেনে আবারও বলি জীবন ধারণের জন্য, জীবন যাপনের জন্য, জীবন ভোগের জন্য এবং জীবন ত্যাগের জন্য। তাই জীবনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. খাওয়ার উপকারিতা/অপকারিতা

খাদ্য জীবন ধারণের প্রধান উপাদান। শরীর গঠনে, শরীরে রক্ত সঞ্চালনে এবং শক্তি সঞ্চয়ে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাঁচতে হলে খেতে হবে। খাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে। এখন অধিক খাওয়ার অপকারিতা এবং পরিমিত খাওয়ার উপকারিতার ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। এ বিষয়টি সবারই জানা এবং তা মানা দরকার। মানলে খাওয়ার ক্ষতি এড়িয়ে শুধু তার উপকারিতা নিয়ে সুস্থ শরীরে জীবন উপভোগ করা সম্ভব হবে।

খেতে বসলে 'পেট ভরে তো মন ভরে না– অনেক খেতে ইচ্ছে হয়। বিশেষ করে ভালো খাবার হলে বা দাওয়াতে গেলে তো কথাই নেই। খেতে বসলে যে খাবারটা মুখে ভালো লাগে, সেটা অনেক বেশি খেয়ে বসি, পারলে নাক পর্যন্ত। প্লেটে খাবার উঠিয়ে নেয়ার সময় টেবিলের অন্যদের কথা ভাবি না; খেতে পারি বা না পারি, প্লেট উপচে খাবার নিই, জোর করে খাই। হয়তো এই মনে করে যে, কতদিন খাইনি, আবার কবে এমন খাবার পাওয়া যাবে। বেশি খেলে পেটের মধ্যে শুরু হয় খেলা। অর্থাৎ, এতে দু'ধরনের অসুবিধা হতে পারে।

১) পেটে গ্যাস, অ্যাসিড, বদহজম ইত্যাদি হতে পারে। বমি, ডায়রিয়া হতে পারে। তাতে তাৎক্ষণিক অস্বস্তি ছাড়াও শরীর ও মনের ক্ষতি হয়। আবার সব সময় সবার শরীরে সব ধরনের খাবার স্যুটও করে না। সে কারণে অল্প খাওয়াতে অপুষ্টিও হতে পারে। 'ভারটিগো' ব্যাধি (গা-মাথা ঘোরা) হতে পারে।

২) যাদের হজম শক্তি ভালো, তারা যা খায়, যত খায়, সহজে হজম হয়ে যায়। খাওয়ার পর তারা কোনো অস্বস্তিতে ভোগে না, বরং খাওয়া উপভোগ

করে। এ ধরনের লোকের সংখ্যা বিরল হলেও বিরান নয়। খাবার হজম হলেই যে কোনো অসুবিধা হবে না, এটা ঠিক নয়। তাতে কী কী সুপ্ত অসুবিধা হতে পারে, তা একবার দেখুন।

বেশি খেলে দেহ বাড়ে, দেহের মেদ-ভুঁড়ি বাড়ে, ওজন বাড়ে, রক্তে কোলেস্টেরেল বাড়ে, হৃৎপিণ্ড এবং ধমনী ও শিরায় চর্বি জমে, সংকট সৃষ্টি করে। বাইপাস করতে হয় বা স্ট্রেইন লাগাতে হয়। অনেক সময় হাই প্রেশারে স্ট্রোক হয়ে পক্ষাঘাত ঘটে। ফলে জরুরি চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর। মধ্যবিত্ত লোক হলে সর্বস্ব খোয়ায়ে পথে বসে। আবার নিম্নমধ্যবিত্ত বা দরিদ্র হলে সামর্থ্যের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না। পরিবারকে পথে বসিয়ে হয়তো অকালে অক্কা পায়। ফলে তার পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। তখন ওই ভেঙে যাওয়া পরিবারের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয় না বা তারা মানুষ হতে পারে না এবং ওই ভগ্ন পরিবার আর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিতও করতে পারে না।

এ তো গেল শুধু হার্ট অ্যাটাকের কথা। এছাড়া আরও অনেক রোগ-ব্যাধি আছে, যেমন ক্যান্সার। যেটা অধিক মারাত্মক এবং বিলম্ব হলে চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। তাই দেখা যাচ্ছে, বেশি খেলে বা বেহিসাবি খেলেই বিপত্তি। এটা অনিয়ম এবং অনিয়মের ফল তো খারাপ হবেই, সেটা শরীরের বেলায়ই হোক আর চাকরি, ব্যবসা বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। তাই আসুন, আমরা পরিমিত খাই, সুষম খাদ্য খাই, অখাদ্য-কুখাদ্য, পচা-বাসি বা যে খাবার সহ্য হয় না, তা না খাই, অতিরিক্তও না খাই এবং নিয়ম মেনে চলি। এভাবে শরীরকে ভালো রাখি। শরীর ভালো থাকলে মন ভালো থাকবে, মন ভালো থাকলে কাজে মন বসবে, তাতে কাজ ভালো হবে। মন দিয়ে, শ্রম দিয়ে, সততার সঙ্গে কাজ করলে অবশ্যই আমার ভালো হবে। আমার প্রতিষ্ঠানেরও।

২. অনিয়ম অঘটন ঘটায়

অনিয়ম যে কোনো ব্যাপারে যে কোনো সময়ে অঘটন ঘটাতে পারে। শারীরিক বা মানসিক প্রক্রিয়ায় অনিয়ম করলে কী অঘটন ঘটতে পারে তার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি। উপমাটা এমন - একবার এক ছাত্রের হঠাৎ জ্বর হওয়ার কারণে সে সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে পারল না। ছেলেটি ক্লাসের সেরা ছাত্র। ওই সেমিস্টারের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি তার ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এই চিন্তায় ছেলেটির বাবা-মা প্রধান শিক্ষকের কাছে গেলেন। তার জন্য ওই পরীক্ষাটি আলাদা করে নেয়ার বিশেষ অনুরোধ জানালেন তার কাছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক রাজি হলেন না। তিনি যুক্তি দেখালেন, তার একার জন্য

পৃথকভাবে পরীক্ষা নেয়া হলে এবং সে পরীক্ষায় ভালো করলে, স্কুলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে এই বলে যে, তার প্রশ্ন সহজ করা হয়েছে। ছেলেটির বাবা-মা প্রধান শিক্ষককে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলেন। আরও বললেন, ছেলে তো ইচ্ছা করে পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকেনি, তার অসুস্থতার কারণে সে পরীক্ষা মিস্ করেছে। এতে তার দোষ কোথায়? প্রত্যুত্তরে প্রধান শিক্ষক প্রতিবাদী সুরে জবাব দিলেন, সে নিশ্চয়ই কোনো অনিয়ম করেছে। তা না হলে তার জ্বর হলো কেন, হবে কেন? তিনি আরও বললেন, 'বিগত ৩০ বছর আমার তো কখনও জ্বর বা অসুখ-বিসুখ হয়নি।' কারণ, আমি নিয়ম মেনে চলি। কখনও অনিয়ম করি না। শিক্ষকের সেই কথা, অভিভাবকদের তখন মনঃপূত হলো না, তারা দুঃখ পেলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তারা বুঝতে পারলেন, শিক্ষকের কথায় একটি মেসেজ আছে এই যে, যারা শরীরের ওপর অত্যাচার করে, অনিয়ম করে চলে, তারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির করুণ শিকারে পরিণত হয়। অপরদিকে, কাজকর্মে অনিয়ম করলে প্রতিষ্ঠানের বা সংসারের ক্ষতি হয় এবং তার খেসারত সবাইকে দিতে হয়। যাকে প্রবাদের শিক্ষণীয় সুরে বলা যায়, **কাজ করে বেহুদ্দা, মার খায় গুষ্টিসুদ্ধা।** তাই, অনিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।

৩. নিজে শিখুন অন্যকে শেখান

শেখার বিকল্প নেই; একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মানি ক'জন? আবার শেখার নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, শেখার ক্ষেত্র সম্পর্কেও আমাদের ধারণা ততটা স্বচ্ছ নয়। তাই এসবের ওপর আলোকপাত করার জন্যই এই বয়ানের সুযোগ নেয়া হলো। শেখার পদ্ধতি অনেক। শুনে শেখা, দেখে শেখা, পড়ে শেখা, লিখে শেখা করে শেখা ইত্যাদি। শুধু শিখলেই হবে না, শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে হবে অর্থাৎ নিজে শিখতে হবে এবং সে মোতাবেক হাতেনাতে করে দেখিয়ে অন্যকে শেখাতে হবে। এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং লাভ আছে, বহুমুখী লাভ। শেখার সময় সারা জীবন - দোলনা হতে কবর পর্যন্ত। শিক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেক এবং আবেগের। মানুষের মনের মধ্যে এ দুটো অভিব্যক্তির সফল সমন্বয় না ঘটলে শিক্ষা প্রদানের সৎ প্রচেষ্টা শিক্ষা গ্রহণের নির্বোধ অনীহার কাছে মার খেয়ে যাবে। তাই শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি এবং প্রয়াস সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উৎসাহব্যঞ্জক হতে হবে। তা না হলে শেখানোর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। অপরদিকে, শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ এবং চাহিদা যথেষ্ট না থাকলে কোনো সফল এমনকি সহজতর শিক্ষা প্রদান প্রচেষ্টাও কার্যকর হবে না। একটা উপমা দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একদিন MBTI-এর কোনো একটি ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বলা হলো, কোর্সের ওপর যে রুটিন বই দেয়া হয়েছে তার ১ থেকে ৩ পৃষ্ঠায় ট্রেনিংয়ের এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কিছু নিয়মাবলি এবং ব্যাংক সম্পর্কে কিছু চুম্বক তথ্য দেয়া আছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সবারই এগুলো জানা দরকার। কারণ, কোনো মানুষই সবকিছু জানে না, জানা সম্ভবও নয়। এই না জানাটা অপরাধ নয়। কারণ, মানুষ জেনে জন্মায় না, জন্মে জানে। জানতে ধ্যান দিতে হয়, মন দিতে হয় এবং শ্রম দিয়ে চেষ্টা করতে হয়। মনোযোগ দিতে, শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি লাগে। যাকে বলে Devotion. তাই তো নামাজ আদায়ের আগে অজু করা বা বিশেষ ক্ষেত্রে তাইমুম করা আবশ্যক। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, অজু কেন করা হয়, সবাই অভিন্ন সুরে ও ভাষায় জবাব দেবেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, বাহ্যত এটা ঠিক। তবে অজু বা তাইমুম করার আর একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। সেটা হলো, মনোযোগ দিয়ে ধ্যান করতে এবং একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করতে মনকে প্রস্তুত করা। অর্থাৎ নিজের মনকে স্থির করার জন্যই অজু করা আবশ্যক। অজু করার পর প্রশ্ন আসে, কী ধ্যান করবে এবং কীভাবে ধ্যান করবে? এটাই শিক্ষা এবং তা শেখা দরকার। যাহোক, ওই সমাবেশে পরিষ্কার করে বলা হলো, ট্রেনিংয়ের রুটিন বইয়ে ট্রেনিং সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে, ট্রেনিংয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এবং ট্রেনিংয়ে আত্মনিয়োগ করতে। আরও বলা হলো, ট্রেনিংয়ের জন্য প্রণীত অনুশাসন মেনে চললে সবাই ট্রেনিংয়ের পরিবেশ বুঝবে এবং ট্রেনিংয়ের জন্য উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতসব করার পরও দেখা গেল, ওই বই কেউ পড়েনি। পড়লেও পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়নি। তাই তাদের অনেকে ট্রেনিং ক্লাসে বা অঙ্গনে বসে উচ্চস্বরে ফোনে বা সরাসরি অন্যের সঙ্গে বা সামনে কথা বলেন, ক্লাস ছেড়ে ফোন ধরতে বাইরে যান, মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে না রেখে রিংটোন বাজিয়ে পাশে বসা সহপ্রশিক্ষণার্থীকে বিরক্ত করেন বা তার মনোযোগ নষ্ট করেন। আরও কত কী! এমন আচরণের কারণই হচ্ছে বইয়ে দেয়া ঐসব অনুশাসন না দেখা এবং দেখলেও গুরুত্ব না দেয়া। তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, যে কাজে যখন থাকব, সে কাজ তখন মনোযোগ দিয়ে করব, ভালোভাবে করব, পরিপাটি করে করব। এটাই ব্রত হওয়া উচিত। এটাই সবার প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। তাহলেই তা হবে সাধনা এবং এমন সাধনা মন দিয়ে করা হলে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ অনিবার্য এবং তার উপকারিতা মানুষ, সমাজ ও দেশ পেতে বাধ্য। একেই বলে শিক্ষা, শেখা এবং শেখানো। স্বচ্ছ ও সুন্দর জীবনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই।

৪. শিক্ষা বনাম শিক্ষাগুরু

ছেলেবেলায় দেখেছি, অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে নিয়ে গেলে প্রথম দিনই শিক্ষককে বলে দিতেন, 'মাস্টার মশাই, এটা আমার ছেলে, এর হাড় ক'খানা আমার আর মাংসটা আপনার। ছেলেকে মানুষ করে দেবেন।' শিক্ষকরাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। দায়িত্বের সঙ্গে তারা ছেলেমেয়েদের শাসন করে, সোহাগ করে মানুষ করে তুলতেন। ছেলেমেয়েরাও ওস্তাদজিকে যথেষ্ট ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করত। ব্যতিক্রম হিসেবে, দু'চার জন ভুল পথে চললে তারা তার কুফল থেকে রেহাই পেত না। অর্থাৎ তারা লেখাপড়ায় এগোতে পারত না। আমার নিজের চোখে দেখা, একটা ঘটনা বলি :

গ্রামের স্কুলে আমার প্রথম শ্রেণীর এক সহপাঠী (যার পিতা ওই সময়ে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন) পড়ালেখা ঠিকমতো করত না। একবার পড়া না পারায় শিক্ষক তাকে কানমলা দিলেন। ওই ছাত্র কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে যেতেই তার কয়েকটা ভাই মারমুখী হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে স্কুলে এসে তারই সামনে শিক্ষককে যারপরনাই গালাগালি ও অপমান করল। শুধু হাতে মারা বাকি ছিল। এতে শিক্ষক অনেক কষ্ট পেলেন মনে। ওই শিক্ষকের মুখের দিকে তখন তাকানো যাচ্ছিল না। অপমানে এবং ক্ষোভে তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে সময় গড়াল। দেখা গেল, সেই ছেলে আর লেখাপড়ায় এগোতে পারেনি। তার বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা পৃথক হয়ে গেলে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হলো। সে তার অংশের জমিজমা বিক্রি করে খেয়ে ফেলে সর্বস্বান্ত হলো। শেষে ঠেলাগাড়ি চালিয়ে, দিনমজুরি করে, অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করতে লাগল। তার ছেলেমেয়ে মানুষ হওয়া তো দূরের কথা, খেয়ে-পরে তাদের বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠল।

বর্তমান জামানায় শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ পাল্টেছে। সেখানে ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলো প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। শিক্ষকদের আচরণ এবং দায়িত্ববোধেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে লেখাপড়ার গুণগত মান কমেছে। শুধু সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে শিক্ষার হার। এর কুফলও এই জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে, হবে। দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা উন্নয়ন যা-ই হোক না কেন, শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষা গ্রহণের প্রথায় পরিবর্তন এবং শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়ন প্রয়োজন। অতীতে সামর্থ্যবান অশিক্ষিত লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া করাতে ততটা আগ্রহী ছিল না। কালের বিবর্তনে মানুষ এখন অনেক আগ্রহী হয়েছে। বুঝতে শিখেছে, শিক্ষাই নিজের এবং জাতির মেরুদণ্ড। তাই তো দেশে শিক্ষিতের হার বেড়ে প্রায় ৪৬ শতাংশে উঠেছে। তবে শিক্ষার গুণগত মানের অবনতির কারণে

আমাদের ছেলেমেয়ে তথা শিক্ষিতরা মার খাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনের চৌকাঠ মাড়ালেই এবং সার্টিফিকেট পেলেই তারা চাকরি ছাড়া অন্য কাজ করতে অসম্মান বোধ করছে। তারা কলমে কাজ করতে চায়। কিন্তু সে কাজও পায় না বেকারত্বের কারণে। যারা পায় তারা আবার সেই কাজ ভালোভাবে করতে পারে না তাদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার কারণে। এখন তো সুবিধা বেড়েছে অনেক। ডিজিটালের এই জামানায়, ওই সব দুর্বল শিক্ষিত বেকার যুবকদের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটানো দরকার এবং তা করা গেলে তারা কাজের বাছ-বিচার করবে না, কাজে ছোট-বড় ভাববে না। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পৈত্রিক কাজকে তাদের বিদ্যার উন্নত কৌশল দিয়ে আরও বেশি এগিয়ে নিতে পারবে। সোনার বাংলা আরও সমৃদ্ধ হবে। তাই আমাদের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অগ্রজদের দ্বারা গঠিত সুশীল সমাজের এবং সরকারের উচিত মোটিভেশনের দিকে নজর দেয়া এবং যে কোনো মূল্যে এই উদীয়মান যুবসমাজকে প্রকৃত কর্মমুখী করা, শুধু চাকরিমুখী নয়। এমন হলে আমরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ম্যানুয়াল-পদ্ধতির কারণে যে কাজ পর্যাপ্ত পরিমাণে করতে পারিনি বা করতে পারলাম না, তা করতে পারব সহজে। তাই সবাইকে মনোযোগ দিয়ে কাজ শিখতে হবে এবং ভালোভাবে কাজ করতে হবে। শুধু পণ্যের চটকদার লেভেলের মতো সার্টিফিকেট নিয়ে যোগ্যতার বড়াই করে বেকার হয়ে অভিভাবকদের ঘাড়ে বসে খাওয়া চলবে না। কাজে যোগ্য হয়ে তা সম্পাদন করতে হবে যথাযথভাবে। এরূপ উন্নয়ন ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে দেশে। তবে গতি ধীর। টেলিভিশনে দেখা যায়, গ্রামের শিক্ষিত যুবক আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি ইত্যাদির আবাদ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তবে এর প্রসার দরকার।

৫. আত্মপ্রবঞ্চনা মানুষকে অপ্রকৃতিস্থ বানায়

অনেক মানুষের এরূপ মানসিকতা আছে যে, নিজের অবস্থা দীন হলেও তা ঢেকে রাখতে উঠেপড়ে লাগে এবং ঢাকতে গিয়ে ঢং করে সং সাজে। কান্না চেপে হাসির অভিনয় করে। নিজে যা নয় তার চেয়ে বেশি শো-আপ করে, অর্থাৎ বড় হওয়ার ভণিতা করে। এটা আত্মপ্রবঞ্চনা। এরূপ, প্রতারণা বা ভণ্ডামি করা ঠিক নয়। কোনো মানুষেরই এরূপ মিথ্যা অহমিকা বা মানসিকতা থাকা উচিত নয়। মিথ্যা শো-আপ করে ধরা পড়লে ধরাশায়ী হতে হয়। তখন মুখ থাকে কোথায়? এ ব্যাপারে একটা হাস্যকর উপমা দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাবে। যেমন, একবার এক অধস্তন তার বসকে একটি সত্য কাহিনী শুনিয়েছিলেন। ওই অধস্তন বেশ মজা করে বসকে বললেন, আমাদের এক বাল্যবন্ধু গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিল চাকরি করার জন্য। বছর খানেক পর সে গ্রামে বেড়াতে গেল, চকমকে বেশভূষা ও সাজগোজ করে (চোখে গগলস, পরনে জিন্‌সের প্যান্ট, পায়ে মডার্ন

কেডস্ ইত্যাদি)। আমাদের সবার সঙ্গে যখন তার দেখা হলো, আমরা প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। না পারারই কথা। পরে তার গলার স্বর শুনে বুঝলাম এবং তাকে চিনলাম। সবাইকে মুড দেখিয়ে সে বলল, এই তোরা কেমন আছিস? আমি খুব ভালো আছি। ঢাকায় থাকি, চাকরি করি, ভালো-মন্দ পেট পুরে খাই। সিনেমা দেখি, ফুর্তি করি, আরও কত কী! আমরা তার মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম আর অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম তার দাম্ভিক সফলতার ধারাবাহিক কাহিনী। আমার মনে হলো, আহা! আমি যদি এ রকম একটা চাকরি করতে পারতাম! তাহলে ঢাকায় থাকতাম, সিনেমা দেখতাম, বেড়াতাম, আরও কত মজা করতাম! গ্রামীণ জীবনের এই অসহায়ত্বের জ্বালা আর সইতে হতো না। মা গালি দেয়। বড় ভাইয়ের সংসারে থাকি, ভাবি ভালো চোখে দেখে না, ঠ্যাসমারা কথা বলে, ভাই আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা কয় না। সবার মুখে একই কথা, বুড়ো ধাড়ি, কাজ করতে পারিস না? কী কাজ করব, লেখাপড়াও তেমন জানি না। তখন নিজের ওপর ধিক্কার আসে। ভাবলাম আমার ওই বন্ধু কত বড় ভাগ্যবান; তাকে এসব পোহাতে হয় না।

যাহোক, রাতে ওই বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় তক্তপোষের ওপর শুলাম। তখন বেশ রাত। ক'টা বাজে জানি না। আমার হাতে ঘড়ি ছিল না। তার হাতে ছিল। কিন্তু তখন রাতের অন্ধকার। আলো থাকলেই বা কী হতো? আমি তো আবার ঘড়ি দেখতেও জানি না। হয়তো কিসের একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। পরে বুঝলাম, আমার ঢাকাপ্রবাসী বন্ধু ভুল বকছে। ঘুমের ঘোরে কথা বলছে। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলাম এবং বুঝলাম। সে বলছে, চানাচুর... চানাচুর... চানাচুর র্... র্... র্... । তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, এই বেটা চাপা মেরেছে, ধাপ্পা দিয়েছে আমাদেরকে। সে ঢাকায় চাকরি করে না, চানাচুর বেচে। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই ঢাকায় কী করিস্, সত্যি করে বল তো? সে আবার বলল, ক্যান্, চাকরি করি। তখন প্রতিবাদের সুরে বললাম, চাপা মারিস নে। আমি সব জেনে গেছি। তুই রাতে ঘুমের মধ্যে যে কথা বলেছিস, তাতে তোর সব গোমর ফাঁস হয়ে গেছে। তুই ঢাকায় চাকরি করিসনে, চানাচুর বেচিস। তখন সে বেলুনের মতো চুপসে গেল। পরে সব স্বীকার করল। দেখলাম তার মুখটা ছোট হয়ে গেছে। সে চালবাজি না করলে এমনটা হতো না।

এই ঘটনা পরিষ্কার বলে দেয়, অনেক মানুষ অনেক সময় চাপাবাজি করে। যা নয়, তার চেয়েও বেশি Show-up করে নিজেকে দেখায়, দেখাতে মজা পায়। লোক দেখানো অহংকার এবং বাহাদুরি করে বড় হওয়ার ভাব ধরে আনন্দ পেতে চায়, অহেতুক সম্মানের অহমিকা করে, গর্ব বোধ করে। কিন্তু এই মিথ্যা সম্মান কি টেকে? এরূপ করা ঠিক না। আগে বলেছি, আবারও বলি, কোনো কাজ ছোট

নয়। হোক না সে চানাচুর বিক্রি করা। সৎ কাজ সব সময়ই ভালো। অসৎ কাজ করা, মিথ্যা কথা বলা, মানুষকে ঠকানো বরং খারাপ কাজ। মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা– এটাও খারাপ। আমাদের এই কু-অভ্যাস পরিহার করা উচিত।

৬. কারও চাপে নয় নিজ তাগিদে কাজ করা

কোনো বিষয়ে নিজে বুঝে, জেনে এবং তা বিশ্বাস করে সেই কাজ করা উচিত। অন্যের চাপে বা তাগিদে কাজ করা উচিত নয়। অর্থাৎ, I shall not do what I don't believe. চাপে কাজ করার আগে চাপ সম্পর্কে জেনে নেওয়া ভালো, অর্থাৎ, চাপের প্রকারভেদ, ধরন সম্পর্কে জানা থাকলে তা Handle করা সহজ হবে। চাপকে সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

ক) ক্ষমতার চাপ বা Power Pressure

খ) নৈতিক চাপ বা Moral Pressure

গ) আর্থিক অনটন, কিংবা লোভের চাপ বা Financial Pressure

এই তিনটি চাপ এক এক করে নিচে আলোচনা করা হলো, যাতে সবার সজাগতা বাড়ে। আশা করি, পাঠকগণ বুঝবেন এবং সে মোতাবেক কাজ করবেন, তাতে সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না।

(ক) ক্ষমতার চাপ বা Power Pressure

বলে রাখা ভালো, নিয়ম-কানুন মেনে সৎভাবে সঠিক কাজ করলে কোনো চাপই মানুষের ওপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, অন্যায় কাজেই শুধু চাপের প্রশ্ন ওঠে। কারণ সেটা একতরফা।

এবার ক্ষমতার চাপের ব্যাখ্যায় আসি। ক্ষমতার চাপ বলতে কী বুঝায়? চাকরির অঙ্গনে অনৈতিক বা নিয়মবর্হির্ভূত কাজ করার জন্য ঊর্ধ্বতনের নির্দেশ অধস্তনের কাছে ক্ষমতার চাপ বা Power Pressure. আবার পারিবারিক পরিমণ্ডলে উপার্জনকারী অভিভাবকের কথা উপার্জনভোগী সদস্যদের কাছেও ক্ষমতার চাপ বা Power Pressure. কারণ, দফতরে ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশ না শুনলে এবং সংসারে পরিবার-প্রধানের কথা না মানলে অধস্তনদের বা নির্ভরশীল সদস্যদের অফিসে বা সংসারে টিকে থাকা কঠিন হতে পারে। এর আরও বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আশা করি, পাঠকরা বিষয়টি সহজে বুঝবেন।

তবে Power Pressure বা ক্ষমতার চাপ হচ্ছে অনৈতিক চাপ। এরূপ অনৈতিক চাপ অধস্তনদের ওপর প্রয়োগের আগে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই মাত্রাজ্ঞানের

বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কারণ, কর্তৃপক্ষের আবেগ তার বিবেককে পরাভূত করলে, তখন তার ক্ষমতার স্বার্থপর নির্দেশ বা চাপ সার্বজনীন কল্যাণকর হবে না। এরূপ চাপের পরিবেশে অধস্তনদের ধৈর্য ধরতে হবে। Time is the great healer. অন্য সহকর্মীদের আস্থায় নিয়ে উপরোক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। যেমন All in one Page. Team-এর কেউ দলছুট হয়ে মোনাফেকি করলে হবে না। অধস্তনদের উচিত হবে, বিতণ্ডা করে নয়, কৌশলে সময় ও সুযোগ বুঝে ঊর্ধ্বতন বা অগ্রজের ভুল সম্পর্কে তাকে জানিয়ে বা বুঝিয়ে দেয়া। নেতা সেজে বিশেষ সুবিধা নেয়ার জন্য বস বা ঊর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে অশুভ তৎপরতা দেখানো যাবে না। এরূপ করা হলে তা সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিপরীতে যাবে। অগ্রজ সম্পর্কে বিরূপ কথা বলার মাধ্যমে কাউকে প্রকাশ্য বা সুপ্ত উস্কানি দেয়া বা বসের বিরুদ্ধে জটলা বা মৌন বিরোধিতা করা যাবে না। বস বা গুরুজনদের সঙ্গে বেয়াদবি করা বা তাদের প্রতি নেতিবাচক উত্তেজনা দেখানো যাবে না। অশিক্ষা বা কম শিক্ষার কারণে, সমাজে Power Pressure থাকবে, তবে তাকে কৌশলে Handle করতে হবে।

(খ) নৈতিক চাপ বা Moral Pressure

এটা এমন একটা চাপ, যা মানুষের নৈতিকতার ওপর মনের প্রভাব ফেলে। যেসব মানুষ অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা বা আনুকূল্য নিয়ে বেড়ে উঠে বড় হয় বা অন্যের অনুকম্পায় জীবন ভিক্ষা পায় বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়; তারা স্বভাবতই অবচেতন মনে হলেও ওই মানুষের প্রতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকে। জীবনে বড় হলে বা প্রতিষ্ঠা পেলেও তারা ওই সাহায্যের কথা ভুলতে পারে না তার মনুষ্যত্ব তাকে ভুলতে দেয় না। এই পরিস্থিতিতে যদি কখনও উল্লেখিত সাহায্যকারী ব্যক্তি বা তার পরিবার, তাকে কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করে এবং সেই কাজটি যদি তার দায়িত্ব, ক্ষমতা বা সুযোগের আওতার মধ্যে থাকে, তাহলে তা অনিয়মিত হলেও তখন তিনি কাজটি না করে দিলে নিদারুণ অস্বস্তি ও মানসিক অশান্তিতে ভোগেন বা ভুগতে পারেন। বিচলিত হয়ে পড়েন বা পড়তে পারেন, মানবিক মূল্যবোধের দুর্বলতার কারণে অথবা অস্ফুট বা চাপা দায়বদ্ধতার চাপে। এই চাপকে উপেক্ষা করা বা ওই ব্যক্তিকে না বলা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়, হতে পারে। এরূপ চাপ বিরল নয়। আমাদের সমাজে কেউ কেউ হয়তো পিতা-মাতার অবর্তমানে বা তাদের অসামর্থ্যের কারণে অন্যের সহযোগিতা নিয়ে বড় হয়ে থাকেন। তারা এমন চাপ এড়াতে পারেন না, চাপকে উপেক্ষাও করতে পারেন না, বরং কাজটি করে দিয়ে নিজের জীবন-ঋণের দায়

শোধ করার মাধ্যমে তৃপ্তি পেতে চান। স্বস্তি অনুভব করতে চান। ভালো মানুষের মনে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক।

আলোচিত বিষয়টি, অর্থাৎ Moral Pressure, শুধু দাফতরিক কাজ করে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেমন, বলা যায়, কোনো গরিব মেধাবী ছাত্র বিত্তশালী কোনো ব্যক্তির আনুকূল্যে বড় বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ পেলে সেই অবস্থায় তাদের অনুকম্পার বিনিময়ে তাদের অশিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত অসুন্দর মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে তখন সাহায্যাকাঙ্ক্ষী বা সাহায্যভোগী ব্যক্তি না বলতে পারেন না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও ওই মেয়েকে বিয়ে করতেই হয়। সেই মেয়েটি তার উপযোগী জীবনসঙ্গী হতে পারবে কি পারবে না সে ভাবনা ওই সময় তার মাথায় এলেও তা তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না বা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ওই চাপে সম্মত হওয়ার সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া তার কাছে ওই সময় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। একেই বলে Moral Pressure বা নৈতিক চাপ। এ ধরনের চাপ এড়িয়ে চলা যে কত কঠিন, তা ভুক্তভোগীরাই বোঝেন। এ ব্যাপারে সরকারি বড় চাকুরে হলে কথিত দাবির মুখে চাকরি দেয়ার মাধ্যমে অথবা ব্যাংকার হলে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে, পরিশোধ্য প্রতিদানের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে, মানুষের জীবনে বহুবিধ সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে কথিত ঘটনা ঘটতেই পারে, অহরহ ঘটছে। তাই বলে এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। কেউ কেউ আবার নিজের দুঃসময়ে অন্যের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে তার প্রতিদান না দিয়ে চোখ উল্টিয়ে ফেলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন। নিজের সুদিনে তিনি তার দুর্দিনের উপকারকারীকে চিনতেই পারেন না, দেখেও না দেখার ভান করেন, পাছে তিনি ছোট হয়ে যান এই ভেবে। কারণ, তখন দফতরে, প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজে তার অবস্থানের সঙ্গে ওই সাহায্যকারীর অবস্থার বিস্তর ব্যবধান হয়ে যায়। সমাজে এমন উদাহরণ খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। তবে এটা মোনাফেকি, বেইমানি এবং অনুচিত কাজ। এতে মানুষের মনের নিচুতা প্রকাশ পায়, তাদের চরিত্রের কদর্য রূপ বের হয়ে আসে। অপরদিকে, অনেক উপকার করা মানুষ স্বার্থপরের মতো তার দানের প্রতিদান চান, রেখে ঢেকে নয়, জোরেশোরে চাপ দেন। এটাও ঠিক নয়। কারণ, একটি মানুষকে উপকার করে তার ঘাড়ে চেপে বসে বিনিময়ে সুযোগ নেয়া; তাকে বেকায়দায় ফেলা মানবতা হতে পারে না। দুনিয়া দু'দিনের, জীবন আরও সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের সুখ আরও ক্ষণস্থায়ী। তাই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কারও মনে আঘাত দেয়া, কারও ন্যায্য অধিকার প্রত্যাশা বা পাওনার অমর্যাদা করা অনুচিত, অমানবিক। দেনা অপরিশোধিত রাখাও উচিত নয়।

আবার দান করলে প্রতিদান চাওয়াও উচিত নয়। আমাদের সমাজে এটা বহুল প্রচলিত যে, একজন কিছু দিলে তার বিপরীতে কিছু দিতে হয়। আমার মতে, এমন প্রথা না থাকাই ভালো। শুধু ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করা ভালো। তাহলে চাপের পাপ হবে না।

(গ) আর্থিক চাপ বা Financial Pressure

এই চাপ অর্থাৎ আর্থিক অনটনের চাপ, অভাবের চাপ নির্মম, নিষ্ঠুর; কিন্তু নিষ্পাপ নয়। একে গোপন করেও রাখা যায় না। এটা সবাই বোঝে, সবাই জানে। কেউ আর্থিক অনটনে থাকলে বাইরে থেকে তা কিছুটা হলেও বোঝা যায়, অনুমানও করা যায় সহজে। আবার অর্থের অভাবের পাশাপাশি তার লাভের লোভের চাপও কম যায় না। আর্থিক অনটনের সঙ্গে লোভের চাপ একত্র হয়ে মানুষকে অমানুষ বানাতে পারে, দুর্নীতিবাজ বানাতে পারে, হিংস্র বানাতে পারে, যা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক হয়, তার জন্য ও তার পরিবারের জন্য। একটা উদাহরণ দিলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, ধরে নেয়া যাক, একটা অফিসের বা প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা, যার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক অসচ্ছলতা আছে অর্থাৎ তার বৈধ আয় সংসারের দায় মেটাতে পারছে না; যা তার জীবনকে দুর্বিষহ করে রেখেছে। অপরদিকে, তার হাতে প্রশাসনিক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক লেনদেনের অঢেল ক্ষমতা বা ঋণ অনুমোদন দেয়ার বৈধ ক্ষমতা এবং সুযোগও আছে এবং সেখান থেকে অবৈধ আয় করারও বিস্তর সুবিধা রয়েছে। অফিসের নিয়ম অনুযায়ী তাকে অবশ্যই রিপু দমন করে নিয়ন্ত্রণে রেখে সততার সঙ্গে ওই আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। ধরে নেয়া হয়, ঐরূপ দায়িত্বশীল ব্যক্তি অর্থাৎ যাকে এরূপ দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দেয়া হয়, তিনি স্বভাবত সৎ এবং নীতিবান। তাই তিনি নীতিতে অটল থেকে এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে চলেছেন।

অপরদিকে, তার সংসারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে তার সামর্থ্য অপ্রতুল। অর্থাৎ তিনি অসমর্থ। তার বৈধ আয় পর্যাপ্ত নয় সংসারের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে। তাই তিনি অনেক কষ্টে আছেন। মানসিক চাপের কষ্টে। সকালে উঠেই তিনি জানলেন, চাল কিনতে হবে, বাচ্চার দুধ নেই, শয্যাশায়ী মায়ের জরুরি ওষুধ শেষ হয়ে গেছে, আনতে হবে, ছেলের স্কুলের ফি জমা দিতে হবে আজই, স্ত্রীর পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আর দেরি করা যাবে না। ইলেকট্রিক, গ্যাস, ফোন ইত্যাদি বিল দিতে হবে। প্রতিদিন এরূপ নানাবিধ চাহিদা। আগেই বলেছি, তার আয়রোজগার সংসারের সব অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত নয়। অথচ অফিসে তার হাতে অবৈধ রোজগারের অঢেল ক্ষমতা ও সুযোগ আছে। কন্ট্রাক্টররা ঘুষ সাধছেন; অফিস সামগ্রী ক্রয়ের সময় বিক্রেতারা কমিশন সাধছেন, ব্যাংকের

চাকরি, তাই ঋণগ্রহীতারা ঘুষ দিতে উৎসুক, ইত্যাদি কত সুযোগ। কিন্তু সততা তাকে এই লোভ সামলাতে চাপ দিচ্ছে। একদিকে সংসারে অত্যাবশ্যক জিনিসের প্রয়োজন এবং অভাবের চাপ, অপরদিকে অফিসের অবৈধ সুযোগের প্রলোভন। এই দ্বিমুখী চাপের দ্বন্দ্ব তাকে প্রতিনিয়ত বিচলিত এবং বিপর্যস্ত করছে। এতসব অহরহ চাপে এক সময় তার স্নায়ুর ওপরে বেসামাল চাপ সৃষ্টি হতে পারে। স্ট্রোকে তার পক্ষাঘাত ঘটতে পারে এবং জীবনের মতো সে চলতে বলতে অসমর্থ্য হয়ে পড়তে পারে। এই চাপকে নির্দ্বিধায় আর্থিক অনটন বা অসামর্থ্যের চাপ বা লোভের চাপ বলা যায়, যাকে ইংরেজিতে Financial Pressure বলা হয়।

চাপের কথিত ত্রিমুখী বিষয়টি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, বড় সাহেবের কাছে তার অভাবী সময়ের সাহায্যকারীর কোনো কাজের অনুরোধ তার কাছে Moral Pressure বা নৈতিক চাপ, অপরদিকে ওই বড় সাহেব তার অধস্তনদের ওই কাজটি করে দিতে বললে অধস্তনের কাছে তা হবে ক্ষমতার চাপ (Power Pressure)। অর্থাৎ, একই বিষয় দুই জায়গায় দুই রকম চাপ সৃষ্টি করছে। আর Financial Pressure-এর কথা তো পরিষ্কার বলাই হলো। আলোচিত চাপের কুফল এড়াতে বিহিত ব্যবস্থা আছে। যেমন, কারও কাছ থেকে কোনো সুবিধা বা Favour নেয়ার আগে হাজার বার চিন্তা করা যে, এটা গ্রহণ করা ঠিক কি না। এমন পরিস্থিতিতে মনের দৃঢ়তাই পারে আপনাকে সঠিক পথ দেখাতে। অপরদিকে, প্রয়োজনের সীমা সংকুচিত করা, অর্থাৎ চাহিদাকে সীমার মধ্যে রাখা উচিত। যা আছে তার মধ্যে, জীবনযাপনের জন্য পরিবারের সবাই মিলে কঠোর চেষ্টা করা অসততার চাপকে দূরে রাখার মোক্ষম উপায়। বিবেক দিয়ে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেই, কথিত চাপগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। যারা এটা করতে পারে, তারাই প্রকৃত মানুষ, তারাই শেষে সুখী হয়।

৭. স্মৃতির ব্যবহার

শক্তিশালী কবি প্রয়াত শামসুর রাহমানের বাস্তব লেখনীর প্রকট প্রভাব অনেক মানুষের ওপরে বিরাজমান থাকতে পারে। তিনি বলেছেন, ক্ষণে ক্ষণে মানুষের মনে অসংখ্য চিন্তা-ভাবনা, অনুভব ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে এবং পরক্ষণেই মানুষ তা ভুলে যায়। তাই প্রতিটি মানুষেরই উচিত, একটা বিশেষ বয়সে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও সাহিত্যচর্চা করা। অর্থাৎ ওই সব ক্ষণস্থায়ী অথচ দুর্লভ এবং দুর্মূল্য চিন্তা-ভাবনার বিষয়গুলো লেখনীর মাধ্যমে ধরে রাখা উচিত। এ এক অনবদ্য এবং অকাট্য বাস্তব কথন। মহামূল্যবানও বটে। বোধ করি, কবির ওই অভিব্যক্তির মতো সবারই এ রকম হয়। আমারও হয়। আমার বিশ্বাস, এরূপ

ভুলে যাওয়ার ব্যাধি কারও মধ্যে নেই এমন অস্বাভাবিক সুস্থ মানুষের সংখ্যা বিরল।

এ বিষয়ে আমার মতামত এই যে, ওইসব ক্ষণিক ভাবনা, চিন্তাগুলো মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখা গেলে, তা এক উত্তম সাহিত্যকর্ম হিসেবে রূপ নিতে পারে এবং তাতে মানুষের জীবনযাত্রাও সহজ হতে পারে। এমনটি করলে ভুলের বিড়ম্বনা এড়ানো যায় বা ভুলের মাশুল দিতে হয় না। ক্ষণিক স্মৃতিপটে আসা বিষয়গুলো মনে ধরে রাখার জন্য ব্রেইনের ওপর অহেতুক চাপ পড়ে না। তাতে ব্রেইনের যে ডিস্ক আছে তার ধারণক্ষমতা রিজার্ভ থাকে। ফলে ব্রেইন সুস্থ থাকে, সবল থাকে। তাই সব সময় কাগজ-কলম সঙ্গে রাখা উচিত, এমনকি বাথরুমেও। যখন যা মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে রেখে সে মোতাবেক কাজ করা উত্তম অভ্যাস। এরূপ করলে দেখা যাবে, মানুষের জীবন গোছানো হয়েছে। কোনো কাজে ভুল হবে না। সব কাজই সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করা হয়ে যাবে। এতে দেহ এবং মনকে সদা সতেজ ও প্রফুল্ল রাখা যাবে। জীবনে সুখে থাকার, শান্তিতে থাকার এটা একটা বড় উপায়। ইদানীং I-Pad এবং মোবাইল ফোনের সাহায্যেও (অপশন থাকলে) এটা করা সম্ভব। এরূপ করা বা Things To Do পদ্ধতি Follow করাকে Self Regulator-ও বলা যেতে পারে।

৮. সমস্যা এড়ানো মানে বাড়ানো

সমস্যা কী? সমস্যা হচ্ছে চাওয়া এবং তা না পাওয়ার দ্বন্দ্বের ফল। স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার বোবা বা মূক যুদ্ধের সূচনা এবং সূত্রই সমস্যা। এটা মানুষকে আবেগাপ্লুত করে, আগ্রাসী বানায় এবং পরিশেষে তা কখনও কখনও বিপদও ঘটাতে পারে। মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি এবং স্বভাব-চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং বিচিত্র বিধায় তাদের চিন্তা ভিন্ন, যা স্বার্থে ভিন্নতা আনে। এই স্বার্থই প্রথমে জিদ এবং পরিশেষে সংঘাত সৃষ্টি করে থাকে। শত চেষ্টা করেও তা এড়ানো যায় না; তবে রোধ করা যায়, কমানোও যায় আবার বধও করা যায়, যদি ভয় না পেয়ে সমস্যাকে মোকাবেলা করা হয়।

আর একটা বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানুষের জীবনের রিপুগুলোকে মোটামুটি ৪ নামে ডাকা যেতে পারে। যেমন, Greed, Ambition, Hunger & Power। এই ৪টি রিপুকে বিবেক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ বা দমন করা গেলে, দ্বন্দ্ব এড়ানো শুধু সহজই নয়, সম্ভবও বটে, এবং এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। মনের দৃঢ়তা প্রবল এবং অনমনীয় হলে তা যে কোনো কঠিন কাজকে সহজ করতে অদ্বিতীয় ভূমিকা রাখতে পারে। তাই আসুন, আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে জ্ঞান

চর্চা করি, ভালো-মন্দ বিচার করা শিখি, নিরপেক্ষ হই, ধর্মীয়, সামাজিক এবং দাফতরিক অনুশাসন মেনে চলি, প্রত্যয়ী হই। এভাবেই সমস্যাকে এড়িয়ে তার পরিধি বা ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে না দিই। ভয় ছেড়ে, দ্বিধা না করে সাহস নিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক, যে কোনো সমস্যাকে শুরুতে আঘাত করলে তার মূলোৎপাটন করা সম্ভব। যেমন, ক্যান্সার হলে ডাক্তাররা বলে থাকেন, প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে এ ব্যাধি নিরাময় করা যেত। তাই সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা অঙ্কুরে বিনাস করাই উত্তম কাজ। তাই তো প্রবাদ বলে, Prevention is better than Cure. অর্থাৎ, পূর্বাহ্নেই সমস্যা চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখলে বা সে মোতাবেক সমস্যা এড়িয়ে বা মোকাবেলা করে কাজ করলেই সমস্যাকে হার মানানো সহজতর হতে পারে।

৯. সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায়

Courtesy begets Courtesy. অর্থাৎ কাউকে সম্মান করলে প্রতিসম্মান বা শ্রদ্ধা ভালোবাসা পাওয়া যায়। সম্মান পাওয়ার এটা সহজ উপায়। অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় সম্মান পেতে সম্মানের পেছনে ছুটতে হয়। আসলে এটা সোনার হরিণ, একে কল্পনায় আনা যায়, ধরা যায় না। তবে অলীক কল্পনা বাদ দিয়ে ভালো কাজে যত্নবান হলেও সম্মান পাওয়া যায়। কাজ করলে তৃপ্তিও পাওয়া যায়, অবশ্য খুশি মনে আগ্রহ নিয়ে করলে। এরূপ আত্মনিবেদিত কাজ সার্বজনীন উপকারে আসে; তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন। ভালো কর্মীর প্রতি মানুষের আন্তরিক আকর্ষণ বাড়ে এবং এভাবেই ওই কর্মী তার কাজের মধ্যেই বেঁচে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় বলা যায়, **আমি মরে যাব, আমার পেছনে যে অগণিত যাত্রীদল আছে তাদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকব।** তাই যারা নিঃস্বার্থ হয়ে সার্বজনীন কল্যাণে কাজ করে, তাদের সেই কাজের ক্ষয় নেই, জয় আছে। অর্থাৎ, সেই কৃতকর্মের মাঝেই তারা বেঁচে থাকার অবদান রেখে যায়। ওই কাজের জন্য যত বেশি মানুষ উপকার পাবে, ওই কর্মী তত বেশি স্মরণীয় হবেন, সওয়াব পাবেন। মানুষ ইহকালে তার কাজের দৃশ্যত মূল্য না পেলেও পরকালে ঠিকই পায়। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি নিঃস্বার্থ হয়ে ভালো কাজ না করে, সম্মান পেতে ভণ্ডামি করে, লোক দেখানো কাজ করে, শঠতার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাতে তার সম্মান বাড়ে না, বরং কমে। এরূপ ক্ষেত্রে চাটুকার অধস্তন বা অনুজরা অগ্রজদের ভয় করে, সামনে সম্মান দেখানোর ভান করে, পেছনে ঘৃণা করে। ওইসব বসদের এমনকি মানুষদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে, সাবধান থাকতে হবে।

১০. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন

আমাদের সমাজে নামকরণের সার্থকতায় বিপুল বিভ্রাট। আমরা ছেলেদের নাম রাখি হাকিম, জজ, ব্যারিস্টার, বাদশা, রাজা, উজির, নাজির, আমির, সুফি। এমনকি আল্লাহ্ বা খোদা, রাসূল, নবীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখি। মেয়েদের নাম রাখি শাহজাদি, বেগম, লক্ষ্মী, দুর্গা ইত্যাদি। তবে কখনও শয়তান বা ইবলিশ নাম রাখি না কেউই। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে কী দেখা যায়? বাদশা হয় চাকর, বেগম হয় বাদী, সুফি হয় নাস্তিক আর সাধু হয় শয়তান বা ইবলিশ। তাহলে নামকরণের সার্থকতা রইল কোথায়? কেন এমন হয়? আমরা মনে করি, ভালো মানুষের নামে নাম রাখলে ওই মানুষের মতোই আমার ছেলে নামী-দামি হবে, কাজের হবে। কিন্তু তা কি হয়? প্রায়ই তা হয় না। কারণ কী? আসলে সন্তানদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই মা-বাবাকে এবং পরিবারের অগ্রজদের ভালো হতে হয়। কারণ, পিতা-মাতার এবং অগ্রজদের নিয়ত পরিচর্যার বলয়ে তাদের সঙ্গেই শিশুরা দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। যা দেখে তাই শেখে। বিশেষ করে মাতা-পিতার শিক্ষা সন্তানদের মনেপ্রাণে, আচার-আচরণে প্রথমেই গেঁথে যায়। এ কথার প্রমাণও মিলবে একটু খেয়াল করলেই। যেমন, দেখা যায়, অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে অবিকল পিতা-মাতার মতো ঢঙেই হাটে, কথা বলে, মেজাজ করে বা শান্ত থাকে। কেন এমন হয়? কারণ, এটা একটা প্রাকৃতিক এবং পারিবারিক শিক্ষা। তাই আমরা নিজেরা ভালো না হলে আমাদের সন্তানরাও ভালো হবে না। এজন্যই সন্তানদের খারাপ আচরণ বা কর্মের জন্য এককভাবে তাদের দোষ দেয়া যাবে না। এ দোষ বিশেষভাবে পিতা-মাতার। এছাড়া সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও তার মধ্যে কিছুটা থাকতে পারে। আর এ কারণেই সন্তানদের অপকর্মের জন্য বিশেষ করে পিতা-মাতাকেই কথা শুনতে হয়, 'যেমন বাপ তেমন বেটা' বা 'যেমন মা তেমন বেটি'। তাই আসুন, প্যারেন্ট, অভিভাবক বা অগ্রজ হয়ে আচরণে, চলায়, বলায় সংযমী হই, সাবধান হয়ে যাই। সন্তানদের শুধু ভালো নাম রেখে বসে না থাকি। মনে রাখতে হবে, বাবা হওয়া সহজ, কিন্তু বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সহজ নয়। এটা মেনে বাবা হতে হবে এবং বাবা হলে তার কঠিন দায়িত্বও পালন করতে হবে। তা না হলে একদিন না একদিন কঠিন জবাবদিহিতায় পড়তে হবে সন্তান ও সমাজের কাছে।

১১. জিদ ক্ষতিকর

প্রায় সব মানুষেরই কিছু না কিছু Ego বা জিদ থাকে। এটা মানব চরিত্রের একটা স্বতন্ত্র কিন্তু স্বাভাবিক দিক। তবে বেশি Ego বা জিদ থাকা ভালো নয়। কারণ,

এই জিদ অঘটন ঘটিয়ে মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এমনকি ধ্বংসও। যেমনটি ঘটেছিল ট্রয় নগরীতে। Wooden Horse of Troy-এর ঘটনায় হেলেনকে পাওয়ার জিদের কারণে। সেটা কিসের জিদ ছিল? ভালোবাসার জিদ, কেমন ভালোবাসা? Platonic না Romantic? বলা যেতে পারে Romantic Love। তবে ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের কারণেও কখনও কখনও মানুষ জিদ করে থাকে। যাকে বলে 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা'। মানুষ কারণে-অকারণে অনেক সময় না বুঝে জিদ করে, গোঁ ধরে, ভুল করলেও ভুল স্বীকার না করতে অনমনীয় হয়ে যায়। কদাচিৎ ভুল স্বীকার করে। ভুল করে স্বীকার না করলেই বিপত্তি। অফিসে অনেক বস অহেতুক জিদ করে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করেন।

এবার আসা যাক জিদ কেন হয় তার কারণ নির্ণয়ে। জিদ হয় হীনম্মন্যতা উত্তেজনা বা উন্মত্ততা, নির্বুদ্ধিতা এবং লোভ বা লাভের কারণে। আবার অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে। মানুষ হীনম্মন্যতায় ভোগে একাধিক কারণে। যেমন, তার যোগ্যতা কম বা দক্ষতা কম, বুদ্ধি কম, বিবেচনা কম, অথচ তিনি বয়সে বড় এবং যেভাবেই হোক, অবস্থানেও বড়। এই অবস্থানের সুবাদে তিনি যদি প্রতিষ্ঠানের বা দফতরের বা তার পরিবারের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত দেন বা কিছু বলে ফেলেন, নির্দেশ বা হুকুম দিয়ে ফেলেন এবং ওই সিদ্ধান্ত সার্বজনীন ক্ষতিকর হলে ভুক্তভোগীরা তা মানতে অমত করেন, তখন তার জিদ চেপে বসে ওই অর্ডার বা কথা বাস্তবায়নের জন্য। তার বিপরীতে অপেক্ষাকৃত ভালো বিকল্প পথের প্রস্তাব দিলেও তিনি তা নেন না। হুকুমদাতা নির্বোধ হলে সাধারণত এরূপ হয় এবং তিনি ভুল স্বীকার করেন না বা ভুল বুঝতে পারলেও অবস্থানের কারণে জিদের বশবর্তী হয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন না। ওই সময় তিনি মনে করেন, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে তিনি ছোট হয়ে যাবেন, তার নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে যাবে। তাকে কেউ মানবে না। তিনি তখন ওই সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য **হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না** এই প্রবাদের অনুসারী হয়ে পড়েন। হীনম্মন্যতার কারণে এমনটি হয়। তিনি ভাবেন, অধস্তনদের কথায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে তার প্রতি অধস্তনদের ভয় কমে যাবে, তারা বেয়াড়া হয়ে যাবে, প্রশাসন ভেঙে পড়বে এবং এর ফলে তার ক্ষমতা ভূলুণ্ঠিত হবে। ক্ষমতাকে ক্ষমতা ভাবলে এরূপ হবেই। ক্ষমতাকে দায়িত্ব ভাবলে এরূপ হবে না। তখন মনে অপেক্ষাকৃত ভালো বুঝ আসবে। ক্ষমতার তাপের চাপে মানুষের মনে ক্ষমতা অপব্যবহারের প্রবণতা প্রশ্রয় পেতে পারে। তাই তো পুনরাবৃত্তি হলেও বলি, ক্ষমতাকে দায়িত্ব ভাবলে এমন হয় না, হবে না। কারণ, এই দায়িত্বই মানুষকে কর্তব্য শেখায়। এটা ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী। এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই ক্ষমতা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করা বা ক্ষমতার দাপট দেখানোও ঠিক নয়। বরং ভুল করলে নিজের এবং

প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য সময় থাকতে ভুল স্বীকার করে নেয়া উচিত। এরূপ করলে অগ্রজদের ওপর অনুজদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এ ভেবে যে, বস যৌক্তিক মানুষ এবং তিনি যথার্থতাকে মূল্য দেন। এতে করে প্রতিষ্ঠানে Sense of Belonging সৃষ্টি হবে। সবাই প্রতিষ্ঠানকে আপন ভেবে দরদ দিয়ে কাজ করবে। সবার প্রয়াস এবং শক্তি সমন্বিতভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং ঊর্ধ্বতনের এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকের উদ্বিগ্নতা কমবে। তাই মানুষের উচিত, জিদ পরিহার করে ন্যায়ের সঙ্গে, সততার সঙ্গে, যথার্থতার সঙ্গে আপস করে চলা। এটা একটা মহৎ গুণ।

১২. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

স্রষ্টার ১৮০০০ মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ, এটা বোধ করি সবাই জানেন। সব মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অদৃশ্য প্রমাণ তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা। দৃশ্যমান প্রমাণ হচ্ছে, তার মাথার অবস্থান। অর্থাৎ, চলমান জীবের মধ্যে শুধু মানুষের মাথাই থাকে ওপরের দিকে উঁচু হয়ে আর সব জীবের মাথা থাকে নিচের দিকে। এছাড়া আরও একটি প্রমাণ দেয়া যায় এভাবে যে, প্রকৃতির অন্য সব সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সহায়তার জন্য, অর্থাৎ, তার খেদমতে কাজ করে। আবার অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, প্রকৃতির অন্য সব প্রাণীকেও সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন মানুষের খেদমতে। এমনকি বোবা প্রাণী বা জড় বস্তুও মানুষের কল্যাণের জন্য নীরবে কাজ করে থাকে। যেমন, গরু, ঘোড়া, জামা, জুতা, কাগজ, কলম, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি মানুষের কাজের জন্য।

মানুষ, জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে সুষ্ঠুভাবে সঠিক কাজ করবে এটাই তাদের প্রধান দায়িত্ব। একেই বলে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার করা যায়। একে অপরের জন্য কাজ করতে পারলেই এই দুনিয়ায় স্বর্গসুখ উপভোগ করা সম্ভব। তাই তো কবি বলেছেন, **কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর।** অতএব, কোনো মানুষকে ছোট বা নিচ ভেবে ঘৃণা করা উচিত নয়। কাজের বিচারে মানুষকে ভালো বা মন্দ বলতে হবে, শুধু বাহ্যিক ব্যবহারের ওপর নয়। ব্যবসা বা কর্মস্থলের সহযোগীরাও কাজ দিয়ে কর্মীদের মূল্যায়ন করবেন, করা উচিত। তাই কখনও অন্যের কাজ করে দিতে না পারলে অন্তত সৎ পরামর্শ এবং নির্ভেজাল ভালো ব্যবহার দিয়ে সবার মন জয় করতে হবে এবং তা করা সম্ভব। সব জীবকেও দয়া করা উচিত। কারণ, একটা মর্মবাণী আছে, **জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।** স্রষ্টার সৃষ্টিকে করুণা করলে স্রষ্টা তো খুশি হবেনই।

১৩. পোশাক নয় মনুষ্যত্বে মানুষ

শেখ সাদীর গল্প কে না জানে। প্রথমবার খারাপ পোশাকের জন্য অনুষ্ঠানে ঢুকতে না দেয়ায় দ্বিতীয় বার ভালো পোশাকের জন্য সমাদর পাওয়ায় তাকে খেতে দেয়া সব খাবার তিনি মুখে না দিয়ে পকেটে পুরেছিলেন। এখানে যে মেসেজটি রয়েছে তা হলো, প্রথমে সবাইকে মানুষ হিসেবে নিতে হবে এবং পরে মানুষের গুণকে কদর করতে হবে। তবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পোশাকের কদর একটু বেশি। তাই পোশাক কোড (সর্বত্র লিখিত না থাকলেও) মেনে চলা আবশ্যক। বিষয়টি আমাদের খেয়াল করতে হবে। পোশাকের জন্য কাউকে অপমান বা অসম্মান করা যাবে না। খারাপ বা কম দামের পোশাকের মানুষের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করাও উচিত নয়। কারণ, তাদের মধ্যেও অনেক ভালো গুণাবলি থাকতে পারে, যা মানুষের উপকারে আসতে পারে।

১৪. গিফট/টিপ্সের অশুভ প্রভাব

আগের অনুচ্ছেদে পোশাকের পাশাপাশি মানুষের উদ্বুদ্ধকরণের কারিশমার ওপর বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, যা শুধু উপকারই ইঙ্গিত করে না, তা সৎ মানুষের মানসিকতা, কাজে একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধের উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। এবার গিফট, টিপসের কথায় আসা যাক। আমরা যারা দফতরে কাজ করি (ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাদে), তাদের কেউ কেউ অধিকাংশ সময় দফতরের কাজে কম মনোযোগী থাকি। নিজের স্বার্থ হাসিলের কাজে নজর দিই বেশি। কিসে অফিসের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা যায়, সেদিকে তৎপর থাকি। তাই তো ওইসব প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দিন দিন নিম্নমুখী হয় বা হচ্ছে। আমরা নিজের দোষ দেখি না, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাই। এই অবস্থা শুধু দফতরেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাইভেট সেক্টরের কমিউনিটি লিভিং অর্থাৎ অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনায়ও বিরাজমান হতে পারে।

ধরা যাক, ১৫টি ফ্ল্যাটের একটি আবাসিক কমপ্লেক্স। ধনী ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মজীবী ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের বা পেশার জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত বাসিন্দাদের সমাবেশ এখানে। ওই আবাসনে একে অপরের প্রতিবেশী। সেখানে সবকিছু দেখাশোনা করতে একটা মালিক-সমিতি রয়েছে। যার উদ্দেশ্য, ওই পরিমণ্ডলের সব বাসিন্দাকে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশ দেয়া। মাসে একবার সমিতির সভা হওয়ার কথা থাকলেও কদাচিৎ হয়। হলেও মিটিংয়ে কখনই সমিতির ৩ জন অফিস বেয়ারারসহ ৪-৫ জনের বেশি উপস্থিতি থাকে না। যদিও সবার সুবিধা বিবেচনায় রেখে এমনকি সম্মতি নিয়ে

মিটিংয়ের তারিখ দেয়া হয়। যাহোক, অপূর্ণ বা অনিয়মিত মিটিং হলেও মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত কদাচিৎ কার্যকর হয়। পুরো পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। গার্ড নামে আছে, কামে নেই। পরিবেশ নিরাপত্তাহীন। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

যারা সমিতির মিটিংয়ে আসে না, তারা সমিতির সভার সিদ্ধান্তও মানে না। আবার ভণ্ডামি, প্রতারণা করে মুখে বলে, আমরা সমিতির সব সিদ্ধান্ত মানি। বাসিন্দাদের কেউ কেউ এমন ব্যবহার করেন এবং এমন ভাব দেখান যেন তিনি সব বিল্ডিংয়ের মালিক, শুধু একটি অ্যাপার্টমেন্টের নয়। কী হাঁক-ডাক তাদের, তারা অন্য প্রতিবেশীর সুযোগ-সুবিধা আমলে নেন না। তাদের মধ্যে অত্যাচারী জমিদারি কায়দা প্রকটভাবে বিরাজমান। আবার কেউ কেউ মাসিক চাঁদা দেন না ঠিকমতো। চাঁদা না দিলে সমিতি কীভাবে চলবে– একথা বলার জন্য মিটিং শেষে সবাই ওইসব অসহযোগী বাসিন্দার বাসায় গেলে, নানান অজুহাতে তারা দেখা দেন না। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যান। কখনও হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেলে, সমিতির বিপুল বকেয়া চাঁদা পরিশোধের জন্য মিথ্যা ওয়াদা করেন একটার পর একটা। এভাবে চলে ওয়াদার পর ওয়াদা, আর ওয়াদা শুধুই ওয়াদা। তারা সমিতির স্টাফদের ধমক দিয়ে, কখনও কখনও উপঢৌকন দিয়ে, আবার কখনও খাবার-দাবার খেতে দিয়ে বশে আনেন। বিনিময়ে তারা সমিতির নিয়ম-কানুন এবং সিদ্ধান্ত এড়াতে ওইসব স্টাফের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা পান। স্টাফরাও গাল খাওয়ার ভয়ে সমিতির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে কিছু বলেন না। তারা ভাবেন, গাল খেয়ে কী লাভ? গিফট বা বকশিশ খাওয়াই ভালো। এভাবেই দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে।

এই উপমার অবতারণা এখানে এই কারণে করা হলো যে, সামাজিক আচার-আচরণ না মেনে, বিচার না মেনে বা বিচার ভঙ্গ করে যেসব মুষ্টিমেয় দুর্ধর্ষ মানুষ দেমাগ ও গরিমা নিয়ে চলে, তাদের জন্য ওই সমাজের অধিকাংশ ভালো এবং নিরীহ মানুষের কষ্ট হয়, এমনকি বিপদও ঘটতে পারে, এটা তারা ভাবে না। তাদের তো বিপদে কোনো ভয় নেই। কারণ তারা ভয়ঙ্কর। তারা বিপদের স্রষ্টা। তারা নিজেদের সৃষ্টিকে ভয় পাবে কেন? তারাই তো ভয় দেখিয়ে অন্যদেরকে তাদের কাছে ভিড়তে দেয় না।

এই অবস্থার বিপরীতে পরিত্রাণক এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রয়োজনে পরিবার-আইন এবং অনুশাসন তৈরি করা, সংশোধন করা এবং সর্বোপরি তার কঠোর প্রয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

কারণ, দিনে দিনে অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা বাড়ছে, এখনও যদি কোনো আইন না করা হয়, ভবিষ্যতে এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং তাতে অনেক

অসুবিধা হবে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আবাদি জমি বরবাদ না করে অ্যাপার্টমেন্ট প্রথাকে প্রধান্য দিতেই হবে এবং সেক্ষেত্রে এরূপ আবাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি অভিন্ন আইন বা নীতিমালা থাকা আবশ্যক, যাতে করে তার সাহায্যে পরিবেশ ঠিক রাখা যায়।

১৫. আত্মসাৎ কাহিনী

আত্মসাতের কথা শুনলেই ভয় লাগে। নির্বোধ বা বেওকুফ হলেই মানুষ আত্মসাতের মতো এমন ভয়ঙ্কর, আত্মঘাতী কাজ করতে পারে। আত্মসাৎ করে পার পাওয়া কঠিন। বুদ্ধিমান বা বিবেকবান মানুষেরা এটা বোঝেন। তারা কদাচিৎ এরূপ করেন। তবে নিরীহ কেউ ভাগ্যদোষে আত্মসাতের ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে সেটা হয় তাদের জন্য দারুণ বিড়ম্বনাময়, হয়রানিমূলক এবং অশান্তিকর। দুষ্কর্ম-প্রবণতা বা লোভী মানসিকতা ছাড়াও, অন্যের প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং স্বার্থপরতা অথবা দুর্বল মানসিকতার কারণে সাধারণ মানুষ এরূপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাই, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সবাইকে অন্ধ বিশ্বাস করে তাদের কাজ যাচাই-বাছাই না করে সমর্থন দেয়া শুধু বোকামিই নয়, ঝুঁকিপূর্ণও বটে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে সে অতিসাহসী হয়ে লোভের পথে পা দিতে পারে এবং এর ফলে ওই Process-এ পড়ে নিরীহ কেউ কেউ দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের জন্যও এর কুফল মর্মান্তিক হয়। এই প্রসঙ্গে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের নামে অনেক আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা আত্মসাৎ বা চুরির কাহিনী যথার্থ একটি উপমা হতে পারে। যেমন, ওই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের জন্য সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি খুব সৎ এবং ভালো মানুষ ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার। দক্ষ নির্বাহী হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও একসময় তিনি একটি চুরি বা আত্মসাতের কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছিলেন। তার নিচের লেভেলের লোকজনকে যেহেতু তিনি খুব বিশ্বাস করতেন, তাই তাদের কারও কাজ তিনি তেমন যাচাই-বাছাই করতেন না। তার এই নিরীহ সরলতা নিচের সাধু-শয়তানদের অপকর্ম করতে আগ্রহী এবং দুঃসাহসী করে তোলে দিনে দিনে। অতঃপর, ভুয়া মেশিনের বিপরীতে জ্বালানি খরচ দেখিয়ে, তার ওপর ওই উর্ধ্বতনের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে, তারা নিয়মিত টাকা আত্মসাৎ করে চলে। বছরের পর বছর তারা এ অকাজ করে আসছিল। পরে এই ঘটনার নির্মম উদ্‌ঘাটন ঘটে তদানীন্তন জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি অর্থাৎ পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটির পরিদর্শনে। তারা যাচাই করে দেখেছে, প্রতিদিন কয়টি মেশিন বা জাহাজের, কত ক্যাপাসিটির কয়টি ইঞ্জিনে কত জ্বালানি তেল লাগার কথা এবং তার বিপরীতে কত তেল খরচ

দেখানো হয়েছে। ওই দফতরের হিসাব হালনাগাদ ছিল না। যদি প্রতিদিনের হিসাব প্রতিদিন করা হতো, অর্থাৎ হিসাব যদি হালনাগাদ থাকত, তাহলে হয়তো এই অপকর্ম অল্প থাকতেই ধরা পড়ে যেত। যেহেতু কাজ পেন্ডিং ছিল, তাই অন্য দায়িত্বের চাপে বিষয়টি ওই ঊর্ধ্বতন নির্বাহীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আর্থিক বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী বিধায় তার অনুমোদনেই এই সব খরচ হয়েছে। তাই তিনি দায়িত্ব কিছুতেই এড়াতে পারলেন না, ফেঁসে গেলেন নির্মমভাবে। এক সময় শোনা গেল, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার হয়েছেন। কারণ, এ আত্মসাতের খবরটি এলাকার সব অফিস-আদালতে কানাঘুষার পাশাপাশি, সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়ে প্রচারিত হলে, সারাদেশে তার সুনামের ওপর প্রচণ্ড আঘাত আসে। পরিচিত পরিমণ্ডল ছাড়াও পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তার মাথা হেঁট হলো, জাতীয় প্রচারণার ফলে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হয়তো অন্য রকম, যা মানুষ পরে জেনেছে। কিন্তু ততদিনে ওই কর্তাব্যক্তির মান-সম্মান ধূলায় মিশে গেছে। অনেকে তাকে মৌন বয়কট করে অর্থাৎ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। কারণ, সবার ভয়, ওই ব্যক্তির সঙ্গে মিশলে তাদের মুখ ছোট হয়ে যাবে। এটা একটা নিদারুণ অসহনীয় মনোকষ্টের ব্যাপার।

ব্যাংকের চাকরিতে এরূপ ঘটনা ঘটলে অবস্থা আরও বেশি বেগতিক হয়। কারণ, যেহেতু ব্যাংক টাকা নিয়ে কারবার করে বা অন্যের টাকার বিশ্বস্ত পাহারাদার বা হেফাজতকারী হিসেবে কাজ করে, সেহেতু সেখানে একবার হিসাবের গড়বড় বা জালিয়াতির মতো কোনো কাণ্ড ঘটলে সবাই সেটাকে চুরি ভাবে এবং ঘটনার সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাদেরকে ঢালাওভাবে চোর বলে। ব্যাংকের বেলায় এটা একটা সহজ এবং সরল অপবাদ হয়ে দাঁড়ায়, যা করুণ এবং মর্মান্তিক। কারণ, তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে তাদের স্কুল-কলেজে, পাড়ায় বা মহল্লায় সহপাঠী এবং প্রতিবেশীদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে না। সবাই বিদ্রূপ করে, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, চোরের ব্যাটা। ওর বাপ চোর। তাদের সঙ্গে কেউ মেশে না। এমনকি ছেলে-মেয়েদের বিবাহে বা নতুন সম্বন্ধ সৃষ্টিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবাহোত্তর সংসারে নিরাপত্তা কমে ও অশান্তি বাড়ে বা বাড়তে পারে। এই যন্ত্রণা সইতে না পেরে তার পরিবারের কেউ বা পরিবারপ্রধান দুর্বল চিত্ত হলে নিজেই আত্মহত্যা করতে পারেন।

এই অনুশীলনের এভাবে উপসংহার টানা যায়, আলোচিত অশুভ পরিস্থিতি এড়াতে একটু কষ্ট হলেও, নিয়মমতো কাজ করা দরকার। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন শেষ করা নিজেকে বিপদমুক্ত রাখার প্রমাণিত উপায়। এভাবেই আপনি নিয়ম মেনে ঠিকভাবে চলুন, আপনার পরিবারকে চলতে শেখান। তাতে সুশিক্ষার বিস্তৃতি বাড়বে পুলিশ বাহিনী দেশের অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেশি করে মনোযোগ দিতে পারবে। ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের উপকার নিশ্চিত হবে।

আসুন, আমরা সবাই ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে তাই করি। Love all but trust none blindly, এই Theory মেনে কাজ করে নিরাপদ থাকি।

১৬. গৃহকর্তা বনাম গৃহকর্ত্রী

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মূলত বিশ্বাসের, আস্থার এবং সমঝোতার। রক্তের সম্পর্কের মতো ধারাবাহিক নয়, পারস্পরিক নয়। কারণ, বিবাহ মানেই বাঁধন। একগাছের বাঁকল বা ডাল, অন্য গাছের সঙ্গে লাগানো বা কলম করা। কলম বা গ্রাফটিংকে সযত্নে নার্সিং না করলে সুফল পাওয়া যাবে না। নার্সিংয়ের ঘাটতি হলেই মুস্কিল। তাই খুব সাবধানে, সচেতনতার সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপন এবং নিয়মিত পরিচর্যা বা পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এখানে বিশ্বাস অটল ভূমিকা রাখে। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরূপ অবস্থা এড়াতে একে অপরের সঙ্গে স্বচ্ছ এবং বিনয়ী আচরণ করা উচিত।

অনেক সময়, স্ত্রী বা গৃহকর্ত্রী মাত্রাজ্ঞানের অভাবে স্থান, কাল, পাত্র ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে অপরিমিত আচরণ করলে বিবাদ বিসম্বাদ বাধে। যেমন, স্বামী কাজ শেষে বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কোনো খারাপ বা মারাত্মক খবর দিয়ে বসেন। এমন করা উচিত নয়। কারণ, কর্তা হয়তো বাইরে থেকে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা সেরে অথবা মাথায় নিয়ে বা পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে, বাসায় ঢুকছেন এই মনে করে যে, বাসায় ফিরে বিশ্রাম করবেন। স্ত্রী তার সেবার জন্য হয়তো কিছু প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছেন। কিন্তু বাড়িতে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাকে কোনো দুঃসংবাদ বা ঝামেলার কথাবার্তা শোনানো হয় তাহলেই মুস্কিল। এছাড়া তিনি Change করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস বা পরিবেশ ঠিকমতো Ready না পেলেও অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। দিনের পর দিন, এরূপ হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো থাকে না। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে, পরিস্থিতি ম্যানেজ করে স্ত্রীকে চলতে হবে এবং স্বামীকেও তাই। প্রতিদিন, প্রতি বিষয়ে, প্রয়োজনে স্বামী স্ত্রীর কাছে শিখবে, স্ত্রীও স্বামীর কাছে। কারণ, শেখার কোনো শেষ নেই। স্ত্রীর উচিত পিত্রালয়ের কথা ভুলে গিয়ে, শ্বশুরালয়কে নিজের সংসার হিসেবে মেনে নিয়ে তা গড়ে তোলা। স্ত্রীদেরকে স্বামীর অর্থাৎ নিজের বাড়িতে পা দিয়ে বাবার বাড়ির আদল ভুলে যেতে হবে। পিত্রালয়ের অভ্যাস সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বা ভুলে গিয়ে, শ্বশুরবাড়ির প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে সুখ পাবে। তা না করে স্বামী-স্ত্রী যে যার মতো অর্থাৎ দু'জন দু'জনের মতো স্বাধীন বা বেপরোয়া চললে বা একে অপরকে না মানলে, এককভাবে নিজেরটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলে, সে সংসার টিকতে পারে না। তাই একে অপরের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে। একজন গরম হলে অপরজনকে নরম হতে হবে। স্ত্রীর ন্যূনতম

সততা এবং আন্তরিকতা থাকলে স্বামীর উচিত তার ছোট ছোট ত্রুটি মার্জনা করা। স্ত্রীরও উচিত, ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো। এছাড়া স্বামী বাড়িতে ফেরার পর, স্ত্রীর উচিত তার মেজাজ বুঝে আচরণ করা। এরূপ না হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো থাকে না। উভয়ই চাকরিজীবী হলে একে অপরকে বুঝতে হবে এবং পরস্পরের ওপর আস্থা রাখতে হবে। সংসারের কাজ ভাগ করে নেয়া উচিত হবে, যাতে কাজের ভারসাম্যহীনতার কারণে একের চাপা বা খোলা আচরণ অপরের কাছে রূঢ় বা উচ্ছৃঙ্খল মনে না হয় এবং কেউ কষ্ট না পায়।

আবারও বলি, একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, পিতা-মাতার স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-আচরণ সন্তানদের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে। কারণ, সন্তানরা জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত বাবা-মা এবং পরিবারের লোককে দেখে এবং এই দেখার মাধ্যমেই শেখে। তারা কথার সাহায্যে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে না, তবে বোঝে সবই। তারা তাদের মনের অভিব্যক্তি বা চাহিদা বিভিন্ন মাধ্যমে বা Body Language-এর সাহায্যে বা হাসি-কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। পিতা-মাতাই সেটা ভালো বোঝেন। তাদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাই পিতা-মাতার আচরণের ওপরই সন্তানদের প্রকৃতি, চরিত্র এবং মানসিকতার গঠন নির্ভর করে। এই কারণেই পিতা-মাতার কোনো সুযোগ বা অধিকার নেই, নিজেদের অসংযত আচরণ দিয়ে নিরীহ সন্তানদেরকে নির্দয়, নিষ্ঠুর, হিংস্র বা এক কথায় অমানুষ বানানোর। পিতা-মাতার আচরণ সর্বদা শালীন ও সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এ ব্যাপারে সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিশুরা যেন Broken Family-এর শিকার না হয়, মা-বাবার পরকীয়ার ধ্বংসের লীলায় বা অন্য কোনো কারণে।

স্বামী, স্ত্রী বা পিতা-মাতা, উভয়কেই মনে রাখতে হবে, অতীত ভুলে বর্তমানকে সুন্দর করে সন্তানদের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তারা ভালো অনুপ্রেরণা পায়, সৎ চিন্তা করতে এবং সুপথে চলতে।

১৭. মরীচিকা প্রভাব

শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে দূরের চকচকে বালুকণাগুলোকে পানির মতো মনে হয়। আবার আকাশকে মনে হয়, দূরের মাটিতে মিশে গেছে। যত এগোনো যায় ততই দেখা যায় একই অবস্থা। কিন্তু এর কোনোটিই ঠিক নয়। এটি একটি অনুভব মাত্র। বাস্তবে কখনও এরূপ হয় না, হবে না। একেই মরীচিকা বলে।

চাকরি বা ব্যবসা শুরু করেই যদি কেউ মনে করে, গাড়ি, বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি বানাতে হবে এবং তা করতে না পারলে হতাশ হয়, তাহলে সে কিছুতেই

সৎভাবে কাজ করতে পারবে না। তার ওই লোভী-চিন্তা তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। লোভ তাকে পাপের পথে ঠেলে দেবে। তখন মানুষ বিবেককে বিসর্জন দিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করবে। ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করবে না। দুর্নীতি বা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করবে। যুক্তি, বিশ্লেষণ, উচিত-অনুচিত নির্ণয় এবং ভালো-মন্দ বিবেচনা করা ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করা, নেয়া, পাওয়া বা প্রত্যাশা করা আদৌ ঠিক নয়। এটা শুধু ঝুঁকিপূর্ণই নয়, মহাপাপও বটে। কাজের সুবাদে হোক বা না হোক, কেউ কিছু অফার করলে বা গিফট হিসেবে দিতে চাইলে চট করে তা গ্রহণ করা যাবে না। ভাবতে হবে, কেন আমাকে অফার দিল? তার লাভ কী? উদ্দেশ্যই বা কী? এর পেছনে তার কোনো দুরভিসন্ধি বা স্বার্থ থাকতে পারে কি না। এরূপ প্রশ্ন মাথায় নিলে সতর্কতা বাড়ে, লোভ সংবরণ করা যায় এবং নিজেকে সামলিয়ে বিপদ এড়ানো যেতে পারে। তাতে কর্মীর দক্ষতা বাড়ে। তাই আমাদের উচিত, সুষ্ঠুভাবে, নিঃস্বার্থভাবে ভাবা, লোভ না করা এবং মরীচিকার মতো লোভ-লালসার সীমাহীন চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট এবং অনুরক্ত না হওয়া; যাচাই-বাছাই করে কাজ করা, চোখ-কান খোলা রেখে চলা। তাই আসুন, আমরা শুনেই অন্ধভাবে বিশ্বাস না করি। অন্যের কথা শুনব, তবে তা মেনে নেয়ার আগে যাচাই-বাছাই করব। কথা যথার্থ বা ভালো হলে গ্রহণ করব; মন্দ বা অসত্য হলে বর্জন করব, সঙ্গোপনে। অন্যের ভালো দেখে লোভ করব না, ঈর্ষান্বিতও হব না। কারণ, এরূপ উপসর্গ পাপের পথে ঠেলে দেয়। ভুলে গেলে চলবে না, Behind every fortune there is a crime.

১৮. ঠিকানা বিভ্রাট

আমরা অহরহ মানুষকে লিখিত বা ফোনে আমাদের বাড়ির, অফিসের বা অন্য কোনো অবস্থানের ঠিকানা দিই, যাতে কেউ সেখানে সহজে পৌঁছাতে পারে। এই ঠিকানা যদি সঠিক, পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট না হয়, তাহলে দারুণ বিভ্রাট বেধে যেতে পারে। এতে সময়ের অপচয়, দেহের হয়রানি ও মনের পেরেশানি বাড়ে। এছাড়াও অনেক বিপদ হতে পারে। এতে ঠিকানা যিনি খোঁজেন তার ক্লান্তি বেড়ে কাজের স্পৃহা কমে যায়। আবার ঠিকানা খোঁজা ব্যক্তি কোনো দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে সর্বস্বান্ত হতে পারে। এই অসুবিধার বিষয়টা একটা উপমার মাধ্যমে পরিষ্কার করা যায়।

বাড়ি নম্বর ২, ধানমণ্ডি, ঢাকা; অথবা উত্তরার ঠিকানা হলে, রোড নম্বর ৪, বাড়ি নম্বর ৩, উত্তরা। এই দুটি ঠিকানাই অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ লেন নম্বর, বাড়ি নম্বর, সেক্টর নম্বর এবং পোস্টাল কেড নম্বর এবং লোকেশন দিই না। আবার লোকেশন দিলে অস্পষ্টভাবে দিই। যেমন, ওই এলাকার কোনো প্রসিদ্ধ বাড়ি, অফিস বা

প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে বলি, তার পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে। এরূপ ঠিকানাও বিভ্রান্তিকর। কারণ, বাড়ির সামনে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে বা বাড়ির মুখোমুখি দাঁড়ালে দক্ষিণ বা পূর্ব একদিক হবে, আবার বাড়ির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালে বা বাড়িকে পেছনে রেখে দাঁড়ালে তা উল্টো হবে। অনেক সময় দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলা হয়, অমুক বাড়িটার ডান পাশে বা বাম পাশে। এতে কী হয়? ওই ওপরে বলা, পূর্ব বা দক্ষিণের মতো একই বিভ্রাট।

অপরদিকে, বাড়ির Opposite বা বিপরীত বললে রাস্তার একই সাইডে বোঝায় না। অর্থাৎ রাস্তায় ডিভাইডার থাকলে তার পরের রাস্তায় যে বিপরীতমুখী রাস্তা সেটাকে বোঝাবে। সামনে বললে বাড়ি সংলগ্ন রাস্তাকেই বোঝানো হবে। এরূপ ঠিকানা খোঁজা মানুষকে ছিনতাইকারীরা বিপদে ফেলতে পারে।

এখন বলি, ঠিকানা বিভ্রাট কেন ঘটে? আসলে আমরা যেখানে থাকি, সেখান থেকে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করি। তাই অহরহ আশপাশের সবকিছু দেখি এবং আমাদের কাছে মনে হয়, এই ঠিকানা খুবই সহজ, খুঁজে বের করা আদৌ কঠিন নয়। এমন ধারণা থেকেই কাউকে ঠিকানা দেয়ার সময় একটু কম সিরিয়াস থাকি। অর্থাৎ, Casual হয়ে পড়ি। তাতেই ঠিকানার অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। তাই কাউকে ঠিকানা দেয়ার সময় মনে রাখতে হবে, তিনি নতুন লোক এবং এই ঠিকানার সঙ্গে অপরিচিত। পরিষ্কার করে ঠিকানা বলে বা লিখে না দিলে তা যথেষ্ট হবে না, বরং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

বিদেশের মতো আমাদের দেশে পোস্টাল কোডসহ বাড়ি-ঘরের নম্বর Arithmatic পদ্ধতিতে, ধারাবাহিকভাবে ক্রমানুসারে থাকে না। সেখানে জোড় বা বেজোড় হিসাবে ক্রমানুসার করা থাকে। রাস্তার একদিকে জোড় নম্বর এবং অপরদিকে বেজোড় নম্বর থাকে। সেখানে রাস্তার নাম সংবলিত সাইনবোর্ডও থাকে প্রতি রাস্তার শুরুতে, যা ঠিকানা বের করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাছাড়া তাদের সহজলভ্য রোডম্যাপও ঠিকানা খুঁজতে বেশ সহায়ক। এসব সুবিধা এখানে নেই। তাই, আমাদের দেশে ঠিকানা দিতে হলে তাতে কোন এলাকায়, কোন সেক্টরে, কত নম্বর রোডে, কোন গলিতে এবং কোন রাস্তায় ঢুকে, ডানে না বাঁয়ে অর্থাৎ আগে বা পশ্চিমে এবং গলিতে ঢোকার পর হাতের ডানে না বামের লাইনে, কয়টা বাড়ির পর এবং কোন বিল্ডিংয়ের কত নম্বর ফ্লোরে ইত্যাদি ফোন নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্য থাকা উচিত। তাহলে লেখাপড়া না জানা লোক হলেও অন্যের সাহায্যে সহজে ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারবেন।

আবার, কোনো নতুন মেহমান এসে বাইরে বেড়াতে গেলে, তার কাছে বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে দিতে হবে, যাতে তিনি হারিয়ে না যান।

গ্রামের আত্মীয়-স্বজন বড় শহরে এলে এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, যেমন বিদেশে অনেক শিক্ষিত লোকের হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।

১৯. ভুল ধারণা মানে ভুল সিদ্ধান্ত

ভুল ধারণা কারও কাছ থেকে শুনে হতে পারে, আবার ভুল অনুমানের কারণেও হতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ মানুষ বা সমাজপতি বা অফিসের বসেরা অনেক সময় অসত্য কানকথা শুনে তা বিশ্বাস করেন এবং যার বিরুদ্ধে শোনেন, তাকে ভুল বুঝে বসেন। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে কানে হাত দিয়ে পরখ না করে চিলের পেছনে ছোটেন। কানকথার ব্যাপারে আগে বলেছি, আবার এখানেও বলার প্রয়োজন পড়ল। কারণ, এটা সমাজে অনেক ক্ষতি করছে। এই প্রসঙ্গে, একটা বাস্তব ঘটনার অবতারণা করছি। তবে এটা পুনরাবৃত্তি নয়। ঘটনাটি এমন ছিল যে, কোনো একটি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী চট্টগ্রাম এলাকায় ভিজিটে যাবেন। ওই সময় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএমের পরিবর্তে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে তিনজন ডিজিএম, কাজের ভাগাভাগিতে বিভাগীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। একজন ঋণ এবং **বৈদেশিক বিনিময়** বাণিজ্যের দায়িত্বে (জিএমের ক্ষমতা নিয়ে) এবং অপর দু'জন ডিজিএমের ক্ষমতায় যথাক্রমে সাধারণ ব্যাংকিং এবং **ব্যয় নিয়ন্ত্রণের** দায়িত্বে ছিলেন। চট্টগ্রাম চেম্বারের অলিখিত অভিযোগের মুখে সেখানকার জিএমকে প্রধান কার্যালয়ে ক্লোজ করায় তিনি ঢাকা থেকেই চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রধান নির্বাহীকে চট্টগ্রামে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ওই জিএম আগের দিন রাতেই চট্টগ্রাম পৌঁছান। অন্যদিকে, ওই রাতেই বিভাগীয় অফিসের ডিজিএম, ক্রেডিট ও বৈদেশিক বিনিময়ের বাসায় তার এক আত্মীয় বেড়াতে যান, যিনি চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের কোয়ারেন্টাইন অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। ডিজিএমের অনুরোধের জবাবে তিনি বললেন, ব্যাংকের বিভাগীয় অফিসের একটা গাড়ি এয়ারপোর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্লেনের নিকটতম স্থান থেকে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে রিসিভ করে আনার জন্য সুযোগ করে দেয়া যাবে। তবে গাড়ির নম্বর লাগবে এখনই। কারণ, কাল সকাল আটটার মধ্যেই আমাকে এই কাজের অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। তাই তাৎক্ষণিকভাবে ওই ডিজিএম তার ব্যবহৃত জিপ গাড়িটির নম্বর তার কছে সরবরাহ করেন। কারণ, জিএম সাহেবের নতুন গাড়ির নম্বর তার জানা ছিল না। আত্মীয়কে তিনি আরও বলে রাখলেন, কাল সকালে এই জিপ গাড়িটির পরিবর্তে জিএম সাহেবের গাড়িটি (কার) ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই আত্মীয়-কোয়ারেন্টাইন অফিসার বললেন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরের দিন সকালে একসঙ্গে রওনা দিয়েও ট্রাফিক জ্যামের কারণে একটু পিছিয়ে পড়ায়

জিএম সাহেব অপর দুই ডিজিএমকে নিয়ে ঈষৎ আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছান। ডিজিএম, ক্রেডিটের ওই আত্মীয় (কোয়ারেন্টাইন অফিসার) তখন গাড়ি ঢোকানোর অনুমতিপত্রটি (যা সকালে এসেই করে রেখেছিলেন) তাদের হাতে তুলে দেন। তখন ওই ২ জনের মধ্যে একজন ধূর্ত ডিজিএম জিএম সাহেবের কান ভারী করেন এই বলে যে, দেখেন স্যার, আপনাকে হেয় করার জন্য ডিজিএম ক্রেডিট তার জিপ গাড়ি দিয়ে এমডিকে প্লেনের কাছ থেকে রিসিভ করে আনার জন্য অনুমোদন করিয়েছে। এতে জিএম প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তার একটু পরেই ওই ক্রেডিটের ডিজিএম সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সবার সামনে তাকে উচ্চস্বরে অশ্রাব্য ভাষায় যারপরনাই গালিগালাজ করেন, অপমান করেন। আশপাশের সবাই শুনল এবং এও দেখল, নির্বাক ডিজিএম ক্রেডিট ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে কাঁদছেন।

কেন এমনটি হলো? ওই জিএম যদি যথেষ্ট বিচক্ষণ হতেন, তার যদি ভালো প্রশাসনিক জ্ঞান থাকত এবং তার নিজের দক্ষতার ওপর যদি তার আস্থা থাকত, অর্থাৎ তিনি যদি নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগতেন, তাহলে তিনি তার অধস্তন অর্থাৎ ওই অপেক্ষাকৃত চতুর এবং ধূর্ত ডিজিএমের কানকথা যাচাই-বাছাই না করে, তার মিথ্যা উস্কানিতে, এই সিনক্রিয়েট করতেন না। অভিযুক্ত ডিজিএমকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেই কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত। যাহোক, এরপর গালি খাওয়া ডিজিএমের রাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী জিএমের গাড়িই ভেতরে গেল। কিন্তু সেখানেও ওই ধূর্ত ডিজিএম জিএমকে শোনালেন, তিনি তার পরিচিত অন্য একজনকে ধরে জিএমের গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়েছেন। এই ধরনের ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝির জন্য একমাত্র দায়ী ঊর্ধ্বতনদের অদক্ষতা, অধৈর্য, অপরিপক্বতা, অদূরদর্শিতা এবং নিরাপত্তাহীনতা। আবারও বলি, তিনি যদি দক্ষ এবং বিচক্ষণ হতেন, তাহলে নিজের ওপর তার আস্থা থাকত; তিনি অনুমানে সিদ্ধহস্ত হতেন এবং এর ফলে কখনই তিনি ওই বিভ্রান্তিমূলক কানকথা বিশ্বাস করতেন না, ওই চাটুকার ডিজিএমকে পাত্তা দিয়ে তাকে এরূপ করতে ইন্ধন দিতেন না। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, মানুষের ইমেজ শুধু তার অবস্থান দিয়ে হয় না, দক্ষতা এ ব্যাপারে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির কৃপায় উঁচুতর অবস্থান এসে যায়। তাই অবস্থানের সঙ্গে গুণের এবং দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের চলা উচিত, বলা উচিত, করা উচিত। কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে নিজের ওপর আস্থাশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়। অসত্য কানকথা তখন নিরেট বেওকুফ ছাড়া বুদ্ধিমান কাউকে নাচাতে পারে না।

বসদের দক্ষতা এবং আচরণই অধস্তনদের জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে। এখানে একটি কথা আবারও বলি, কানকথা যিনি বলেন, তিনি বেশি বুদ্ধিমান হবেন না, যদি যার কাছে বলা হয় তিনি তা মেনে নেয়ার আগে তার

সত্যতা যাচাই-বাছাই করে নিয়ে কাজ করেন। তাই শুধু ধারণা করে এবং কানকথার ওপর ভরসা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়।

২০. গোছানো কথা ভুলে যাওয়া

গোছানো কথা বলার সময় ভুলে যাওয়া একটা স্বভাবিক অভ্যাস। এরূপ ভুল হয়তো অনেকেরই হয়, হতেই পারে। অহরহ হচ্ছে, আমারও হয়। আগে গুছিয়ে রাখা কথা বলার সময় ভুলে যাওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে। যেমন-

ক) **প্রথমে বলি**, বক্তৃতা করার সময় মনে আসা পয়েন্ট পরবর্তীতে ভুলে যাওয়ার কারণ এই যে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে অসংখ্য কথা বা ঘটনা ভিড় জমায়, আবার কিছুক্ষণ পর তা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়। তাই এগুলো লিখে রাখা উত্তম যা আগে বলা হয়েছে। তবে বক্তৃতা দেয়ার মাঝপথে যে পয়েন্ট মনে আসে, বক্তৃতা বন্ধ করে তা লিখে রাখা যায় না। চলমান বক্তব্যের সঙ্গে, উচ্চারিত শব্দ চয়নের ঢেউ কখনও কখনও ওইসব পথিমধ্যে মনে হওয়া কথা বা পয়েন্ট ভাসিয়ে নিয়ে যায় মন থেকে। ওই ভুলে যাওয়া কথা সংযোজন করতে পারলে বক্তৃতা হয়তো আরও সুন্দর হতো এবং সমৃদ্ধ হতো বলে মনে হয়। আলোচিত ভুলে যাওয়ার বিষয়টি অসাধারণ নয়; খুবই সাধারণ এবং স্বাভাবিক। তবে বাকপটু বা পেশাদার বক্তাদের হয়তো এমন হয় না। কারণ, তারা বক্তৃতা দিতে দিতে দক্ষ এবং অভ্যস্ত হয়ে যান, পোক্ত হয়ে যান অবস্থা ম্যানেজ করতে করতে।

সাধারণ বক্তাদের এরূপ হওয়ার আরও একটা কারণ হতে পারে এই যে, বক্তৃতা দেয়ার সময় তারা যদি শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকান এবং কোনো শ্রোতার নেগেটিভ বডি ল্যাংগুয়েজ দেখেন, তা তাদেরকে প্রভাবিত করে, ঘাবড়িয়ে দেয়। বক্তা হয়তো ভাবেন, তার বক্তব্য ঠিক হচ্ছে না বা মানুষ পছন্দ করছে না। তখন তিনি খেই হারান, বক্তৃতার ধারাবাহিকতায় আচমকা ধাক্কা লেগে ছন্দপতন ঘটে। এই পরিস্থিতিতে তাকে বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করতে হয়। আবারও বলি, পটু বক্তারা এরূপ অবস্থা সামলে নিতে পারেন কৌশল করে। যেমন, একবার এক অল্প শিক্ষিত যাত্রাশিল্পী স্টেজে উঠে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ মুখস্থ করা পাট (ডায়ালগ) ভুলে গেলেন। Prompter না থাকায় সাহায্যও পেলেন না। তখন তিনি উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে আগের বক্তব্যের রেশ ধরে বলে চলেন, **পাট যাহা জানিতাম সব গিয়াছি ভুলিয়া, ড্রপ সিন দাও ফেলাইয়া, এই পথে যাই পলাইয়া** এই বলে– ওই শিল্পী বীরদর্পে স্টেজ থেকে যথাযথ ভঙ্গিতে প্রস্থান করেন। দর্শকদের বিপুল করতালিতে তখন যাত্রাঙ্গন মেতে ওঠে। অনেক বিমুগ্ধ দর্শককে এও বলতে শোনা গেছে, 'আহ্, কী অভিনয়!'

অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিল্পী বলেই হয়তো তিনি তা করতে পারলেন। কিন্তু এভাবে, কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সভায় বা ট্রেনিং ক্লাসে শিক্ষিত শ্রোতাদের সামনে, বক্তব্য ভুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটলে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তা মেক-আপ করার সুযোগ কম।

খ) দ্বিতীয়ত বলা যায়, স্বর্গীয় দর্শনের কারণেও এমন হতে পারে। যেমন, মানুষ যখন কথা বলেন তখন তিনি বলেন না, সৃষ্টিকর্তা তাকে দিয়ে বলান। তার ভুলে যাওয়া কথার ফল কী হতো তা সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। তাই হয়তো সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য তিনি বক্তার বক্তৃতার ফাঁকে মনে আসা কথা অথবা বক্তৃতার আগে মনে গুছিয়ে রাখা কথা তার মন বা স্মৃতি থেকে বলার সময় সরিয়ে নেন, ভুলিয়ে দেন। তা না করলে হয়তো ওই কথা অনেককে আঘাত করত এবং তাতে 'বিধি বাম' হতো। ভুলে যাওয়ার মধ্যে মঙ্গল ছিল বলেই তিনি ভুলে গেছেন। তাই, বক্তৃতা দেয়ার সময় বা বক্তব্য উপস্থাপন করার সময়, আবেগ দমন করে বিবেক প্রয়োগ করে সাহসিকতার সঙ্গে বক্তব্য দেয়া উচিত এবং ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দের ওপর উপযুক্ত weight বা চাপ দিয়ে মেপে মেপে কথা বলা উচিত। বক্তৃতা করা একটা Art, যাকে বলে Gift of the Gab. এটা চর্চার মাধ্যমে শেখার প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে আমার এক সহকর্মী বলেছিলেন, বক্তৃতা দেয়া শিখতে হলে মনে করতে হবে, আপনার সামনে যেসব শ্রোতা আছে, তারা সব আপনার দেনাদার এবং আপনি তাদের পাওনাদার। তাহলেই বক্তৃতা দিতে সাহস পাওয়া যাবে, বক্তৃতা সাবলীল হবে।

২১. অন্যায় করা ও মাফ চাওয়া

ঘন ঘন অন্যায় করা এবং মাফ চাওয়া ইদানীং একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে আমাদের সমাজে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আগে একবার আলোচনা করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে এই কারণে যে, বিষয়টি সমাজে দিন দিন সিরিয়াস আকার ধারণ করছে।

যারা এমন করে, তারা নিজেদের খুব স্মার্ট ভাবে। কাজে ভুল করে অথবা কাজটি ইচ্ছা করে না করে স্টাইলের সঙ্গে ইংরেজি ছোট্ট শব্দ Sorry বলে পার পেয়ে যায়। এটা শঠতা। আগেও বলেছি, ইংরেজির হোতা, ইংরেজরা তাদের সংস্কারে এই Sorry শব্দটিকে অপমানজনক মনে করে। আর আমরা, এর মানে না বুঝে বা ইচ্ছা করে ভুল বুঝে এই শব্দটি অর্থাৎ Sorry বলতে সম্মান বোধ করি এবং এর সাহায্যে কৌশলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাই। তা না হলে বাংলায় মাফ চাইতে বলুন তো, ক'জন চায়! যাদের কাছে Sorry নামক এই প্রহসনের শব্দটি চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, সেই ঊর্ধ্বতনরাও এটা শুনে চুপ থাকেন, উত্তরে কিছু

বলেন না। আবার কখনও কখনও Smartness দেখানোর জন্য কেউ কেউ একটু সরলভাবে পাল্টা জবাব দিতে বলে থাকেন, It's OK, ইংরেজির উত্তর ইংরেজিতে না দিলে তার কাছে যদি ছোট হয়ে যায়, এই ভেবে। তিনি একবারও ভাবেন না যে, তার এই ইংরেজি শব্দের সম্মতি অর্থাৎ, 'It's OK' বক্তার শঠতাকে সমর্থন দিতে পারে, তার চরিত্র খারাপ করে দিতে পারে। এতে সে ফাঁকি দেয়ার প্রশ্রয় পেতে পারে, কাজে সিরিয়াস হওয়ার একাগ্রতা হারাতে পারে। তাই Sorry বললেই সহজে মাফ করে দেয়া উচিত নয়; যদি তার কাজের ভুল Genuine না হয়, বা ওই ভুলের জন্য কর্তা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়। Genuine ভুল হলে আলাদা কথা। কথায় কথায় Sorry বলার মতো সমাজ ধ্বংসকারী এই ভণ্ড স্মার্টনেস সংগোপনে গ্রামেগঞ্জে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোটা জাতিকে মিথ্যাচার এবং শঠতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

এখানেই এ ঘটনার শেষ নয়। এই মাফ চাওয়া বা Sorry বলার আড়ালে আর একটা ভয়ঙ্কর বিষয় লুকিয়ে থাকতে পারে। যেমন, ইতর লোকেরা খারাপ কাজ করে বা একেবারেই কাজটি না করে Sorry বলে মাফ চাওয়ার বাহানায় পুনরায় বেশি করে আঁটঘাট বেঁধে খারাপ করার জন্য সময় ও সুযোগ করে নিতে পারে। এভাবে বলা যায়, তারা অপরাধ করে ধরা পড়লেও তাৎক্ষণিক বাঁচার জন্য ভান করে, অধিক ক্ষতি করার প্রস্তুতির জন্য সময় নেয়, সেই সময়ে শক্তি সঞ্চয় করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে এবং পরে আরও বড় ক্ষতি করতে অপ্রতিরোধ্য আঘাত হানে। ক্ষমা প্রদানকারী ব্যক্তি ওই প্রতারককে নিরীহভাবে এবং সরলভাবে বিশ্বাস করে এবং তার লুকিয়ে রাখা বা আড়াল করা অপকর্মের পরিকল্পনার বিপরীতে কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখে না, যার ফলে সে বেওকুফের মতো ক্ষমা প্রদর্শন করে, পরে করুণভাবে মার খায়, আর ওই ইতর প্রতারক জিতে যায়, ইতিহাস বলে, মীরজাফর যেমনটি করেছিল নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলার সঙ্গে। তাই আমাদের সাবধান হতে হবে, সদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে অযথা Sorry না বলি, বলতে না হয়। আসুন, আমরা Sorry শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝে আত্মসম্মান রক্ষা করি এবং যারা সহজে ঘন ঘন Sorry বলে, তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকি। Sorry-এর জবাবে তাদেরকে সহজেই 'It's OK' বলে অর্থাৎ মাফ করে দিয়ে উভয়ের ক্ষতি প্রতিরোধ বা বন্ধ করি।

২২. জিনিস আদান- প্রদানের নিয়ম

কাউকে কোনো জিনিস দেয়া-নেয়া বা হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে অলিখিত হলেও কিছু বিধি বা আচরণ মানার আবশ্যকতা আছে। প্রায়ই দেখা যায়, আমরা অহংকার করে বা অবজ্ঞা ভরে কাউকে কোনো জিনিস দিই ছুড়ে ফেলে, কাছ থেকে হোক

বা একটু দূর থেকে। নমনীয়তার সঙ্গে তার হাতে দিই না বা পাশেও রাখি না। অপরদিকে, অন্য কেউ আমাদেরকে ভালো মনে করে আন্তরিকভাবে কোনো জিনিস দিলে সেটা রাখতে বলি বা হাতে নিয়ে অবজ্ঞা ভরে পাশে ছুড়ে রাখি। দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে এই আচরণ অশোভন। এটা কী ইঙ্গিত করে? অনীহা, হিংসা, ঘৃণা, চাপা আক্রোশ, বেয়াদবি, বিতৃষ্ণা, রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি। এসব আচরণ, চাপা হলেও বেশ ক্ষতিকর। এভাবে কাউকে কিছু দিলে বা কারও কাছ থেকে কিছু নিলে অপর পক্ষ অপমান বোধ করেন। মনে কষ্ট পান। দাতা বা গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার অবনতি ঘটতে পারে। ওই আহত ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মনে মনে এই উপেক্ষার অপমান পুষে রেখে, সুযোগ পেলেই তার জিঘাংসা চরিতার্থ করতে পারেন নিষ্ঠুরভাবে।

আবার, অন্যভাবে এই দেয়া-নেয়ার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিলেন তিনি দাতা, তার কাছ থেকে ওই জিনিস কমে গেল। এমন অনীহ দেয়ার ফলে ওই গ্রহীতার কাছে তার সম্মানও কমে গেল। অর্থাৎ, এরূপ দেয়ার ফলে সম্মানও কমে, আবার জিনিসটাও কমে যায়। এভাবে একতরফা দিলে ভাণ্ডার কমতে থাকবে এবং নিজের জন্য কিছু থাকবে না। অর্থাৎ, হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার স্বতঃসিদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত ডেবিট-ক্রেডিট, যে হিসাবে থাকে না, সেই হিসাব কখনও মেলে না। কিন্তু হিসাব যে আমাদের মেলাতেই হবে। সৃষ্টিকর্তা তো সে জন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে বানিয়েছেন তার শ্রেষ্ঠ মাখলুকাত হিসেবে। সবকিছুরই হিসাব হবে। হিসাব নিতে হবে, হিসাব দিতে হবে। মানুষের ব্যবহারের হিসাবে এই গরমিলের জন্য সমাজে অনেক অঘটন ঘটে। যেমন, চাকরের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে সে মনে কষ্ট পায়, সে সেই কষ্ট মনে পুষে রাখে। এভাবে পুঞ্জীভূত আক্রোশ দানা বেঁধে কখনও কখনও ক্ষোভ, ঘৃণা, আত্মহত্যা, জিঘাংসার মতো নারকীয় পরিণতিতে রূপ নেয়। তারপর কী হয়? আমরা মাঝেমধ্যে খবরের কাগজে বা টেলিভিশনে দেখতে পাই, নাবালক চাকরের হাতে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী খুন। এরূপ আচরণ সামাজিক অশান্তি এবং নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে থাকে। এমন দেয়া-নেয়ায় অসৌজন্যতার কারণে দাতা-গ্রহীতার পরিবারের মধ্যে অহেতুক কলহ বেধে যেতে পারে। তাই আসুন, আচরণে সংযত হই, ব্যবহারে বিনয়ী হই। এই সমাচারে পরিশেষে বলা যায়, কাউকে কোনো জিনিস দিতে গেলে বা কারও কাছ থেকে কিছু নিতে গেলে, ন্যূনতম শালীনতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। তাতে সব কূল বজায় থাকে।

২৩. সমঝোতা সমস্যা সমাধানের উপায়

সমঝোতার বিষয়টি সমাজ সংসারের সব ক্ষেত্রে সর্বদা অনুকূল কার্যকরী ভূমিকা রাখতে অদ্বিতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগে বলেছি, এবার একটু প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলি। নিজের অজান্তে, মানুষের মনে, অহরহ বিবিধ Sentiment বা চেতনার আগমন ঘটে। নিরিবিলি থাকলে এমনটি বেশি হয়। বসে আছেন দেশে, মনে হবে চলে গেছেন বিদেশে।

মনের পাসপোর্ট লাগে না, ভিসাও না। আবার, এয়ারপোর্ট বা কোনো বাহনও লাগে না। তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, না Custom না Security. মনের গতি ক্ষীপ্রতম।

আবার, ভুল ভাবনা বা অনুভবের কারণে, সেকেন্ডে আপনার মনে প্রলয়ংকরী ঝড় বা যুদ্ধও বেধে যেতে পারে। মনের প্রতিক্রিয়াই এ ধরনের যুদ্ধ বাধাতে যথেষ্ট। আপনি যদি কাউকে মনে মনে খারাপ ভাবেন, কাউকে শত্রু মনে করেন, তার ভালো আচরণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন; আপনার প্রতিও তিনি তদ্রূপ করবেন, যাকে বলে 'টেলিপ্যাথি'। এ ধরনের শত্রু মনোভাব সংঘাতের মতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, ঘটিয়ে থাকে। তাই বলি, মন একটা রণাঙ্গন। চিন্তা সেই রণাঙ্গনের সিপাহি। মনে যুদ্ধ বাধে খারাপ বা অসুস্থ চিন্তার কারণে। উর্বর মস্তিষ্কের, উষ্ণ স্নায়ুর চঞ্চল গতির কারণে। আবার পরে যুদ্ধ এমনিতেই থেমে যেতে পারে, যখন মন স্থির হয়। এ কারণেই তো, একই বিষয়ের ওপর একই মানুষ কখনও নমনীয়, আবার কখনও কঠোর হয়ে উঠতে পারে। এমনকি মারমুখী যুদ্ধংদেহী হয়ে বিপুল বিভ্রাট এবং অশান্তি ঘটিয়ে ফেলতে পারে। সেই মানুষ দুর্ঘটনার ক্ষতিকর ফল দেখে আফসোস করে, অনুতাপ করে। ভাবে, এটা না করলেও চলত। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, হয়তো ক্ষতিও হয়ে যায় অনেক বেশি, সম্পর্ক নষ্ট হয়। তখন উভয় পক্ষই স্ব-স্ব অবস্থানে Stand নিয়ে বসে। প্রচণ্ড আবেগের প্রবল অশুভ চাপে বিবেক পরাভূত হয়। এমন পরিস্থিতি হয় শুধু নিজেকে বড় ভাবার জন্য, অর্থাৎ, অহমিকার কারণে হামবড়া ভাবের ফলে। বলা যায়, Superiority Complexity, অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় ভাবার মতো সংকীর্ণ মানসিকতা থেকেই এরূপ হয়। এতে ক্ষণিক সান্ত্বনা হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তা ভ্রান্ত। যাকে বলে ভ্রান্তিবিলাস। এ কারণেই সমাজে হিংসা, প্রতিহিংসা বাড়ে, অনাচার হয়। এটার অপর নাম ধ্বংসপতন। প্রবাদে বলে, **অহংকার পতনের মূল।** আসুন, অহংকার পরিহার করে সহজ হই, সাবলীল বলি, স্বচ্ছ চলি, বিবাদ এড়িয়ে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করি। অতঃপর ভালো থাকি।

২৪. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে

এতদিন চিরন্তন এই প্রবাদটি শুনে এসেছি, **সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।** একথা সত্য। পক্ষান্তরে এটাও অসত্য নয়, সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণেও। দেখা যাক, কী করে এরূপ হয়। একবার লেখক সস্ত্রীক বিদেশে তার আত্মীয়ের বাসায় ক'দিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাদের দুটি সন্তান। অতিথিসহ সকলের রাতের খাবারের সব আয়োজন টেবিলে প্রস্তুত। তাই গৃহকর্ত্রী খাওয়ার জন্য সবাইকে টেবিলে যেতে বললেন। লেখক-মেহমান অভ্যাসগতভাবে অন্য সবার উপস্থিতিতে, কিছুটা শিষ্টাচার ভেঙে, প্রথমেই নিজের প্লেটে খাবার উঠিয়ে নিতে যাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, তিনি তরকারি দিয়ে ভাত খান, ভাত দিয়ে তরকারি নয়, অর্থাৎ ভাত কম খান। কার্বহাইড্রেট বেশি খেলে শরীর বাড়ে, তাই। এই কারণে তরকারিই প্রথম ওঠাতে যাচ্ছিলেন তিনি প্লেটে। এমন সময় গৃহকর্ত্রী মহিলা জিভ কেটে বললেন, এই যা! ভাত তো রাধা হয়নি। একটু অপেক্ষা করুন। লেখক-অতিথি যা ভাবলেন তা তো ভাবলেনই। নিজের বাড়ি হলে কী করতেন তা তিনিই জানেন। যাহোক Rice Cooker-এ ভাত হতে বেশি সময় লাগল না। কিন্তু আশ্চর্য, ওই মহিলার উদার স্বামী কী করলেন, শুনে অবাক হবেন। বললেন, ও (তার স্ত্রী) মাঝেমধ্যে এমন ভুল করে বসে। অতঃপর অপেক্ষার বিকল্প আর কিছুই রইল না। অপেক্ষাই করতে হলো সবাইকে। অনেকের মনে হতে পারে, মেহমানের সামনে বলে হয়তো ওই গৃহকর্তা সামলে নিলেন, তার স্ত্রীকে কিছু বললেন না। কিন্তু তা নয়। প্রকৃতই তিনি একজন ঈমানদার মানুষ, ভালো স্বামী। সমঝোতা মনোভাবাপন্ন অসাধারণ পুরুষ বা অভিভাবক।

এই ঘটনা লেখককে একটা দারুণ শিক্ষা দিল। কী শিক্ষা? অনুপম ধৈর্যের শিক্ষা। ধৈর্য মানুষকে এবং তার পরিবেশকে সুস্থ রাখতে অদ্বিতীয় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এটা সবার মধ্যে থাকা উচিত, নিজের প্রয়োজনে, অন্যের প্রয়োজনেও। কখনও খুটিনাটি বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে এমনকি বাইরের মানুষের সঙ্গেও ঝগড়া-ফ্যাসাদ করা উচিত নয়। এভাবেই মানুষের চরিত্র গঠন হয়। সন্তানরা ভালো শেখে। এর ফলে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে জাতি, জাতি থেকে দেশ, দেশ থেকে পৃথিবীর মানুষ শেখে, উপকার পায়।

আসুন আমরা পুরুষ শাসিত সমাজের কুশাসন, অর্থাৎ স্ত্রীকে বিব্রত করা, শাসন বা অখুশি করার বদাভ্যাস (যদি থাকে) পরিহার করি। তার মন বুঝি। ভালো ব্যবহার দিয়ে, তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তার পিত্রালয়ের (বাপের বাড়ির) কথা ভুলিয়ে দিই। যেসব পুরুষ বুদ্ধি, বিদ্যা, শিক্ষা এবং গুণে খাটো তারা

বাইরে কোথাও তেমন পাত্তা পায় না। সেখানে তারা ভেজা বেড়ালের মতো থাকে, তারাই বাসায় এসে বাঘ বনে যায়। পুরুষত্ব জাহির করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে বাইরের ওই ঘাটতি পূরণ করে থাকে। বস্তুত, এগুলো নিছক ভণ্ডামি আর নষ্টামি ছাড়া কিছু নয়। কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয়। আসুন, সৃজনশীল হয়ে সহধর্মিণীদের সহমর্মিতা দিই, বিনিময়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালোবাসা পাই। সুখের সংসার গড়ি, শান্তিতে থাকি। সমঝোতা করে চলি। সহমর্মিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করি। এরূপ চললে সংসার সুখের হয় - শুধু রমণীর গুণে নয়, পুরুষের গুণেও - এই কথাটি ভুল নয়, তা প্রমাণ করি পুরুষ জাতির স্বার্থে।

২৫. গৃহপরিচারিকা সমাচার

বিষয়টি স্পর্শকাতর। কাজের লোক বা গৃহপরিচারিকাদের নিয়ে দেশে অহরহ অনেক দুঃখজনক কাহিনী মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ জানছে। খবর পড়ে বা টিভিতে দেখে কেউ কেউ গৃহপরিচারিকার দোষ দিচ্ছে, কেউবা মনিবের। দু'এক দিন পেপারে আসছে, মানুষ মনে রাখছে। আহা-উহু করছে। পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সবাই ভুলে যাচ্ছে। এভাবেই চলছে, চলে আসছে এসব কাহিনীর পরম্পরা। বিচার হচ্ছে না বা এই অশুভ অভিশম্পাতের উপশম হচ্ছে না– একথা বলা যাবে না। বিচার বলতে আমি এখানে বোঝাতে চাচ্ছি প্রশাসনিক বিচার। বিচার অবশ্যই হচ্ছে। বিচার না হলে আলোচিত দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যেত নাকি? কারণ, লোকসংখ্যা তো দিন দিন বাড়ছেই। ক্রাইমও বাড়ছে। ক্রাইমের বিরুদ্ধে বিচার হচ্ছে না, হয় না বললে পুলিশকে বা প্রশাসনকে অপবাদ দেয়া হবে। পুলিশ দিন-রাত কষ্ট করে এত কাজ করছে, তার পরও বদনাম। আসলে পুলিশের সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে হয়তো এসব অপবাদ আসছে।

উপনিবেশবাদের সুবাদে এদেশে চাকর বা দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তখন দাস-দাসী হিসেবে মানুষ কেনা-বেচা হতো। কিনে নিত বলে মনিবরা তাদের ওপর কী অকথ্য নির্যাতনই না চালাত! ওই আমলেও ব্রিটিশরা হল্যান্ডের রটারডাম বন্দরে, নিজের মাল নিজে মাথায় টেনে জাহাজে লোড করত, কিন্তু সেই মালের সঙ্গে বোম্বে (বর্তমান নাম মুম্বাই) পোর্টে পৌঁছে তারা তাদের মালামাল আমাদের অর্থাৎ গরিব অশিক্ষিত ভারতীয়দের মাথায় উঠিয়ে দিয়ে বেত হাতে আমাদেরকে Nevigate করত। তাদের ক্লাবে Dogs & Indians are not allowed লেখা সাইন বোর্ড ঝোলানো থাকত। এই বৈষম্যের শিকার হয়েও তাদেরকে তোষামোদি করত, কিছু চাটুকার Native। জমিদারির লোভে, খেতাবের আশায়, পরগনার

প্রলোভনে তাদের খেদমত করত। তাদের দেখাদেখি, নিজেদের বাসায় অপেক্ষাকৃত গরিব মানুষদের কাজের লোক হিসেবে রাখত। চাকর কেনা-বেচার প্রথা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হলেও বাসায় গৃহপরিচারিকা বা পরিচারক রাখা থামেনি আজও। তবে ইদানীং কাজের লোক কম পাওয়া যাচ্ছে, গার্মেন্টস্ এর কাজে অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ এবং স্বাধীনতা থাকার ফলে। ব্রিটিশরা বিতাড়িত হয়েছে প্রায় ৬৭ বছর আগে, কিন্তু রেখে গেছে তাদের নিকৃষ্ট সেই অমানবিক প্রথা, যা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপসংস্কৃতি হিসেবে ঢুকে পড়েছে এবং আমরা এখনও ওই ধারাকে আমাদের মেকি সম্ভ্রান্তি দিয়ে, পরিচর্যা দিয়ে লালন করে চলেছি।

তৎকালীন রাজা-জমিদারদের মতো, আমরা এখনও নিজেদের ঘরের কাজ নিজেরা করি না। ঘরের কাজ করানোর জন্য পরিচারক এবং পরিচারিকা রাখছি, কিছুটা প্রয়োজনীয় হলেও বাকিটা স্ট্যাটাস দেখানোর জন্য। সনাতন কালের দাসী-বান্দীদের মতো তাদেরকে দিনরাত খাটাচ্ছি। কাজ না শিখিয়ে বা শিখতে সময় না দিয়ে প্রথম দিন থেকেই তাদের কাছে পুরনো এবং অভিজ্ঞ কাজের লোকের মতো দক্ষ সার্ভিস আশা করছি। অনেক সময় তাদেরকে ন্যায্য পাওনাটুকু দিচ্ছি না। তেমন সুযোগ-সুবিধাও দিচ্ছি না। বিশ্রাম করতে সময় দিচ্ছি না, ছুটি তো দিচ্ছিই না (যদিও সরকারি-বেসরকারি সব চাকরিতে ছুটি আছে)। ঠিকমতো খেতেও দিচ্ছি না। বেতন চাইলেই তা মুখে মুখে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের উচ্চ-বাচ্যকে থামিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু নগদে তেমন নয়। এতে হয়তো কখনও কখনও কেউ কেউ প্রতিবাদ করছে। কথার কড়া জবাব দিচ্ছে। বাকস্বাধীনতার অধিকারে তারা জবাব দিলেও আমরা অপমান বোধ করছি। তখন তাদেরকে অসভ্য বলছি, বিদ্রোহী নাম দিচ্ছি এবং এই বিদ্রোহ দমনের জন্য মারধর করছি। তাদের শরীরে আগুনের ছেঁকা দিচ্ছি। অনেক সময়, কিশোরী ও যুবতী গৃহপরিচারিকারা পাশবিক দৈহিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গৃহকর্তা বা গৃহে থাকা অন্য আত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে কেউ কেউ কখনও কখনও আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কত যে কাহিনী আমাদের সমাজের আনাচে-কানাচে নিয়ত ঘটছে, তার কটার খবরইবা আমরা রাখি? আসলে আমাদের সমাজের জন্য এটা একটা দুঃসহ বেদনাদায়ক দুর্বিপাক; যদিও সমাজের অধিকাংশ মানুষ এখনও ভালো আছে। তবুও এ ধরনের অমানবিক কাহিনীর তেমন কোনো প্রতিকার হচ্ছে না, প্রতিরোধও না। তাই তো, এমন ঘটনা প্রায়ই খবরে প্রকাশ হতে দেখা যাচ্ছে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সপক্ষে একটা উপমা দেয়া যায়। একবার এক বাসায় এক কিশোর কাজ করত। সে ভালোমতো খেতে পেত না। নাশতার বদলে তাকে প্রায়ই টোস্ট বিস্কুট দেয়া হতো। তাও অপর্যাপ্ত। তার উঠতি বয়সের বাড়ন্ত শরীর। দেহের প্রয়োজন মেটাতে কি অতটুকু খাবারে হয়? ক্ষুধার কষ্ট তাকে দারুণভাবে পীড়া দিত। সে কখনও কখনও কাতর হয়ে যেত। তাই তাকে যখন

বাজারে পাঠানো হতো, তখন বাজারে গিয়ে প্রতিদিন প্রথমে সে কিছু সময় ধরে আবোল তাবোল নেচে-গেয়ে যে দু'চার পয়সা কামাত, তা দিয়ে ডালপুরি খেয়ে পরে বাজার থেকে পড়ে থাকা জিনিস কিনে বাসায় ফিরত। কারণ, ভালো জিনিস তো আগেই বিক্রি হয়ে যায়। সে নাচ-গান জানত না। তার ওই অপটু নাচ দিয়েই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে দু'চার পয়সা কামাত, জঠরের জ্বালা নেভাতে। হিসাব ভালোমতো জানত না বলে সে বাজারের পয়সাও মারতে পারত না। যাহোক, বাজার থেকে ফিরতে দেরি হওয়া এবং অপেক্ষাকৃত খারাপ জিনিস আনার কারণে সে প্রায় রোজই মার খেত, বকুনি তো আছেই। তারপর তাকে কখনও কখনও ছোট ছোট ২টা রুটি দিয়ে নাশতা দেয়া হতো, তাও প্রায় বেলা ১২টার দিকে। একদিন সে উঠানে বসে খাওয়ার আগে ওই রুটি সামনে ঘুরাচ্ছে আর গভীরভাবে রুটির দিকে তাকিয়ে তোতলা তোতলা কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে চাপা সুরে বলছে, লুটির ছাইজ আস্তে আস্তে ডালপুরির মতো হয়্যা যাচ্ছে। কথাটি শুনে বাসার লোকেরা বাহ্যত হাসলেও কেউ কেউ মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। বিশেষ করে যিনি তাকে শাসনে রাখতেন বেশি। কথাটা একদিন আমার কানেও এল। আমি তার ওই কথার মধ্যে একটি গভীর দর্শন দেখতে পেলাম। তাই কথাটিকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আমার মনে হলো, বিষয়টি আপাতত হাস্যকর হলেও এর ভেতরে একটা মারাত্মক রহস্য নিহিত আছে এবং তা হচ্ছে ক্ষুব্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ, ক্ষুধার অসহনীয় কষ্টের জিঘাংসু প্রতিজ্ঞা। তার ওই আপাত হাস্যকর ভাষ্য, প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে, ওই ছোট ২টি রুটিতে তার পেট ভরে না। আরও দাও। তোমরা পেট পুরে খাবে, আর আমি খাব না, তা হবে না, তা হবে না। কিন্তু কে শুনবে তার কথা, কে বুঝবে তার মনের ব্যথা। তার মতো অন্যরা তো আর খাওয়ার কষ্টে নেই।

আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে যদি একটু সমব্যাথী হয়ে তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করি, তাদেরকে মানুষ মনে করি এবং তার বয়সের আমাদের ছেলে-মেয়েদের মতো তাদেরকে সমভাবে দেখি, তাহলে এই নিষ্ঠুর এবং করুণ অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। মানুষের মধ্যে মানবিকতা, সহমর্মিতা জন্মাবে এবং এভাবেই এরূপ নির্মম আচরণ বন্ধ হবে। যত তাড়াতাড়ি এই পরিবর্তন হয়, ততই মঙ্গল। তা না হলে ওইসব চাকর গোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ঘনীভূত হয়ে একদিন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো বিস্ফোরণ ঘটাবে যার ফলে আরও কত গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী যে তাদের নির্মম প্রতিশোধের শিকার হবে, তা কে জানে? আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

এই অনুশীলন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। যেমন, নিজের কাজ নিজে করব (বিদেশিদের মতো)। গৃহপরিচারিকা রাখব না। রাখলে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করব, নির্দয় হব না। কাজের মানুষরাও তাদের নিজেদের ওজন, মূল্য এবং সীমারেখা বুঝবে। অন্যায় আবদার করবে না, বেয়াদবি করবে না,

ভালো থাকবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, আমরা মানবিক হলেই যে এসব জাতীয় সমস্যার পূর্ণ সমাধান একসঙ্গে হয়ে যাবে, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই যদি হতো, তাহলে মানুষের মধ্যে শয়তানের আচরণ বিচরণ ও প্রভাব বন্ধ হয়ে যেত। দেশে আইন লাগত না। থানা, পুলিশ এবং আদালতের প্রয়োজন পড়ত না। এ সবই সৃষ্টির রহস্য। এভাবেই আল্লাহ পাক তার সব মাখলুকাতকে পরিচালনা করে থাকেন, তারই সৃষ্টি করা স্বয়ংক্রিয় অবিরাম পদ্ধতির সাহায্যে।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শুধু সুবচন নয়, নীতিকথা নয়, আইনের কঠোরতাও মানবিকতা সৃষ্টি করতে বা ফিরিয়ে আনতে বা প্রতিষ্ঠা করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ, বিদেশের বিশেষ করে উন্নত দেশের মানুষেরা সভ্য হয়ে থাকে যতটুকু না মানবিকতার কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে শুধু আইনের কঠোর শাসনের ভয়ে। আমরা কি পারি না এরূপ করতে? এখন না পারলেও একদিন পারব, পারতে আমাদের হবেই। মানুষকে মানুষ ভাবব। ছোট-বড়র মধ্যকার নিষ্ঠুর এবং হীন ব্যবধান ভুলে যার যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু পালন করব, যতটুকু ন্যায্য পাওনা ততটুকু তাকে দেব। লোভ করব না, হিংসা পরিহার করব।

২৬. হীনম্মন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা

নিরাপত্তাহীন মানুষ মানসিকভাবে পঙ্গু মানুষের চেয়ে অধম। কারণ, পঙ্গু মানুষের সেবাশুশ্রূষার, চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে সে মানসিকভাবে অনেক সবল থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, অনেক পঙ্গু বা চলাচলে অসমর্থ মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে চলে, বলে ও করে খায়। বিদেশে তো অনেক বেশি দেখা যায়। সেখানে ব্যাংকের শাখা খুলতে গেলে Disable-দের জন্য উপযোগী কাউন্টার না করলে লাইসেন্স পাওয়া যায় না। দেশেও এরূপ করা হলে ওইসব মানুষ স্বাধীনভাবে চলে, খুশি থেকে, স্বনির্ভর হয়ে, করে খেতে পারবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়াও আদায় করবে।

অপরদিকে, সবল-সক্ষম মানুষ যখন স্বার্থপরতার মোহে অন্ধ হয়ে নিজেকে বড় ভাবে, এমনকি পজিশনেও বড় হয়ে যায়, তখন তার মনে অযথা অহমিকা আসে। তিনি সবকিছুতেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব খোঁজেন; অনেক সময় তা দাবিও করে বসেন। তার অধস্তন বা অনুজ যদি মেধা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং জ্ঞান-গরিমায় তার চেয়ে ভালো হয়, (হতেও পারে কারণ আল্লাহ্‌তালা সবাইকে সমান করে বানাননি), তখন তিনি তার ওই মেধাবী অধস্তনকে মেনে নিতে পারেন না। তিনি মনে করেন, অনুজকে মূল্যায়ন করলে তিনি ছোট হয়ে যাবেন। এটা হয় হীনম্মন্যতার কারণে অথবা দক্ষতা-পুষ্টির অভাবের কারণে অথবা তার নির্বোধ নিরাপত্তাহীনতার পঙ্গু ভাবনার কারণে। এই হীনম্মন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা ওই

অগ্রজ বা ঊর্ধ্বতনকে হিংস্র বানায়। তিনি তার অনুজ বা অধস্তনকে সহ্য করতে পারেন না। নানাভাবে Humiliate করে চলেন তার দাফতরিক ক্ষমতার জোরে। অবশ্য এটাকে ক্ষমতার ব্যবহার নয়, অপব্যবহার বলা যায়। যাহোক, এর ফলে অফিসের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিগড়ে যায়, তাতে উভয়ের ক্ষতি হয়। কারও ভালো হয় না। এই ক্ষতি এড়াতে ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন উভয়েরই বিশেষ করণীয় আছে।

যেমন, অধস্তনকে তার ঊর্ধ্বতন বা অগ্রজকে গুরু ভাবতে হবে, মানতে হবে এই ভেবে যে, তার বড় অবস্থান শুধু তার জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার জন্যই নয়, সিনিয়রিটির জন্যও। কারণ, বয়স বা সিনিয়রিটি একটা বড় উপাদান এবং সেটাকে একেবারে উপেক্ষা করা যাবে না, Merit যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন। অধস্তনরা গুণে ভালো হলে এবং মেধায় চৌকস হলে সেই গরিমায় নিজেকে বড় ভেবে বসের সঙ্গে টেক্কা দেয়ার মনোভাব নিয়ে চলা উচিত নয়। বস অভিজ্ঞতায় উঁচু, বয়সে বড়, পিতার সমতুল্য। শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান এবং বুদ্ধিতে পুত্রের চেয়ে কম হলেও পিতাকে যেমন বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণে সম্মান বা ইজ্জত দিতে হয়, তেমনি অফিসের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। এই ধারা টিকে না থাকলে, অনুজ যখন অগ্রজ হবেন, তখন তিনি ইজ্জত পাবেন না। ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। বিষয়টি এরূপ যে, **এই দিন দিন নয় আরও দিন আছে, এই দিন নিয়ে যাবে সেই দিনের কাছে।**

অপরদিকে, অনুজকে আস্থায় নিলে সহমর্মিতা বাড়ে এবং তাকে স্নেহ দিলে বা তার মেধার মূল্যায়ন করলে অর্থাৎ তাকে গুরুত্ব দিলে তিনি কাজে আরও মনোযোগী হবেন, বসকেও শ্রদ্ধা করবেন। তাই আমাদের উচিত হবে, অফিসকে নিজের মনে করে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা এবং তার বিনিময়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা। অগ্রজও তাতে শান্তি পাবেন। দফতর চালানো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং অফিস ভালো চলার প্রশংসা তিনিই পাবেন। এতে অগ্রজ অনুজ এবং প্রতিষ্ঠান সকলেরই মঙ্গল হবে। তাই ঊর্ধ্বতনের দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্য ধরে, হীনম্মন্যতা পরিহার করে, Ego Management-এর সাহায্যে কৌশলী মনোভাব নিয়ে চলা। অনুজদের কর্তব্য হচ্ছে, নিঃশর্তভাবে অগ্রজকে মান্য করা, সহযোগিতা করা।

অন্যভাবেও বলা যায়, উর্ধ্বতনকে মনে রাখতে হবে, **আগুন কখনও ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না।** গুণীর গুণ একসময় প্রকাশ হবেই। এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারলেই বস বা ঊর্ধ্বতন নিরাপদ থাকবেন। অধস্তনও অখুশি থাকার অশান্তিতে ভুগবে না। যা আছে তাই নিয়ে খুশি হতে পারবে। যার গুণ আছে সে ওপরে উঠবেই।

অপরদিকে, অধস্তনকে তার বিশেষ মেধা বা কিছু বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার পরিহার করতে হবে। বড়কে মর্যাদা দিতে হবে। ভাবতে হবে, মেধা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। মেধার কৃতিত্ব বা যশ মানুষের নয়, সৃষ্টিকর্তার। তাই এটার জন্য অহংকার বা বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এতে সৃষ্টিকর্তা নারাজ হবেন। মেধাবী অধস্তনও নানা অশান্তিতে পড়বেন। এরূপ না ভাবলে তিনিও সুস্থ থাকবেন, শান্তি পাবেন। কারণ, অপেক্ষাকৃত কম জ্যেষ্ঠ অথচ মেধাবী লোক তো ওপরে উঠবেই। He got a long way to go. তাই এত তাড়াতাড়ি কেন, বাড়াবাড়ি কেন? আবারও বলি, পিতা, মাতা, ভাই, বোন অশিক্ষিত হলেও তাদেরকে উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা মহাপাপ। পক্ষান্তরে, তারা যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, তাদেরকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারাটাই কৃতিত্ব এবং মহত্ত্ব। এই কৃতিত্বের দাবিদার হওয়ার জন্য সব মানুষের উচিত সংযত থাকা, অপেক্ষা করা সময়ের জন্য। উদার এবং নিরহংকার হলেই এটা করা সম্ভব।

২৭. শক্তের ভক্ত নরমের যম

যারা সৎ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তাদের কাছে মানুষ নরম হয়ে থাকে, তাদেরকে ভয় করে চলে। অপরদিকে, যারা অসৎ এবং ব্যক্তিত্বহীন, তাদেরকে সবাই গরম দেখায়, বিরক্ত করে, খোঁচা মারে– এটাই নিয়ম। কোনো মানুষ যদি চিন্তা-চেতনা, নীতিবোধে নিরপেক্ষ হন, নিজের স্বার্থ ভুলে অপরের কল্যাণের জন্য না হলেও অসুবিধার কথা ভাবেন, তাহলে তিনি সিদ্ধান্তে কঠোর এবং অনমনীয় হতে পারেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আবেগ তার কাছে প্রশ্রয় পায় না। ভয় তার কাছে ভিড়তে ভয় পায়। বিবেক তখন তাকে পরিচালিত করে বা করতে পারে। এভাবে চলা অর্থাৎ ভালো নীতি এবং কাজে কঠোর ও অনমনীয় অথচ বিনয়ী হয়ে চলা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয়। কঠিন হলেও সংসারে, দফতরে, সমাজে ইত্যাদি সব জায়গায়ই চরিত্রের দৃঢ়তা প্রয়োজন। সৎ এবং নিরপেক্ষ হয়ে চলতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা সইতে হয় এবং বিপদ মোকাবেলা করতে হয়। এতে নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার ঝুঁকিও বাড়ে। তাই পরিবারের সদস্যরা গৃহকর্তাকে প্রতিবাদী হতে বারণ করে। কারণ, তার (পরিবারের কর্তার) কিছু হয়ে গেলে ক্ষতি তো পরিবারের লোকদেরই হবে। সন্তানেরা পিতা হারাবেন, স্বামী হারিয়ে বিধবা হবেন স্ত্রী, মা-বাবা ছেলে হারা হবেন। তথাপিও বলি, ধৈর্য ধরে, সহ্য করে, সময় নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করলে বিপদমুক্ত থেকে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া এবং অনমনীয়ভাবে তা কায়েম করা সম্ভব। তবে বিধি বাম হলে, নিয়তিতে কষ্ট লেখা থাকলে এবং তা অখণ্ডনীয় হলে কপালের সেই দুর্ভোগ খণ্ডন করা যাবে না। এরূপ দুর্ভোগের কাহিনী বিরল নয়। তবে তার প্রচার কম। তাই

মানুষ জানতে পারে না তেমন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা, জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া অভাগাদের খবর কেইবা রাখে। তাই তো মানুষ ঝামেলাকে অর্থাৎ নিপীড়নকে ভয় পায়। বিপরীতে ঝুঁকি নিতে পিছপা হয়। অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয় না, নিষ্ক্রিয়ভাবে হাত মেলায়। হয়ে যায় **শক্তের ভক্ত নরমের যম।**

উপরোল্লিখিত বক্তব্য আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগত ইগো থাকে। সেই ইগোর কারণে সে একটাতে হার্‌লে অন্যটাতে জিততে চায়। তাই তার পুরুষত্ব বা নারীত্ব ক্ষমতা দেখায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলের ওপর। তখন তিনি হয়ে যান **নরমের যম**। এভাবেই শক্তের ভক্ত নরমের যম কথাটি প্রভাব বিস্তার করে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' অর্থাৎ নীতিতে Flexible হওয়া উচিত নয়। ভালো নীতিতে অটল, বিশ্বাসে অদম্য হলে জয় অবশ্যম্ভাবী। দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে। মানুষ যখন কারও অনমনীয় প্রকৃতি সম্পর্কে এবং তার ন্যায়নীতির কঠোরতা সম্পর্কে জেনে যায়, তখন তার সামনে কোনো অযৌক্তিক বা দুর্বল আবদার নিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায়, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। এই দর্শন বাস্তব। এটা মানতে পারলে মানুষের মধ্যে চরিত্র গঠনের আগ্রহ জাগবে। মনে মন্দ পরিহার করার দৃঢ়তা এবং কঠোরতা সৃষ্টি হবে, ভালোর প্রতিযোগিতা শুরু হবে, পরিবেশ-সমাজ সুস্থ হবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে একটি অকাট্য উপমা না দিয়ে পারা গেল না। ধরা যাক, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো ব্যক্তি কাজে নয়, তদবিরে পটু। অর্থাৎ Great Lobbyist। তিনি পদোন্নতি নেবেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট Cost- Benefit হিসাব করে দেখলেন, ওই কর্মীর আউটপুট পর্যাপ্ত নয়। অর্থাৎ তিনি পর্যাপ্ত বা আশানুরূপ কাজ দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষ তার পদোন্নতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হেরে যাওয়া ওই কর্মকর্তা তখন নিজেকে পরিবর্তনের অর্থাৎ ভালো কর্মশক্তিতে রূপান্তর করার সৎ প্রয়াস বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পরিবর্তে তার অসৎ তদবিরের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিলেন। যত দিক দিয়ে সম্ভব, তার সপক্ষে সিদ্ধান্ত সুসংহত করার মাধ্যমে নিজের দাবিকে পরাক্রমশালী করে প্রতিষ্ঠানের ওপর অবৈধ হলেও তীব্র চাপ সৃষ্টি করলেন। প্রতিষ্ঠান বেসরকারি হলেও সমাজ বহির্ভূত নয়। তাই শীর্ষ কর্তাব্যক্তি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবে, তথা তার জীবন এবং অবস্থানের আশঙ্কিত ক্ষতির কথা চিন্তা করে, ওই অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য কর্মকর্তার পর্বত-প্রমাণ অবৈধ চাপের কাছে নত হয়ে তার অযৌক্তিক, অনৈতিক এবং cost-ineffective দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অর্থাৎ বসের অনড় থাকার নীতি হেরে গেল, প্রতিষ্ঠানের সততা এবং নিরপেক্ষতার পরাজয় হলো। অপরপক্ষে, কর্মকর্তার অসৎ চাওয়ার জয় হলো। অর্থাৎ, অসত্যের জয়, সত্যের ক্ষয় হলো। তিনি পদোন্নতি ও অধিক সুযোগ-সুবিধা পেলেন। এতে কি হলো দেখা যাক। প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ অশুভ এবং

অস্পৃশ্য তৎপরতার বীজ রোপিত হলো। চারাগাছের মতো এটি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। অন্যভাবে বলা যায়, তদবিরের সংক্রমণ ছড়িয়ে গেল প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কারণ, প্রতিষ্ঠানের অন্য অনেক কর্মীও ধীরে ধীরে কর্ম-অনীহ হয়ে তদবিরকারকের দলে গেল। এতে ন্যায্য ও যোগ্য কর্মীর কর্মস্পৃহা কমে গেল। তাতে প্রতিষ্ঠানের অযথা ব্যয় বৃদ্ধি হয়ে আয়কে কমিয়ে দিল। কারণ ৫ জনের আয় ১০ জনের মধ্যে ভাগ হলো। যার মধ্যে ৫ জন সকর্মক এবং ৫ জন অকর্মক। সরকার ট্যাক্স কম পেল, মালিকরা ডিভিডেন্ড কম পেল, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বোনাস কমে গেল। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানে বন্ধ্যত্ব আসে। অবশেষে সবার চাকরি হারানোর পথ প্রশস্ত হয়। মুষ্টিমেয় ভালো কর্মীরা হয়তো অন্যত্র ব্যবস্থা করে নিতে পারেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের কী হবে?

এ বিষয়টি হয়তো অন্যভাবেও ম্যানেজ করা যায় বা যেত। যেমন, No work Full Pay নামে একটি ডিপার্টমেন্ট খুলে সেখানে ওই ধরনের দুর্নীতিবাজ, অপতৎপর এবং অদক্ষ লোকদের কেন্দ্রীভূত করার ঘোষণা দেয়া হলে তারা লোকলজ্জার ভয়ে তদবির বাদ দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পেতে পারে বা পারত। নিগৃহীত হওয়ার অপমান ও মানসিক যন্ত্রণা এড়াতে হয় তারা কর্মমুখী হওয়ার শেষ চেষ্টা করত, না হয় নিজেকে গুটিয়ে ফেলে চাকরি ছেড়ে যেত। কারণ, এটা Social Humiliation, যা কেউ চায় না। এতে 'ভালো' প্রতিষ্ঠা পেত, মন্দের ছন্দপতন হতো। Preventive Measure হিসেবে এই পদ্ধতি ভালো কাজ করতে পারে। তাই বলি, আসুন আমরা নিরপেক্ষ হই, স্বার্থপরতা ছাড়ি, কর্মতৎপর হই, তদবির বা চাপ বন্ধ করি। ধরাশায়ী করি, **শক্তের ভক্ত নরমের যম**-এর মতো মেরুদণ্ডহীন, শোচনীয় অপবাদের বাণীকে। ভালো লিডার হই এবং অপরদিকে, কর্মদুর্বল লোকদেরকে তাদের তদবিরবাজি ছেড়ে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির অনুপ্রেরণা জোগাই, বাধ্য করি ভালো হতে এবং থাকতে। মনে রাখতে হবে, বেকারত্বের মধ্যে নিজেদের চাকরি ধরে রাখাটা হবে আসল, উন্নতিটা অতিরিক্ত বা ফাও। আসুন, এই বুঝ সার্বজনীন করে কাজে লাগাই।

২৮. চাকরিতে কাজ বাছাবাছি

চাকরিতে ডিপার্টমেন্ট বা সেকশনের ভালো-মন্দের গুরুত্ব নির্ণয় করা, অবস্থানে ভেদাভেদ আনা, সব কাজকে সমভাবে প্রধান্য না দেয়া ইত্যাদি গর্হিত কাজ বা খারাপ অভ্যাস। মনের দৈন্যের কারণে এরূপ হয়। এই খারাপ কাজটি আমাদের Culture-এ ঢুকে জেঁকে বসেছে। দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হচ্ছে। ব্যাংকের চাকরিতে ঢোকার আগেই, প্রায় সবাই টার্গেট করে নেন, অমুক অর্থাৎ ফরেন এক্সচেঞ্জ বা ক্রেডিট বিভাগে বা সেকশনে কাজ করব। কারণ, সবাই

মনে করেন, ব্যাংকের চাকরির ক্ষেত্রে ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রেডিট এই দুই বিভাগ খুবই আকর্ষণীয়। যারা এরূপ করেন, তাদের সততা কম, ঈমান দুর্বল। তারা কাজের সঙ্গে সততার সম্পর্ক কী তা হয় জানে না, না হয় জেনে মানে না। জানলেও অসৎ লোভ তাদেরকে অন্ধ বানায় তথাকথিত ভালো ডিপার্টমেন্টে কাজ বাগিয়ে নেয়ার জন্য।

আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ব্যাংকে কাজ করার। সুদূর অতীত অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১ এপ্রিলে, তদানীন্তন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডে বেশ আকর্ষণীয় দ্বিতীয় গ্রেড অফিসার হিসেবে চাকরি শুরু করে, ২০০৪ সালের জুন পর্যন্ত সর্বশেষ সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসেবে অবসরে যাওয়া এবং এখন পর্যন্ত মার্কেন্টাইল ব্যাংকের সঙ্গে জড়িত (মোট ৭টি ব্যাংক) থাকার সুবাদে এই সুদীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর সময়ে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছি, সহকর্মীদের অনেকেই তাদের স্ব-স্ব পদস্থলের অবস্থানকে নিচু মনে করেন। এ কারণেই অনেক সময় অনেককে চাপা বিলাপ করতে শুনেছি যে, ক্রেডিট বা ফরেন এক্সচেঞ্জ বিভাগে কাজ করি না, আমরা গুরুত্বহীন অফিসার। তাই কী কাজ করব। আসি যাই, বেতন-সুবিধা পাই, কোনো মতে দিন কাটাই। এছাড়াও, ব্যাংকের অলিতে-গলিতে, আনাচে-কানাচে সর্বত্র এই একই আহাজারি- ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রেডিটই হচ্ছে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক স্থান। অন্য ডিপার্টমেন্টের কোনো মূল্য নেই। তাই অধিকাংশ কর্মীর টার্গেট, ব্যাংকের এই দুই বিভাগে বা সেকশনে কাজ করা। এরূপ ভাবনা অসৎ মনোভাবের পরিচয় দেয়।

একবার একটা মজার ঘটনা ঘটল। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিক্রুটমেন্ট কমিটির সদস্য হিসেবে চাকরি প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য ওই সময়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ ব্যাংকে যেতে হতো। আমাকে বহনকারী গাড়ির ড্রাইভার, অপেক্ষার সময়, নিচে আশপাশে ঘোরাফেরা করত। কখনও কখনও সে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের ফটকের সামনে সিঁড়ির ওপর বসত। প্রায় প্রতিদিনই ওই ড্রাইভার ইন্টারভিউ দিতে আসা প্রার্থীদের অনেককে বলতে শুনত যে, এমন জ্যাক ধরেছি, চাকরি তো হবেই, ফরেন এক্সচেঞ্জ বা ক্রেডিট ডিভিশনেই পোস্টিং নেব। ড্রাইভারের কাছ থেকে এই কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম। ভাবলাম, চাকরিতে ঢোকার আগেই কেউ যদি টার্গেট করে বসে, কোনো বিশেষ ডেস্কে কাজ করার জন্য তাহলে ব্যাংকের চাকরির সার্বিক মূল্যায়ন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! অধিকাংশ অফিসাররা অনুরূপভাবে চিন্তা করলে ব্যাংকের চাকরিতে বৈষম্য সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং সেই বৈষম্যই একদিন ব্যাংককে নিরাপত্তাহীন এবং অকার্যকর করবে। এই বৈষম্য ইতোমধ্যে দৃঢ়ভাবে সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় লোকের অপরিহার্যতার কারণে আজকাল ব্যাংকে জাল-জালিয়াতি ও আত্মসাতের মতো কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটছে এবং এতে সমাজে ব্যাংকারদের মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দিচ্ছে।

অথচ একসময় ব্যাংকাররা বিয়ের পাত্র হিসেবে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আর এখন? মুখ লুকিয়ে চলতে হচ্ছে। এর সমাধান আনতে হবে।

এখন দেখা যাক, কেন এমন হয়? যারা এমন ভাবে, তারা এর সপক্ষে সাধারণ যুক্তি দেখায়, এই দুই বিভাগে মানুষের সেবা করা যায় বেশি। কারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে বেশি। তাই সবারই ওই দিকে আগ্রহ বেশি। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কারণ, সাধারণ ব্যাংকিংয়ের লেজারে বা ক্যাশে অধিক মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের সুযোগ আরও বেশি। তাহলে জেনারেল ব্যাংকিং বিভাগ অপেক্ষা ক্রেডিট ও ফরেক্স– শুধু এই দুই বিভাগে পোস্টিং কেন, এটার চাহিদাইবা এত বেশি কেন? আসলে রহস্য কী বা কোথায়? রহস্য হয়তো একটা আছে। যারা এমন করতে চায় বা এমন করার জন্য ভাবে, তারা হয় অতি লোভী, চতুর, না হয় ধড়িবাজ। কারণ, ওই দুই বিভাগের কাজ অপেক্ষাকৃত সীমিত, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং সার্বক্ষণিক সজাগতা এবং তৎপরতামূলক। এই কাজ শিখলে সেই অফিসে বা শাখায় তার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। ফলে তার আর অন্যত্র বদলি হতে হয় না সহসা। তাদের বসেরা কম অভিজ্ঞ বা কম দক্ষ হলে তাকে নির্ভরশীল করে রাখা যায়। এ পরিস্থিতিতে ওই ধূর্ত ব্যক্তি, নিজের প্রয়োজনে এবং স্বার্থে অফিসের কাজ কুক্ষিগত করে, তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পরিচালনা করতে পারেন এবং সেই কাজ থেকে বৈধ ও অবৈধভাবে নানা রকম সুবিধা বা সুযোগ আদায় করে নিতে পারেন। সে কারণেই তারা অন্য কাউকে এই কাজ শিখতে সুযোগ দেন না। বরং এই কাজে Customer-কে অবৈধ সুযোগ দিয়ে বিনিময়ে নিজেও ফায়দা লুটেন। মক্কেল বিশেষ সুবিধা পেলে তা ব্যাংকের ওই অফিসারের সঙ্গে গোপনে শেয়ার করতে মোটেও পিছপা হবেন না, বরং আগ্রহীই হতে পারেন। কারণ তারা যে সুবিধা পাবেন, তার সামান্য কিছু অংশ ওই অফিসারকে দিলেই তিনি মহাখুশি হয়ে যেতে পারেন, এই যুক্তিতে যে প্রতিদিন গড়ে এমন দু'একটি কাজ করলে অফিসারেরও পুষিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ এটা তাদের বাড়তি আয়। তাই তখন সেই অফিসারদের পক্ষে ওই কাস্টমারের প্রতি অনুগত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এতে অবশ্যই ব্যাংকের ক্ষতি হয়। যুক্তি হিসেবে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞানের (Accounting) ডাবল্ এন্ট্রির তত্ত্ব অনুযায়ী, একজনের ডেবিট হলে অপরজনের ক্রেডিট হবে, হতেই হবে। আলোচিত ক্ষেত্রে ওই কর্মকর্তা এবং কাস্টমারের লাভ হলে ক্ষতি হবে ব্যাংকের। এক্ষেত্রে, ব্যাংক, রাষ্ট্র বা অর্থনীতির কী ক্ষতি হল সে বিষয়টি ওই অফিসারের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। অসততার মহামিলনের কারণে এরূপ হয়। সততা ও ন্যায়পরায়ণতা এখানে মার খায়। এই ক্ষেত্রে ওই কর্মকর্তাকে চতুর এজন্য বলা হয়েছে যে, সে ওই বিভাগের Technical কাজ শিখে নিজের অবস্থান ও মূল্য সুদৃঢ় করে। নিজের সুবিধামতো কাজ করে। কারণ ফরেন

এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের কাজ অপেক্ষাকৃত সীমিত। তাই সে জেনারেল ব্যাংকিং-এর অফিসারের তুলনায় কম কাজ করে, বেশি সুবিধা ভোগ করছে। আলোচিত দুই ডিপার্টমেন্টের (ফরেন এক্সচেঞ্জও ক্রেডিট) লোকদের অসততার দৃশ্যমান প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে এভাবে যে, তারা অন্যদের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এমনকি অন্য অনেক দিক দিয়ে ভালো থাকতে পারেন। তবে বিধি বাম হলে ধরাও খেয়ে যেতে পারেন। তাতেও তাদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। ওই অসৎ উপার্জনের টাকা দিয়েই তারা সব Odds ম্যানেজ করে ফেলেন। কীভাবে ম্যানেজ করতে পারেন, তা একবার দেখা যাক। খুব Simple। অনেক টাকা কামানোর পর ধরা পড়লে সেই টাকার বিনিয়োগ হতে মাসিক অর্জিত সুদের ১০-২০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট দফতরের ওই ফাইল সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের পেছনে খরচ করে অর্থাৎ তাদেরকে নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারেন। তাহলে ফাইল নড়বে না। মূল টাকা ধরা থাকবে। তাছাড়া, অর্জিত সুদের ৮০ শতাংশ তার পুঁজি বৃদ্ধি করে। এভাবেই সে Unbeaten Champion হয়ে, সবার সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলতে পারে। কেউ তাকে ধরতে পারে না, Disturb-ও করে না।

এই ভয়াবহ অবস্থা ভাঙতে হলে Proper Selection-এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিসারকে উপযোগী ট্রেনিং দিয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ এবং ক্রেডিটের এরিয়ায় কাজ করার জন্য তৈরি করতে হবে এবং তাদেরকে নিয়মিত ঘন ঘন Job Rotation-এর মাধ্যমে Rolling-এ রাখতে হবে। এক চেয়ারে বা একই কাজে কাউকে বেশি দিন রাখা যাবে না। তাদের কাজের প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃত অনিয়ম ধরা পড়লে তাদেরকে উল্লেখযোগ্য শাস্তি দিতে হবে। তাহলেই তারা ভয়ে হলেও কিছুটা সৎ থাকতে বাধ্য হবে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে না পারলে অপকর্ম করতে পারবে না। প্ল্যান করতে করতেই তার সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।

২৯. গাধার পিঠে ঘোড়ার জিন

'গাধার পিঠে ঘোড়ার জিন' কথাটা অবান্তর মনে হলেও কৌতূহল উদ্দীপক বটে। এ বিষয়টি সামনে আনার কারণে বক্তার বা লেখকের সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা বিরক্তি আসা অস্বাভাবিক নয়। মাফ করবেন, পাঠকের বিরক্তি সৃষ্টির জন্য এখানে কথাটির অবতারণা করা হয়নি। এর ভেতর একটা তাৎপর্যপূর্ণ মেসেজ আছে। একটু ভেঙে বললেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি। যেমন, আমাদের সমাজে সবার চোখের সামনে অহরহ এরূপ অবান্তর ঘটনা ঘটছে, ঘটেই চলেছে। এটা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই এই প্রবাদটির বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী, নিজের যোগ্যতা না থাকলেও ঢং-ঢাং পাল্টে জোর চেষ্টা-তদবিরের

মাধ্যমে ফায়দা লুটতে চান। তারা মানতে নারাজ যে, গায়ের জোরে গরু হওয়া যায় কিন্তু গুরু হওয়া যায় না। যেমন, গাধার পিঠে ঘোড়ার জিন লাগিয়ে গাধাকে ঘোড়া বানানো যায় না। গুরু হতে হলে অনেক গুণ লাগে, ঘোড়া হতেও হর্স পাওয়ার লাগে। শুধু ঘোড়ার জিন গাধাকে এবং পদোন্নতি কর্মীকে যথেষ্ট যোগ্য ও দক্ষ বানাতে পারে না। যদিও ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Chair makes a man. আসলে যোগ্য হয়ে টিকে থাকতে হলে পর্যাপ্ত শ্রম দিতে হয়।

একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যায়, সমাজ-সংসারে অনেক মানুষ নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে না জেনে বা তা না মেপে বা তা আমলে না নিয়ে, শুধু গেট-আপ পরিবর্তন করে মেকি স্মার্টনেস দেখিয়ে উচ্চতর অবস্থানে যেতে চায়। গাধার ঘোড়া হওয়ার মতো আহাম্মকি প্রত্যাশা নিয়ে তারা এরূপ করে। যোগ্যতা বা দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা না করে শুধু একটি বিষয় বা পয়েন্টের ওপর জোর দেয় তারা। সেটা হচ্ছে, সিনিয়রিটি বা চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা। হ্যাঁ, হতে পারেন তিনি সিনিয়র। সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সিনিয়রিটি অর্জনে তার কোনো অবদান আছে কিনা তা তিনি ভাবেন না, আমলে নেন না। তিনি জানেন না, সিনিয়রিটি কোনো কোয়ালিফিকেশন নয়, কোয়ালিটিও নয়। কারণ এটা এমনিতেই বাড়ে, ক্যালেন্ডারের তারিখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। অপরদিকে, কোয়ালিটি অর্থাৎ গুণ এবং দক্ষতা অর্জন করতে হয় মেধা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, সততা দিয়ে, আত্মনিয়োগ দিয়ে। এগুলোর মধ্যে কিছু জন্মগত, আবার কিছু আসে মানুষের প্রত্যয় এবং প্রচেষ্টার ফলে। সিনিয়রিটির জন্য কখনও অহংকার করা বা ক্রেডিট দাবি করা উচিত নয়, এটা নিছক বোকামি। গুণাবলি বা দক্ষতা অনেকটাই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেগুলো যদি কেউ চর্চা না করেন তাহলে তা বিকশিত হবে না, ভোঁতা হয়ে যাবে, বাড়বে না। এবং বাড়ে না বলেই তার উপকার তিনি নিজে বা তার পরিবার, কর্মপ্রতিষ্ঠান বা দেশ কেউই পায় না। অথচ এগুলো না করে যদি কেউ শুধু বয়সের অর্থাৎ চাকরির জ্যেষ্ঠতার দোহাই দিয়েই উঁচু পদে, উঁচু আসনে, উঁচু দায়িত্বে যেতে চান, তাহলে তা হবে অসম (মিস-ম্যাচিং)। জোর করে নেয়া, এই অসম প্রাপ্তির কুফলে তিনি ভুগতে বাধ্য। তিনি সেটা না মানলেও তার পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং দেশ তা মানবে। কারণ, তিনি দক্ষতার অভাবে পর্যাপ্ত ভালো কাজ ডেলিভারি দিতে পারবেন না; যার ফলে সার্বিকভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে সবচেয়ে বড় সুপ্ত ক্ষতি হবে প্রতিষ্ঠানের। অর্থাৎ ওই অযোগ্য লোকের পদোন্নতির ফলে জুনিয়রদের মধ্যে কেউ অধিক যোগ্য থাকলে পদোন্নতি পাবেন না, ফলে তিনি হতাশায় ভুগবেন। এতে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে দু'ভাবে :

এক. অযোগ্য সিনিয়র পদোন্নতি পেলে, তিনি মানসম্পন্ন পরিমিত কাজ দিতে ব্যর্থ হবেন। তার বাজিমাত করার তদবিরি কারিশমা অন্যদেরকে প্রলুব্ধ করে অফিসকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেবে।

দুই. দক্ষ জুনিয়রের দক্ষতা মূল্যায়িত না হলে তারা হতাশ হবেন, কাজে তেমনভাবে আত্মনিয়োগ করবেন না। আস্তে আস্তে অকর্মণ্যতা তাকেও গ্রাস করবে।

পুনরায় বলি, সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেননি। মানুষের হাতের অসমান ৫টি আঙুলের মধ্যেই তার ভিন্নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। লুকানো-ছাপানো কোনো বিষয় নয়। এত অকাট্য ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ চোখের সামনে থাকতেও আমরা মেনে নিই না যে, আমার মধ্যে Manufacturing Defect বা Default ঘাটতি আছে বা থাকতে পারে। অর্থাৎ আমি কম বুঝি, কম পারি- এই চরম সত্য কথাটা মেনে নিয়ে কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে অনেকেই নিজ নিজ অঙ্গনের প্রধান হতে পারেন অর্থাৎ যে আঙুলের গ্রুপভুক্ত, সেই আঙুলের শীর্ষে উঠতে সক্ষম হতেও পারেন। তা না করে আমরা দীর্ঘতম আঙুলে (মধ্যমা) ওঠার স্বপ্ন দেখি-দিবা স্বপ্নের মতো বা 'কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার' শখের মতো যা কখনও সত্য হয় না। তাই গাধা হয়ে ঘোড়ার জিন পিঠে লাগানোর মতো, আহাম্মকি চিন্তা করা উচিত নয়। যারা এমন করে এগোতে চায়, তারা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো নয়। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে যোগ্যতার ওপর ভর করে যার যতটুকু আছে, সেটুকু চর্চা করে, মনোযোগ দিয়ে কাজ করে, খুশি থাকার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, মনে রাখতে হবে, প্রকট বেকার সমস্যাগ্রস্ত এই দেশে আমার চেয়ে অধিক যোগ্য লোকের অভাব নেই। তারা অপেক্ষাকৃত কম বেতনে আমার চেয়ে বেশি কাজ করে দিতে আগ্রহী এবং পারদর্শী। তাই সাবধান হয়ে চলাই ভালো। যতটুকু আছে, ততটুকু ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং পর্যাপ্ত শ্রম দিয়ে সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত।

৩০. প্রতিবেশী সমাচার

প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখা Community Living-এর একটি অপরিহার্য্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এই সৎ ভাবটা হতে হবে নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ। অর্থাৎ এখানে Give & Take নয়, শুধু Give এবং No Take ভিত্তিতে হলেই সে সদ্ভাব নিঃস্বার্থ, Neutral এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সচরাচর শোনা যায়, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়, কিন্তু ওই দর্শন এখানে তেমন কাজ করবে না। কারণ, কিছু পাওয়ার আশায় কিছু দিলে এবং সেই প্রত্যাশিত পাওয়াটা না পেলে বা তার চেয়ে কম পেলে মন খারাপ হবে। ধীরে ধীরে সম্পর্কে চিড় ধরবে, যা পরবর্তীতে

বাকবিতণ্ডা, কলহ-বিবাদ এমনকি সংঘাতে রূপ নিতে পারে। এমনটি হলে আপনি যে লোকটির বা পরিবারের সম্পর্কে এতদিন প্রশংসা করে এসেছেন, সেই আপনিই আবার এখন তাদের নিন্দা করছেন। তখন মানুষ আপনাকে কী ভাববে? ভালো নিশ্চয়ই নয়। তাই সম্পর্ক রক্ষা করতে খুব সাবধান থাকতে হয়। একটু অসাবধানতা সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে।

এ রকম বহু ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। পাশের বাড়ির বা ফ্ল্যাটের সঙ্গে, প্রথমে গলায় গলায় পিরিত। খায় বাড়িতে, কুলি ফেলে পাশের বাড়িতে। পেটের কথা ঢালে অকপটে, সরলভাবে। বেওকুফ হয়ে অপরকে আপন ভেবেই তাদের কাছে এত Open হয়। কিন্তু তিনি অর্থাৎ যার কাছে যারপরনাই Open হলেন, সে বা তারা চাল্লু (অনৈতিক) হলে, বা অধিক স্বার্থপর হলে, আপনার কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার জন্য আপনার দুর্বলতাগুলোকে পুঁজি করে আপনাকে জিম্মি করে ফেলবে। অনেক সুবিধা নিতে চাইবে। এই সুবিধা বলতে শুধু টাকা-পয়সা বা বিষয়-সম্পত্তিই নয়, ঝাল নুন তেলের মতো ছোটখাটো জিনিস, এমনকি নিজের সাজসজ্জার শখের জিনিস, জুয়েলারি ইত্যাদি। সময় জ্ঞান না করে, আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা না ভেবে, যখন-তখন যা কিছু চেয়ে আপনার পরিবারের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। আপনি সম্পর্ক রক্ষার কারণে খুশি হয়ে দিলেও জিনিসটা (বিশেষ করে শখের দামি জিনিস বা জুয়েলারি) ফেরত না এলে বা অক্ষত অবস্থায় ফেরত না পেলে আপনার মন খারাপ হবে। এ থেকেই সম্পর্কের অবনতির সূচনা হবে। ধীরে ধীরে এটা বাড়বে। এরপর প্রথমে মনোমালিন্য, পরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে, এমনকি একজন আর একজনের কুৎসা রটনায় ব্রতী হবেন। এছাড়া, অতি মেলামেশায় আরও অনেক প্রকার সামাজিক বা পারিবারিক অসুবিধা হওয়াও বিচিত্র নয়।

এ প্রসঙ্গে একটা বাস্তব উপমা দেওয়া যায়। যেমন, আমার এক সহকর্মী খুবই ব্যালান্সড মানুষ ছিলেন। হিসাব করে চলতেন, বলতেন এবং আমাদের সঙ্গেও সীমারেখার মধ্যে থেকে মিশতেন। আমাদের মতো গা ভাসিয়ে মিশতেন না কারও সঙ্গে। আমরা লোকটাকে বেরসিক বা Uncultured ভাবতাম। একবার আমাদের সব ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে তিনি তার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন, যা তার জীবনে একাধিকবার এসেছে। তিনি বললেন, আমি যতবার বাসা বদলিয়েছি, আমার আশপাশের নতুন প্রতিবেশীদের সঙ্গে সংযত হয়ে মিশেছি। আমার পরিবারকেও তাদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করতে দিইনি। অথচ অন্য প্রতিবেশীদের দেখেছি খুব দহরম-মহরম, হৈ-চৈ এবং বেশি মাখামাখি করে চলতে। ওই যে বললাম, খায় বাড়িতে আর কুলি ফেলে প্রতিবেশীদের বাড়িতে। এরপর তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হলো। তখন সেই দুই প্রতিবেশীর মধ্যকার সরস-সম্প্রীতি অসহনীয় নিরস বিবাদে রূপ নিল। তারা একে অপরের প্রতি বৈরী

হয়ে উঠল। কেউ কারও মুখ দেখে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে লাগল। তখন উভয়পক্ষই বলতে লাগল, এই মহল্লায় আপনিই অর্থাৎ ওই নিরস সহকর্মী একমাত্র ভদ্রলোক এবং ভালো মানুষ। এমন অবস্থা সব পরিবেশে অহরহ ঘটছে। কেন এমন হয়? সোজা উত্তর, সীমারেখা না মেনে চলার জন্য। তাই সীমারেখার মধ্যে থেকে প্রতিবেশীর সঙ্গে সংযত আচরণ করলে, ওইসব অহেতুক এবং উটকো অশান্তি এড়ানো যায় এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ও নির্বিবাদে থাকা যায়। অর্থাৎ এখানে মেসেজ হচ্ছে, মনই আসল। মনের আবেগকে কন্ট্রোল করুন। মাত্রাজ্ঞান মেনে চলুন। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মন ভালো চিন্তা, সংযম দেবে, উস্কানি দেবে না, তাতে লোভ প্রশমিত হবে। তাই আসুন, মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখি, উত্তেজিত হয়ে, ক্রোধ বা হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি না করি। অন্যের ক্ষতি না করি। অন্যের সমস্যাকে সব সময় গুরুত্ব দিই এবং ভালো প্রতিবেশী হই, ভালো মানুষ হই, অতঃপর সবাই মিলে ভালো থাকি, সুস্থ থাকি।

৩১. আয় করা সহজ না ব্যয় করা সহজ

এ প্রশ্নের সহজ এবং সরল উত্তর হতে পারে, আয় করা কঠিন এবং ব্যয় করা সহজ। এমন প্রশ্ন যে কাউকে করা হলে এই অভিন্ন উত্তরই আসবে, এ ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত। কারণ, এ অধ্যায়টি লেখার সময় আমার বেশ অভিজ্ঞ এবং Matured সহকর্মীদের অনেকের কাছে পৃথকভাবে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তাদের সবার দৃঢ়, স্পষ্ট এবং চটজলদি অভিন্ন জবাব, সবার মতের সঙ্গে মিলে গেল। তাই মনে হয়, সবার সঙ্গে এক হয়ে বলা যায়, আয় করা কঠিন এবং ব্যয় করা সহজ।

কিন্তু আসলে কি তাই? ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক। দেশের ডেমোগ্রাফি অনুযায়ী জনসংখ্যার চাপ এবং বেকারত্বের প্রবল প্রকোপের ফলে একটি চাকরি পাওয়া অর্থাৎ কাজ জোগাড় করা বেশ কঠিন। কঠিন বলেই আমাদের মধ্যে ওইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, আয় করা সহজ নয়, অনেক কঠিন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকার ফলে প্রত্যাশিত কাজ সহজে পাওয়া দুরূহ হলেও অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরে কাজ পাওয়া সহজতর হতে পারে। অতএব, কাজ পেলেই পয়সা উপার্জন হয়। সেই কষ্টার্জিত পয়সা কীভাবে খরচ করলে উপকার বেশি পাওয়া যাবে, সেটাই ভাবার বিষয়।

যাহোক, এখন ফিরে আসি মূল কথায়। কোনো লোক একটা কাজ পেল। সেটা অফিসের চাকরিই হোক বা রাস্তায় মাটি কাটা বা ইট ভাঙা ইত্যাদি যে কোনো কাজই হোক না কেন। কাজে শ্রম দিয়ে সে পারিশ্রমিক পেল। এটা তার

আয়। এই আয়ের টাকা যদি সে পরিকল্পনা করে, অধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খাতে বা কাজে খরচ না করে বেহুদা খরচ করে, অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় কাজে লাগায় বা উড়িয়ে দেয় অথবা যদি অসামাজিক বা নিষিদ্ধ কোনো কাজে খরচ করে, তাহলে তা তার নিজের এবং তার পরিবারের বা সংসারের কোনো উপকারে আসবে না। এতে বরং সবার ক্ষতি হবে। কী ক্ষতি হয় দেখা যাক।

অভাবে তার স্বভাব নষ্ট হতে পারে। তিনি বিপথগামী বা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন, রোগগ্রস্ত হতে পারেন এবং ধীরে ধীরে অকালমৃত্যুর ঝুঁকির কবলে পড়তে পারেন। জেল-জরিমানায় তার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হতে পারে, হয়রানি-পেরেশানি বাড়তে পারে। অপরদিকে, টাকার অভাবে তিনি পরিবারের অতীব প্রয়োজনে Support দিতে ব্যর্থ হতে পারেন। যেমন, খাওয়া, পরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, মেয়ের বিয়ের মতো অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ খরচ করতে অসমর্থ হতে পারেন। এমনটি হলে পরিবারের লোকজন অসুবিধায় পড়বে, কষ্ট পাবে। এক পর্যায়ে ধৈর্য হারিয়ে হয়তো সবাই পরিবারের কর্তাকে ঘৃণা বা উপহাস করতে পারে। ফলে তিনি বেপরোয়া হয়ে চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, রাহাজানি এবং খুন-জখমের মতো, অপকর্মে লিপ্ত হতে পারেন। এমনটি হলে শেষমেশ **অভাবে স্বভাব নষ্ট** এই প্রবাদটি সঠিক প্রমাণিত হবে। তাই আমাদের মানতেই হবে, **আয় করা নয়, ব্যয় করাই কঠিন কাজ।** তাই সংযমী হোন। ব্যয় সঠিকভাবে করা মঙ্গলজনক এবং বুদ্ধিমানের কাজ। তাই এটাই কঠিন কাজ।

৩২. বেহিসাবি বেওকুফি

মেপে চলার, হিসাব করে বলার যে কত উপকারিতা সে বিষয়ে আগে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখন এই ব্যাপারে একটা অর্বাচীন অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরব, যা প্রমাণ করবে বেহিসাবি চলা বেওকুফি। একদিন এক অধস্তন তার ঊর্ধ্বতনকে এসে বলল, স্যার, ৮,০০০.০০ টাকা দিয়ে নিজের জন্য জুতা কিনলাম, জামা-প্যান্ট আর মা-ভাইয়ের জন্য গিফটসহ অনেক কিছু কিনলাম। মোট ২৪ হাজার টাকার বাজার করলাম। বস জিজ্ঞাসা করলেন, বেতনের টাকায় নাকি? তখন অধস্তন বলল, না স্যার। আমার বেতন তো অত না। ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কিনলাম। কবে কিনলে? বলল, গত মাসে। বস বললেন, তাহলে তো তুমি ভালোই আছো। অধস্তন বলল, না স্যার, মোটেও না। কারণ, এখন শুনছি ২৮% সুদসহ মাসে অনেক টাকার কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। তাহলে খাব কী, বাড়ি ভাড়া দেব কীভাবে? আবার ঋণের কিস্তি পরিশোধ করব কীভাবে? একযোগে তো ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারব না কখনই। তখন বস বললেন, তাহলে এতসব জিনিস কিনলে কেন? এগুলো কি খুবই দরকার ছিল? তখন অধস্তন বলল,

স্যার, জিনিস পছন্দ হলো, অর্ডার দিলাম, কার্ড চার্জ করলাম, কাজ হয়ে গেল। আগে তো বুঝিনি, এর ফল কী হবে। এখন বুঝছি। এতে আমার কী দোষ? আমাকে যারা কার্ড দিয়ে ঋণ নেয়ার সুযোগ করে দিল তাদের বোঝা উচিত ছিল আমার আয় কত। আসলে তারাই আমাকে উস্কানি দিল, ঋণগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়তে। কথাটা হাস্যকর মনে হলেও খুবই অর্থবহ। ব্যাংকই তাকে Extravagant বানাল, বেহিসাবি বানাল। কোন্ কাজের কী Impact হবে, তার হিসাব না করে কাজ করলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। ওই অফিসার নতুন হিসাবে অবুঝ হওয়ার কারণে বেহিসাবি কাজ করেছে বটে, তবে ব্যাংক তাকে সংযমী বানাতে পারত, এটাও অযৌক্তিক নয়। ব্যাংকঋণ যদি মানুষকে স্বাবলম্বী হতে না শেখায়, তাহলে ব্যাংকের সামাজিক বা ব্যবসায়িক কোনো দায়িত্বই পালন হবে না। তাই Borrower Selection-এর সঙ্গে সঙ্গে, তার Need Assessment বা প্রয়োজনের যথার্থতা এবং তা সামাল দেয়ার সামর্থ্য হিসাব না করলে ব্যাংকে অনাদায়ী ঋণের বোঝা বেড়ে যাবে দিন দিন। তাই ব্যাংকারদের সতর্ক হতে হবে।

উপরোল্লিখিত কাহিনী আমাদেরকে কী শিক্ষা দিল- সীমিত কষ্টার্জিত টাকা সঠিক প্রয়োজনে হিসাব করে খরচ না করলে, কাজে না লাগালে বিপদ অনিবার্য। এই কারণে আমাদের মানতেই হবে **মিতব্যয়ী হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।** তাই আবারও বলি, আসুন আমরা আমাদের উপার্জনের টাকা পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসে অতি প্রয়োজনের প্রাধান্য দিয়ে বাজেট করে খরচ করি এবং প্রতিটি টাকার উপকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করি। দুধ বেচে মদ নয়, মদ বেচে দুধ খাওয়ার মতো বিচক্ষণ পন্থা অবলম্বন করি, সবাই ভালো থাকি, বেহিসাবি হয়ে বেওকুফি না করি।

৩৩. মাকাল ফল ওপরে লাল ভেতরে কালো

ফল একটি উপাদেয় খাদ্যবস্তু। মাকাল ফলে (যার ওপরে দৃষ্টিনন্দন লাল কিন্তু ভেতরে কদর্য কালো) কী খাদ্য উপাদান ও উপকারিতা আছে তা আমার জানা নেই। এই ফল খাওয়ার অযোগ্য। তবে এটুকু জানি, সৃষ্টিকর্তার কোনো সৃষ্টিই অযথা নয়। নিশ্চয়ই এর একটা না একটা গুণ আছে যা আমরা জানি না। ভেষজবিদরা হয়তো জানেন, তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে খাওয়ার উপযোগী হোক বা না হোক, এই ফলের মধ্যেও মানুষের জন্য যে একটা শিক্ষা আছে তা বোঝা যায়। এজন্যই হয়তো বা এ ফলের সৃষ্টি।

মাকাল ফল যেমন উপরে লাল ভেতরে কালো তেমনি আমাদের সমাজেও অনেক মানুষও ওপরে ভালো, ভিতরে কালো অর্থাৎ মন্দ। বাহ্যত তারা বেশভূষায়

ফিটফাট, কথাবার্তায় কেতাদুরস্ত, ব্যবহারে বিনয়ী কিন্তু ভেতরে হিংস্র, লোভী এবং কদর্য তাদের মন পরশ্রীকাতরতায় ভরা। তারা কোনো ভালোকে ভালো বলতে জানে না। মন খুলে হাসতেও পারে না। তারা গোমড়ামুখী। তারা ভাবে, নিজে ছাড়া আর সবাই খারাপ এবং অযোগ্য। কেউ তার মতো যোগ্য নয়। যাকে ইংরেজিতে বলে Superiority Complexity. সে যেখানে যেমন সেখানে তেমন চলে। যেখানে অবস্থান নেয়, সেখানের রূপ ধারণ করে। পানির মতো তরল। রঙিন পাত্রে রঙিন, সাদা পাত্রে সাদা। সে গরল। তাই সব সময় গা বাঁচিয়ে চলে। নিজের ভুল স্বীকার করে না, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়। অন্যের বদনাম করে, অন্যের ঘাড়ে পা দিয়ে ওপরে উঠতে চায়। তার ভেতরের কদর্য রূপের কোনো নমুনা বাইরে আসতে দেয় না। সে এক নিপুণ অভিনেতা। রূপচর্চাকারীও (Beautician) বলা যায়। কোন্ পোষাক কোন্ পরিবেশে পরতে হবে, বয়স কীভাবে ঢাকতে হবে, তা খুব ভালো করে জানে সে। ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে বাজিমাত করতে ওস্তাদ। অর্থাৎ কান্না চেপে হাসির অভিনয় করতে পটু। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব সমাজের জন্য এমন মানুষ ক্ষতিকর। তবে এমন মানুষ সব জায়গায়ই থাকে। আসলে আমরা যা নই তার চেয়ে বেশি দেখাতে চাই, দেখাই। একটু ভালোলাগার জন্য, অন্যের ভাবনাকে প্রভাবিত করে আমার পক্ষে নিয়ে আসার জন্য। এতে আমরা অনাবিল আনন্দ পাই, প্রশান্তি লাভ করি। কিন্তু একবার কি ভাবি এটা মেকি, আসল নয়, এটা গর্হিত কাজ? ফাঁস হয়ে গেলে মানুষের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। হয়তো কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলবে না; কিন্তু মনে মনে তো ঘৃণা করবে। তখন কি আমার ভালো লাগবে? আগের মেকি ভালো লাগা কি টিকে থাকবে? এতে আমার সন্তানদের মনে কী প্রভাব পড়বে। আমার অপকর্মের জন্য আমার আত্মীয়-স্বজনরা সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। ছেলেমেয়েদের হয়তো শুনতে হবে, 'চোরের ব্যাটা, টাউটের ব্যাটা ইত্যাদি।' তাদের মন ছোট হয়ে যাবে। জীবনে তারা কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। তাদের বিয়ে শাদিতেও সমস্যা হবে। ছেলেমেয়েদের এভাবে হেয় করার বা ক্ষতি করার অধিকার কি আমাদের আছে? তাহলে কেন এমন করি, কেন এমন করব? এসব একরাশ প্রশ্ন অহরহ আমার মাথায় আসে। আমাকে পীড়া দেয়। কেন মানুষ এমন হয়? কেন আয় বুঝে ব্যয় করে না? লোভ কেন করে? কেন একবারও আমলে নেয় না **লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু**। কেন ভাবে না মহাপ্রস্থানের সময় কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। আবার রেখে গেলেও স্ত্রী-সন্তানদের অনেক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে যাওয়া হবে। সম্পত্তির জন্য জীবন নাশের মতো কত অঘটনই না ঘটছে অহরহ আমাদের সমাজে।

আসলে আমরা যদি বাস্তবতাকে মেনে নিই, দুইকে দুই এবং চারকে চার বলা শিখি বা বলতে প্রবৃত্ত হই তাহলে ক্ষতি কোথায়? আগেও বলেছি, আবারও বলি,

একটি মিথ্যা দশটি মিথ্যা দিয়েও ঢাকা যায় না। সত্য বের হয়ে আসে, আসবেই। এতে কোনো ভুল নেই। এটা স্রষ্টার অমোঘ বিধান। এ ব্যাপারে একটা উপমা দেয়া যায়। একবার এক ব্যক্তি, যাকে তার এলাকার লোকজন কেউ ভালো বলে জানে না। একদিন হঠাৎ ভাড়া করা একটি দামি ও সৌখিন জিপ গাড়ির সঙ্গে আরও কয়েকটি গাড়ির বহর বানিয়ে তার বাসার সামনে হাজির করলেন। বিশাল ফুলের বুকে ও অনেক মিষ্টির সমারোহ। লোকবল নিয়ে রওনা দিলেন। তিনিও সাজলেন জমিদারি ঢঙে, পার্লার থেকে ফেসিয়াল করিয়ে, দামি পোশাক পরিধান করে, গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে। দেখেই যেন মনে হয় বিশাল ব্যক্তিত্ব, খান্দানি মানুষ। আশপাশের সবাই কৌতূহলী দর্শক হিসেবে আসছেন। প্রায় সবার হাতেই তিনি টাকা গুঁজে দিচ্ছেন আর বলছেন, একটা শুভ কাজে যাচ্ছি, দোয়া করবেন। তার প্রস্থানের কিছুক্ষণ পর জানা গেল, তিনি নির্বাচনের জন্য নমিনেশন নিতে গেছেন। উপস্থিত সবাই তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, উনার মতো ধোঁকাবাজ বা ফটকাবাজ লোক যদি জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি হয়, এলাকার জনগণ তার কাছ থেকে কী পাবেন; ধোঁকা ছাড়া, দেয়ার মতো তার আছেই বা কী? না আছে ধন-দৌলত, না আছে মানুষের ভালোবাসার পুঁজি। দৌলত না থাকলেও যদি তিনি ভালোবাসা, গুণ, দক্ষতা, সহনশীলতা, চরিত্র, মেধা ও মনন এবং আন্তরিকতা দিয়ে এলাকার মানুষের কাছে থাকতেন, তাদের মন জয় করতে পারতেন তাহলেও তো হতো। কিন্তু তাও তো নয়। উপস্থিত সবাই আরও বলাবলি করতে লাগল, নমিনেশন কর্তৃপক্ষ কি এতটাই অবিবেচক যে তার মতো অযোগ্য লোককে নমিনেশন দেবে। এলাকার মানুষের মতামতের এবং চাহিদার দিকটা একবারও দেখবে না, তার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবে না? পরে দেখা গেল, ওই অসাধারণ লোকের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ধারণাই পর্যাপ্ত সম্মান পেয়েছে। অর্থাৎ তার অযৌক্তিক প্রত্যাশা হেরে গেছে কর্তৃপক্ষের উচিত বিচারের কাছে। তিনি নমিনেশন পাননি। কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ বিবেচনা মর্যাদা নিয়ে টিকে গেছে জনতার ভাবনার সামনে অটলভাবে।

বিকেলে তিনি যখন ফিরলেন তখন দেখা গেল, ঝড়ো কাকের মতো বিধ্বস্ত, যুদ্ধে পরাস্ত সৈনিকের মতো ক্লান্ত। বলা যায়, বিড়ালের মতো মুখ লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন। সকালের সিংহের সেই গর্জন আর নেই, ইথারেই ভাসছে। উপস্থিত সবাই দেখলেন, তার বাড়ির সামনের প্রকৃতি মুচকি হাসছে তার দিকে চেয়ে। শুধু রাজনীতিতেই নয়, অফিস আদালত কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি জায়গায়ই, এরূপ ভণ্ড এবং লম্পট লোকের অহরহ বিচরণ এবং দাপট বিরাজমান, যেখানে নিরীহ অর্থাৎ ভদ্র, ভালো এবং দক্ষ কর্মীরা নির্বাক থেকে নিস্তেজ হয়ে কোনো রকমে কালের সঙ্গে সমঝোতা করে চলে। ওইসব ধড়িবাজ লোককে পুলক বা উস্কানি দেয়ার মতো লোকেরও অভাব নেই সমাজে। তারা নাচায়, আর ওই সব আহাম্মক ও

লোভী লোকেরা নাচে। পুতুলের মতো। একটু মনুষ্যত্ব বা বিবেক থাকলে মানুষ এমনটি করতে পারে না। তারা মনে করে, তাদের ধোঁকাবাজি কেউ টের পায় না।

এসব লোককে অনুকরণ বা অনুসরণ করা ঘোর আপত্তিকর। কারণ, প্রশংসা করলেই মানুষ পেয়ে বসে। তারা লোভী হয়, প্রতারক হয়ে দুর্নীতি করে। তাই প্রশংসা কোনো মানুষকে নয়, প্রশংসা করতে হবে মানুষের কাজকে। ভণ্ড প্রতারকদের, অসার দাপটকে ভয় না করে প্রতিরোধ করার জন্য শক্ত হউন, ভালো কাজের ভক্ত ও অনুরাগী হউন, মনে শক্তি পাবেন। তাতে ভালো হতে ব্রতী হবেন। এতেই মানুষের সফলতা, এতেই জয়, ক্ষয় নেই। তবে সৎ পথ দুর্গম। সেখানে ফুলের মতো, কাঁটার আঘাত পাওয়াটাই স্বাভাবিক। খারাপ মানুষকে এড়িয়ে চললেই তাদের দাপট কমবে। All that glitters is not gold. অর্থাৎ, **চকচক করলেই সোনা হয় না** এই প্রবাদ সত্য প্রমাণিত হবে। মাকাল ফলের পরিচিতি প্রকাশ পাবে। তখন মানুষ মাকাল ফল সদৃশ খারাপ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করবে। এভাবেই সমাজ ভালো হবে। এ দায়িত্ব ভালোদের নিতে হবে।

৩৪. প্রবাস প্রবাহ

আমাদের উন্নয়নশীল তথা বেকারত্বের দেশে প্রবাস একটা সোনার হরিণ। একে ধরার জন্য মানুষের কত না আকাঙ্খা, কত না আগ্রহ। প্রায় সবাই মনে মনে ভাবে, প্রবাসে গেলেই ভাগ্য খুলে যাবে। বড় লোক হয়ে যাব, অনেক ভালো থাকব। আগে হয়তো এমনটাই হতো। কিন্তু এখন? গ্রামের অশিক্ষিত লোকজন বাড়িঘর, জমাজমি এমনকি শেষ সম্বল বিক্রি করে বিদেশে যায়। মনে করে, বিদেশে গিয়ে টাকা কামিয়ে বিক্রি করা সব জমি আবার কিনে ঘাটতি পূরণ করবে। আবার অবস্থা ফেরাবে। এ রকম ইচ্ছা প্রবল থাকলেও তা বাস্তব কতটুকু সম্ভব হয়?

এমনিতেই আমাদের দেশের লোকদের লেখাপড়া কম। আবার পড়ালেখায় আমরা দুর্বলও বটে। আমাদের লেখাপড়ার গুণগত মান অপেক্ষাকৃত নিচু। আমাদের অনেকের বিদ্যা হয়তো সার্টিফিকেট সর্বস্ব। আমরা দক্ষতা এবং যোগ্যতার অভাবে ক্লিষ্ট। সর্বোপরি আমরা Communication Skill-এর ঘাটতিতে ভুগি বেশি। অর্থাৎ, ভাষাগত দুর্বলতা আমাদেরকে পার্শ্ববর্তী ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও পাকিস্তানের সঙ্গে, প্রতিযোগিতায় টিকতে দেয় না। তাই ওইসব দেশের লোকেরা তাদের উপস্থাপনার পাশাপাশি কাজের দক্ষতা, শিক্ষা এবং সৎ প্রত্যয়ের কারণে বিদেশে উচ্চতর পদ পাচ্ছে আর আমাদের লোকদেরকে অপেক্ষাকৃত নিচু পদে কম বেতনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে চোখে ঠুঁশি দেয়া কলুর বলদের মতো ঘানি টানতে হচ্ছে। আমাদের লোকেরা শ্রম দেয় অনেক বেশি,

কিন্তু পয়সা পায় কম। তারা দেশে থাকতে ওইসব কাজকে ছোট ভেবে করে না আত্মসম্মানে বাধে বলে। যাহোক, এই কম পয়সা দিয়ে নিজে থেকে, খেয়ে, তারপর তিল তিল করে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে খোয়ানো সম্পত্তি উদ্ধার করতে যে সময় দরকার তা তারা পাচ্ছে না। দেখতে দেখতে কাজের চুক্তির সংক্ষিপ্ত মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওই অল্প সময়ে পর্যাপ্ত টাকা জোগাড় হচ্ছে না। তারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। এর পেছনে যে আর একটা বিশাল অসহায়ত্ব বা প্রতারণার খড়গ কাজ করেছে সেকথা তো সবাই জানে। যেমন, দেশে অসৎ ও প্রতারক দালালের খপ্পরে পড়ে অনেকেই জেল খেটে বাড়ি ফিরছে নিঃস্ব হয়ে, সব হারিয়ে। প্রত্যাশিত চাকরি না পাওয়ার কারণে হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারছে না। কেউ কেউ আত্মঘাতের পথও বেছে নিচ্ছে। আবার কখনও কখনও প্রবাসে অবৈধভাবে যাওয়ার কারণে জেল খাটছে, যাওয়ার পথে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। কী করুণ।

যাহোক, যে কথা বলতে এতসব বিষয়ের অবতারণা করা হলো, তাতে ফিরে যাই। রেমিট্যান্সের বিষয়টি অতীব ভয়াবহ রূপ নিতে পারে ভবিষ্যতে। কেউ এখন তা নিয়ে ভাবছে না। না ব্যক্তি, না সমাজ, না দেশ। সবাই এখন রেমিট্যান্স বাড়াতে মত্ত হয়ে আছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ফল সম্পর্কে ভাবছে না। কথাটা খোলাসা করে বলা প্রয়োজন। আপনারা খেয়াল করে দেখুন, অথবা অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখে একটু ভাবুন, বুঝতে পারবেন, আমার সঙ্গে হয়তো একমতও হবেন যে, যেসব পরিবারের লোক বিদেশে যায় বা যাচ্ছে, তাদের ওপর নির্ভরশীল দেশে পড়ে থাকা পরিবারের অপর লোকেরা আর কাজকর্ম করছে না। হাত গুটিয়ে বাবুগিরি করে চলছে। গ্রামেই এমনটি বেশি হচ্ছে। কখনও কখনও আবার এমনও হয়, প্রবাসী ভাই টাকা পাঠায় দেশে আপন সহোদর ভাইয়ের নামে অথবা স্ত্রীর নামে, বিক্রি করে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু জমি কেনার সেই স্বপ্নের সাধ কি পূরণ হয়? কারও কারও হয়তো হয়। আবার কখনও উল্টোটাও ঘটে। যেমন, দেশে থাকা ওই ভাই প্রবাসী ভাইয়ের পাঠানো টাকায় জমি-বাড়ি ক্রয় করে ঠিকই কিন্তু প্রবাসী ভাইয়ের নামে নয়, নিজের নামে। ভাই ফিরে এসে যখন এই জালিয়াতির কথা জানতে পারে তখন তার আর কিছুই করার থাকে না। সে সর্বস্বান্ত হয়, অনেক কষ্ট পায়। আবার স্ত্রীর নামে টাকা পাঠালে স্ত্রী টাউট-বাটপারদের খপ্পরে পড়ে পরকীয়ায় জড়ায়। সংসার ভাঙে। এভাবেই প্রবাসী সব হারিয়ে জীবনযুদ্ধে হেরে যায় চরমভাবে। আর তাতে ধীরে ধীরে হারায় কর্মশক্তি। আবার কেউ কেউ কষ্ট করে পুনরায় চেষ্টা করে ওঠার জন্য। কিন্তু দৈহিক কর্মশক্তি হারানোর কারণে তা আর সম্ভব হয় না। এভাবে ধীরে ধীরে একদিন হয়তো সে জীবনীশক্তি হারায়। তারপর আত্মঘাতী হয়। তার কষ্টের খবর ক'জন রাখে?

এভাবেই কিন্তু দেশে পাত পাড়ার লোকের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন, কিন্তু হাত নাড়ার লোক কমছে। অর্থাৎ কর্মবিমুখতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজে কর্মীর সংখ্যা বা কর্মপ্রবণ হাতের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

আসলে যুবসমাজ কাজ না করলে, তাদের মধ্যে কর্মহীনতা বাড়লে এবং অপরদিকে প্রবাসীর সংখ্যা দিন দিন বাড়লে দেশে কর্মশক্তির ঘাটতিও বেড়ে যাবে বা যাচ্ছে। তাতে উৎপাদন কমবে। ধনীরা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেও কর্মশক্তি আমদানি করতে হবে। তাতে জনসংখ্যা বাড়বে, উৎপাদন খরচ আরও বেড়ে যাবে। দেশ অসম প্রতিযোগিতায় পড়বে, শিল্প-কারখানা টিকবে না। বিদেশের মার্কেট হারাবে। ফলে যতটুকু উন্নতি করছে, আবার Back Gear-এ চলে যাবে বা যেতে পারে। অধিক আমদানি-নির্ভর হয়ে পড়বে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, দেশের মধ্যে সিলেটের লোকেরা সনাতন এবং সর্বাধিক রেমিট্যান্স নির্ভর। এ কারণেই সেখানে তেমন কোনো শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। তবে তারা লেখাপড়ায় অনেক অগ্রগামী। দেশের অর্থনীতি পরিচালনায় তাদের দীর্ঘতম নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু দেশের অন্য অঞ্চলের Scenerio বা পরিস্থিতি বিশেষ করে রেমিট্যান্সের অঙ্গনে ভিন্নতর। লেখাপড়ায়ও তারা অতটা অগ্রগামী নয়। এমন পরিস্থিতিতে জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের উপযোগী করতে না পারলে, বিদেশের সঙ্গে দরকষাকষি করে তাদের জন্য উপযোগী এবং নিরাপদ কাজের ব্যবস্থা করে দিতে না পারলে, বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে, প্রবাসী পরিবারের কর্মক্ষম লোকদের কর্মবিমুখতা প্রতিরোধ করতে না পারলে, এই বৈদেশিক রেমিট্যান্সের কারণে দেশ একদিন মারাত্মক বিপর্যয়ের কবলে পড়তে পারে। তাই জনশক্তি রফতানিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নয়, বরং সুসংহত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের সামর্থ্যবান এবং বিত্তশালী লোকদের উচিত এই রফতানিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তাদের সাহায্যে আহরিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ওইসব প্রবাসী পরিবারের সম্পদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য এখনই পরিকল্পিত এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বর্ণিত কথা নতুন নয়। প্রায় সবাই জানে। টেলিভিশনের টক শো-তে এরূপ আলোচনা প্রায়ই হয়। এ অশনিসংকেত রুখতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। সবাইকে অভিন্ন দর্শনে কাজ করতে হবে। কিন্তু করবে কে? এটাই তো সমস্যা আমাদের দেশে। উপদেশ বা পরামর্শ দেয়ার লোকের অভাব নেই। অনুশীলন করে ক'জন? যাহোক, রেমিট্যান্সকে Productive করতে হলে জনশক্তি রফতানিকে শিল্প হিসেবে নিতে হবে। শিল্পের কর্মশক্তি হিসেবে আগ্রহী প্রবাস গমনেচ্ছুদের বেছে বেছে তালিকা তৈরি করে তাদের যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী ট্রেনিং দিয়ে কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে

ন্যায্য পারিশ্রমিকে যোগ্যতা অনুসারে বিদেশে তাদের নিরাপদ কাজ ঠিক করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি এম্বেসি এবং হাইকমিশনকে অধিক মাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। বিদেশি কোম্পানি, দেশি ব্যাংক এবং প্রবাসীর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের টাকা দ্রুততম পদ্ধতিতে সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে নিরাপদে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংকের দায়িত্বে প্রবাসীদের ওই টাকার সুষ্ঠু বিনিয়োগের নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংকের মাধ্যমে এই কাজ করা খুবই সহজ।

এতে হুন্ডি কমবে, দেশের রিজার্ভ পজিশন ভালো হবে। হয়তো এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই সরকার অতি ব্যাংকের বাজারেও সম্প্রতি ৩টি NRB ব্যাংকের অনুমতি দিয়েছেন। এখন আমাদের দেখার পালা তারা কী করেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক নামে তো দুটি ব্যাংক আগে থেকেই কাজ করছে। সরকার নিশ্চয়ই দেখছেন, কতটুকু কাজ তাদের করা দরকার বা করার সুযোগ আছে আর কতটুকুইবা তারা করেছেন। নাকি তারাও অধিক লাভজনক বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। এসব ব্যাংক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ চিন্তা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞ লোক দরকার, যাদের উদ্ভাবনী শক্তি, কর্মদক্ষতা এবং পরিশ্রমে ওইসব বিশেষায়িত ব্যাংকের অবস্থান সুদৃঢ় হতে পারে এবং তাতে সরকারের মহৎ উদ্দেশ্যও পূরণ হবে।

এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য একটাই। সেটা হচ্ছে, আমাদের দেশের বিশেষ করে আর্থিক খাতে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই হয়তো সুষ্ঠু পূর্বপরিকল্পনা ব্যতীত। অথবা পূর্বপরিকল্পনা থাকলেও তা কঠোর বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী উদ্যম ব্যতীত। এ কারণেই দেশে একটার পর একটা শিল্প Over Saturated হয়ে বসে যাচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, সর্বশেষ রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের মতো দেশের অর্থনীতিতে অন্য সব রফতানিমুখী সেক্টরেরও আগমন ঘটেছিল অপরিকল্পিতভাবে দিনে দিনে। অর্থাৎ Demand Gap Analysis-এর মাধ্যমে প্রয়োজনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে পর্যায়ক্রমে সীমিত আকারে এসব শিল্পের পরিকল্পিত প্রসার ঘটানো হলে তারা মুখ থুবড়ে পড়ত না। যেমন, পাট, চা, চামড়া, চিংড়ি ইত্যাদি সেক্টরে বিনিয়োগ কত, উৎপাদন কত এবং তাদের হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণ কত, তার হিসাব বের করলেই এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আসলে আমাদের দেশে কী ঘটে? কেউ যখন একটা ব্যবসায় ভালো করে ধনী হয় তখন গড্ডলিকা প্রবাহের মতো অন্য সবাই লাগামহীনভাবে সেই ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতি ব্যাংকের বাজারের ব্যাংকগুলোও অপরিণামদর্শী হয়ে অতি উদার মনোভাব নিয়ে এবং অনৈতিক প্রতিযোগিতা করে বা বেহিসাবি হয়ে তাদেরকে ঋণ দেয়। তখনই ওই শিল্পের বারোটা বাজে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত

ঋণ নিয়ে Divert করার ফলে সমুদয় ঋণের সুদ সেই ঋণের কম অংশের বিনিয়োগ হতে যে আয় আসে তা দিয়ে পরিশোধ করতে পারে না। অর্থাৎ, সুদ সার্ভিসিংই হয় না, ঋণ সার্ভিসিং হবে কীভাবে? এভাবেই কারখানা মার খায়। ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বাড়ে। এর জন্য শুধু ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের এককভাবে দায়ী করা যাবে না। ব্যাংকাররাও এর দায় এড়াতে পারবেন না। কারণ, ওইসব ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নি করে ব্যাংক। উন্নত বিশ্বে শিল্পের অর্থায়ন আসে স্টক মার্কেট থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে আসে ব্যাংক থেকে। স্টক মার্কেট থেকে ক্যাপিটাল আনতে হলে উদ্যোক্তাকে বা প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছতা দেখাতে হয়, Exposed হতে হয় পাবলিকের কাছে। কিন্তু ব্যাংক থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে বা কম ধকলে অর্থ সংগ্রহ করা যায় এবং এর কারণ কারও অজানা আছে বলে মনে হয় না, Too many Banks too few Customers. কারণ, ব্যাংকাররা মনে করে তারা চাকরি করে, মালিক অন্য কেউ। তাদের পর্যাপ্ত Sense of Belonging থাকলে তারা সজাগ এবং শক্ত হয়ে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় কাজ করলে বা করতে পারলেই ব্যাংকের অবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও মজবুত হতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই এখন থেকেই প্রবাস প্রবাহে আমাদের সবারই আরও বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। যাতে রফতানি সেক্টরে আগের ভেঙে পড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর একটা অর্থাৎ এটা যোগ না হয়।

৩৫. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

সনাতন এ প্রবাদ চিরন্তন। চলছে, চলবে। মানুষের চরিত্রে যে ৪টি পাপ (Vices) আছে, তার একটি **লোভ**। অপর ৩টি হচ্ছে **উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা** এবং **ক্ষমতা**। ইংরেজিতে এই ৪টি পাপকে বলে Greed, Ambition, Hunger & Power. যা আগেও বলা হয়েছে।

যে মানুষ এই ৪টি পাপ বা উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সেই হতে পারে সফল, খাঁটি এবং প্রকৃত মানুষ। কিন্তু এমন করতে পারে কজন? আমরা শুধু ওপরের দিকে তাকাই। অন্যকে ভালো থাকতে দেখে আমাদের চোখ টাটায়। ওই রকম অথবা তার চেয়েও বেশি ভালো হতে চাই, থাকতে চাই। পাল্লা দিই। অসম জেনেও নির্বোধ অথচ লোভী প্রতিযোগিতায় নামি। নিচের দিকে তাকাই না। দেখি না আমার চেয়ে কত লোক যে খারাপ অবস্থায় আছে। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভালো চাকচিক্য দেখে প্রলুব্ধ হই। ন্যায়-অন্যায় দেখি না। অন্যায় করে হলেও বড় বা ধনী হতে প্রবৃত্ত হই। তাই তো লোভের কবলে পড়ি। লোভ আমাদেরকে গ্রাস করতে লুফে নেয়, নেশাগ্রস্ত করে ফেলে। প্রথমে ছোট পাপে জড়িয়ে যাই। তারপর **এক পাপেও পাপ, বায়ান্ন**

পাপেও পাপ বলে ছোট পাপকে Justify করে পরে নেমে পড়ি বড় পাপে, অসৎ ও অন্যায় কাজে বড় দান মারতে। ধনী হওয়ার বা বড়লোক হওয়ার যে কত বিড়ম্বনা, তা একবারও ভেবে দেখি না। মনে করি, বড়লোকেরা খুব ভালো আছে। কিন্তু অন্যায় বা অনিয়ম করে বড়লোক হতে গিয়ে যে কত বিপদে পড়তে হয় তা একবারও আমলে নিই না। নানা রকম অসুখে পড়ি, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে যাই। ভালো-মন্দ খেতেও পারি না। ক'জন ভাবে এমন মানুষের কথা? তারা অহেতুক দুর্ভোগে পড়ে। এক হাতে কামাই, অন্য হাতে খরচ করে Back to Square-এ পৌঁছে যায়। বড়লোক হওয়ার বিড়ম্বনার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক।

একবার এক পরিবারের একটি ছেলে ছোটবেলা থেকেই অভিভাবকের কড়াকড়ির আড়ালে পড়ালেখার ভান করে ভেতরে ভেতরে ব্যবসা করার চিন্তা মাথায় নেয়। সিরিয়াসলি নেয়। অভিভাবকের কাছে একদিন তার এই রহস্য ধরা পড়ে যায়। তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে তার নামে ছাপানো বিজনেস প্যাড, ক্যাশ মেমো, ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি পাওয়া যায়। হঠাৎ ধরা পড়ায় জীবনের প্রথম সার্টিফিকেট পরীক্ষা উপেক্ষা করে সে একদিন ঘর থেকে পালিয়ে যায়। খুঁজে ফেরত আনার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে এরূপ আচরণের কারণ হিসেবে বলে, ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করা পরিবারে দেখ্ছি ডাল, আলু ভর্তা ছাড়া আর কিছুই মেলে না খেতে। তাই আমি ওই গরিবি পড়ালেখা করব না। পয়সা বানাতে পারলে উচ্চশিক্ষিত লোককে নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেব, আমি মনিব হব, চাকর নয়।

তার অশুভ পরিকল্পনা এবং দুর্বল যুক্তির বিপক্ষে বা প্রতিকূলে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তাকে অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝানো হলো, তার ওইসব পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। লেখাপড়া ভালোভাবে জেনে, শিখে ব্যবসা করলে ব্যবসায়ে বেশি ভালো করা সম্ভব, আন্তর্জাতিক ব্যবসা হ্যান্ডেল করাও সম্ভব এবং তাতে শিক্ষিত কর্মচারীরা ভুল করলে বা ঠকাতে চাইলে তা ধরা সম্ভব। যাহোক, এসব যুক্তির পর সে তখনকার মতো, বাহ্যত ক্ষান্ত হলো। মনে হলো, লেখাপড়ায় ফিরে এল। কিন্তু এযাবৎ গাফিলতি করে সে পড়ালেখায় ইতোমধ্যে যে দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই ঘাটতি আর কিছুতেই পূরণ করতে পারে না। বয়স তো আর বসে নেই। আবার প্রথম থেকে শুরু করবে সেটাও সম্ভব না। তাই পরে গড়িয়ে-গড়িয়ে কোনো রকমে এমএ পাস করল, কিন্তু কোনো ভালো চাকরি পেল না। বেসরকারি ২-১টি চাকরিতে ঢুকলেও সেখানে মন বসাতে পারে না। অবশেষে চাকরি ছেড়ে আবার ব্যবসা শুরু করল। কয়েকটা ব্যবসা বদলায়। নিশ্চয়ই ভালো না করতে পারার কারণে অথবা রাতারাতি ধনী হওয়ার মরণ লোভে। পরে ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে বড় আকারের দেশি এবং রফতানি ব্যবসা শুরু করে। এলাকার মানুষের

কাছ থেকে বাকিতে কাঁচামাল সংগ্রহ করে দেশি মিলগুলোতে সরবরাহ করে। বিক্রয়মূল্য ঠিকমতো পায় না। এর সঙ্গে সঙ্গে রফতানি ব্যবসাও শুরু করে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বাজার-মন্দার প্রবল ঝড়ো প্রভাব দেশের ব্যবসায়েও পড়ে। ১৮০০ টাকা মণ দরে মানুষের কাছ থেকে কাঁচামাল বাকিতে কিনে রফতানির জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু দর পড়ে যাওয়ায় বিদেশি ক্রেতারা অসহযোগিতা করে। তখন সে ওই ব্যবসায়ও বড় মার খায়। কারণ, ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য ৫০% ভাগ কমে যায়। ব্যাংকের ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদে বাড়তে থাকে। স্থানীয় সরবরাহকারীদের চাপ, ব্যাংকের চাপ, সব মিলে তাকে দিশেহারা করে ফেলে। পাওনাদারদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে। এরপর পাওনাদাররা বাসায় এসে পরিবারের লোকদের অপমান-অপদস্থ করতে থাকে। বাড়িতে টেকা দায় হয়ে যায়। জেল খাটাও অবশিষ্ট থাকে না। এসব ধকলে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে সে।

কেন এমন হলো? দুটো প্রধান কারণে। প্রথমটি ব্যবসার মূল পুঁজি এবং ভালো ব্যবহারের অভাব বা সরবরাহকারীদের আস্থা অর্জনে ঘাটতি (মালের দাম নিয়মিত পরিশোধ না করলে আস্থা হারাবেই)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজের সামর্থ্যের বা সীমার বাইরে চলা বা লাফ দেয়া, লোক দেখানো বাহাদুরি করা, বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা ও চলা। আবার ব্যাংকারদের অদূরদর্শিতা এবং অদক্ষতাও এর জন্য কম দায়ী নয়। গ্রাহককে ঋণ দেয়ার আগে ব্যাংকাররা গ্রাহকের ওই ব্যবসার চাহিদা, ব্যবসায়ে টাকার প্রয়োজনের পরিমাণ এবং তার সেই ব্যবসা চালানোর দক্ষতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাই-বাছাই করেনি। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের অযৌক্তিক এবং ধোঁকাবাজি স্ফীত ক্রেডিট টার্ন-ওভারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা এতই বেহিসাবি যে, বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করি না। না ব্যবসায়ীরা, না ব্যাংকাররা। ব্যবসায়ীরা লোভে এবং নিজেদের স্বার্থে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ করলেও সেটা ধরতে পারি না, হয়তো চেষ্টা করি না। কারণ, ওই যে বললাম চাকরি করি। তাই সবাই অদূরদর্শী হয়ে আবেগ দিয়ে কাজ করি। তাই তো এমন হয়। এরূপ করা ঠিক নয়। এটার আশু প্রতিরোধ প্রয়োজন।

৩৬. উচিত কথায় আহাম্মক রুষ্ট

এই উক্তি নির্মম, কিন্তু নিরর্থক নয়। উচিত কথা যদি সঠিক কথা হয়, তাহলে সেই কথা যাদের পছন্দ হয় না, যাদের স্বার্থহানি করে, তারা বেজার বা রুষ্ট হতে পারেন। হক কথা বা উচিত কথায় যারা রুষ্ট হয়, তারা অসৎ এবং স্বার্থপর। অসৎ লোক আহাম্মক ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে? যারা নিজেদের স্বার্থ বেশি করে দেখে তারা লোভী, পাপী, হিংসাপরায়ণ এবং পরশ্রীকাতর। তারা নিকৃষ্ট,

নরাধম। এই ধরাধামে তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি অসুখী। তবে লোকে মনে করে, তারা সুখী। তাই তো কবি বলেছেন, **পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি দাও। তার মতো সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও।** কবির এই সুবচন হয়তো নির্বাসনে গেছে। তাই তো আমরা এখন সুবচনকে বা নীতিকথাকে হেলায় বিসর্জন দিই, মত্ত হই নিজের লোভের ধ্যানে, লাভের প্রয়োজনে। নিজের লাভের অন্বেষণে, অন্যের ক্ষতি করি। কিন্তু এর ফল ভালো হয় না, তবুও করি। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, কোনো খারাপ লোকের Tragic End ছাড়া ভালো End হয়েছে এমনটি কেউ দেখাতে তো পারবেই না, এমনকি বলতেও পারবে না।

তাই মানতে হবে উচিত কথায় যারা রুষ্ট হন, তারা আহাম্মক বা বেওকুফ। হ্যাঁ, সত্যের বলয়ে তারা বেওকুফ। কেউ কেউ বলতে পারেন তারা উন্মাদ, পাগল। আমি বলি, পাগল হলেও তারা সেয়ানা-পাগল। নিজের ভালোটা ঠিকই বোঝেন। প্রবাদ আছে, **নিজের ভালো পাগলেও বোঝে।** তাই ওইসব আহাম্মক থেকে, পাগল থেকে সতর্ক থাকুন। তবে তাদেরকে ভয় পাবেন না। ভয় পেয়ে সত্য বলতে, সৎভাবে চলতে পিছপা হবেন না। তাদেরকে রুখতেও ভয় পাবেন না। আবারও বলি, সত্য বলতে সাহস লাগে না, লাগে প্রত্যয়। আর মিথ্যা বলতে দরকার হয় সাহসের। তাই সত্য বললে, সৎ পথে চললে জয় অনিবার্য। আসুন, উচিত কথায় রুষ্ট না হয়ে সুষ্ঠুভাবে ভেবে দেখি। কারও উচিত কথা আমার গায়ে লাগলেও তার সত্যতা যাচাই করতে নিজের বিবেককে কাজে লাগাই। সত্য হলে মেনে নিই; শোধরাই নিজেকে। কেউ যদি বলে, এটা যে খারাপ তা আমি আগে বুঝি নাই। এটা ঠিক নয়। আর এই প্রবাদটাই তা প্রমাণ করবে, **মনের অগোচরে পাপ নেই, মায়ের অগোচরে বাপ নেই।** সুতরাং নিজেকে ধোঁকা দিয়ে, নিজের কুচিন্তা-কুকর্মকে সমর্থন দিয়ে তাকে বাড়তে দেবেন না। তাহলে তার ক্ষতির বোঝা আপনাকেই বইতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিন্দা- লাশের আত্মকাহিনী

আমি রবিউল হোসেন, সাবেক এমডি, সোনালী ব্যাংক- এখন একটি জিন্দা লাশ। আমার জন্ম-জীবনের বিশদ বর্ণনা দিয়ে কাউকে বিব্রত করতে চাই না। শুধু বাস্তবতার নিরিখে এটুকু বলব, আমি যখন কর্মজীবনের প্রধান স্রোতধারায় সক্রিয় ছিলাম তখন দেখেছি, আমার কত নাম, দাম, আদর ও কদর। আমি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলাম। আমার জন্য সবকিছু অপেক্ষা করত। যখন যা বলতাম তাই হয়ে যেত। তবে নিয়মের বাইরে কিছু বলিনি কখনও। আফসোস, কাজ শিখে পোক্ত হলাম যখন তখনই হারালাম কাজ করার সুযোগ; বয়স-সীমার পাঁকে পড়ে। এখনও মনে করি, আমার কাজ করার সামর্থ্য, শক্তি ও মনোবল আছে প্রবল। কিন্তু পরিস্থিতি উল্টো। তেমন কেউ ডাকে না, খোঁজেও না আমাকে। এমনকি কেউ পাত্তাও দিতে চায় না। উপযাচক হয়ে পাশে গিয়ে বসলেও তেমন 'মাতে' না। বোঝা যায়, আমার বসাটা পছন্দ করলেন না। তখন মনটা খুব ছোট হয়ে যায়। ধিক্কার আসে নিজের ওপর, কেন এসেছিলাম এখানে। এমন হবে জানতাম, তথাপিও কষ্ট পাই মনে। তাই তো জিন্দা-লাশ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখি, উপেক্ষার চাপা কষ্ট এড়াতে এবং মানহানি না বাড়াতে । জিন্দা-লাশ-জীবনের অতীত ও বর্তমানের দু-একটা কাহিনী তুলে ধরার জন্যই এই লেখার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লেখার কারণ

গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে রূপালী ব্যাংকের বেশ বয়স্ক দু'জন সাবেক ডিজিএম আমার কাছে এসে বললেন, তারা ওই ব্যাংকের স্বাধীনতা-উত্তরকালের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের আত্মজীবনী দিয়ে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করবেন, তাতে আমার আত্মজীবনী দরকার। শুনেই আমি তাদের প্রতি কিছুটা বিরূপ হয়ে বললাম, ইন্টারনেটের জামানায় হার্ড কপি কি কেউ পড়ে এখন? যারা পড়ে,

শুনেছি তাদের অধিকাংশই পড়ে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস এবং বরেণ্য লেখকদের প্রসিদ্ধ লেখা। এছাড়া অনেক আগে একবার শুনেছিলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কদাচিৎ কেউ ঢোকে। বইয়ের ওপর ধুলা জমে থাকে। এসব একাধিক কারণে পড়ার প্রতি গণ-বৈরাগ্যের এই সক্রিয় বাজারে এবং আমাদের পরশ্রীকাতর সমাজে একজনের আত্মজীবনী অন্য কেউ আগ্রহী হয়ে পড়বেন, আপনাদের এমন অবান্তর-প্রত্যাশার সঙ্গে আমি একমত নই। তাই আমার আত্মজীবনী আপনাদের দিতে চাই না। তবে হ্যাঁ, অন্য এমডিদের আত্মজীবনী পড়তে পারে, যদি তাতে তেমন কোনো বিশেষত্বের অনুকরণীয় আকর্ষণ থাকে।

আত্মসমালোচনা

আসলে বলতে কি, অবসরের পর দেশি সৎ চাকুরেদের, বিশেষ করে ব্যাংকারদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়, দেহকে জিন্দালাশ বানিয়ে। তারা মনের প্রদীপে টিম টিম করে জ্বলে, তেল নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সলতের আবছা আভা ছড়িয়ে। কেউ দাম দেয় না তাদেরকে। না ঘরে, না বাইরে। পেনশন তুলতে গেলে ভালো করে বোঝা যায়, আচরণের প্রকট পার্থক্যটা। আরও বোঝা যায়, যখন ফোনে নিজের পরিচয় দিয়ে সাবেক প্রতিষ্ঠানের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাকে ডেকে দিতে অনুরোধ করা হয়। ওই ফোন ধরা ব্যক্তি উঁচু গলায় তাকে ডাকেন, এই মি. --- অমুক, আসুন, আপনার ফোন। মরহুম এমডি --- অমুকের। এই কথা শুনে জিন্দা-লাশ এমডির মনের অবস্থা কেমন হয়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না? যারা এরূপ সরস উপহাস করেন, তাদের উপহাস নির্মম, কিন্তু নিরর্থক নয়। কারণ, তারা হয়তো ভাবেন, জীবনে তারা কখনই অবসরে যাবেন না বা এমন মরহুমও হবেন না।

আমি কথিত জিন্দা-লাশের দলে বলেই চাই না, আজকের করিৎকর্মা ব্যাংকারদের কাছে, আমার মতো এমডির বোবা-বধির আত্মজীবনী লাঞ্ছিত হোক। তাই আমি আপনাদেরকে আমার আত্মজীবনী দেব না। পারলে অন্যদের কাছ থেকে নিন। তারা তখন বিনয়ী-যুক্তি দিয়ে অধিক অনুনয়ের সুরে বললেন, স্যার, আমরা স্বাধীনতা-উত্তর কৃতী এমডিদের আত্মজীবনীর ধারাবাহিকতায় কোনো গ্যাপ রাখতে চাই না। দয়া করে রাজি হন আপনারটা দিতে।

অতঃপর, আমি আবারও বললাম, মরহুম এমডিদের কাজের অ্যালবামে প্রকাশ করার মতো তেমন কোনো কৃতিত্ব আদৌ কি আছে? উত্তরে তারা বললেন, আপনাদের মতো এমডিদের দক্ষতার কারণেই তো ওইসব ব্যাংক বর্তমানের শক্তিশালী দেশি-বিদেশি প্রাইভেট ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এখনও টিকে

আছে, কিংবদন্তি হয়ে। প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, আপনাদের এই উক্তি যুক্তিহীন না হতে পারে, তবে বিতর্কহীন নয়। কারণ, আপনাদের ধারণা যদি সঠিক হতো, তাহলে ক'বছর আগে ব্যাংক সংস্কারের প্রয়োজনে IMF-এর পরামর্শে ওই সময় উঁচু সরকারি লেভেল থেকে কড়া ইন্টারভিউ নিয়ে বেছে বেছে নিয়োগ দেয়া এমডিদেরকে আগের তুলনায় ৪০ গুণ বেশি বেতন সুবিধা দেয়াসহ সর্বমোট ১৪৮ কোটি টাকা খরচ করার পর ওই চারটি ব্যাংকের (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী) সেই সংস্কার-প্রকল্প সফল হতো। এখন ওইসব ব্যাংকের বর্তমানেরা হয়তো ভাবছে, অতীত ছিল অথর্ব, ওদের কারণেই বর্তমানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কারণ, তারা আর ব্যবসা ধরে রাখতে পারছে না, চলে যাচ্ছে প্রাইভেট ব্যাংকে। তাদের অতি সচেতন সেয়ানা উপলব্ধি অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে অজুহাত দেখাচ্ছে, Waves of the Legacy of the Past-এর। এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আমি জোর দ্বিমত পোষণ করতে পারছি না। কারণ, ভাঙন শুরু হলে তা ধরে রাখা দুঃসাধ্য হয় এবং নিজের ঘাড়ে কেউ দোষ নিতে চায় না।

এতক্ষণ আমি যা বললাম তা আত্মসমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে। যেহেতু আমি মানি, **সমালোচনা শত্রুতা আনে, শত্রুতা সতর্কতা আনে, সতর্কতা সফলতা আনে,** তাই আমি বর্তমানের সমালোচকদের শত্রু নয়, মিত্র ভাবি। কারণ, তাদের সমালোচনা আমার দোষ ধরিয়ে দিচ্ছে; যা নিজের চোখে আমি কখনও ধরতে পারিনি। যা হোক, স্ববিরোধী সমালোচনা করলেও বিবৃত বিষয়ে আত্মরক্ষার সপক্ষে আমার কিছু বলার আছে, যা পরে বলছি। এখন যেহেতু নতুনরা পুরনোদের ব্যাপারে সোচ্চার, তাই আমার আত্মজীবনীকে তাদের গ্লানি রোষে পড়ে নাজেহাল হতে দিতে চাই না। তবে আপনারা যদি আমার এই কথাগুলো আত্মজীবনীর অংশবিশেষ হিসেবে আপনাদের স্মরণিকায় প্রকাশ করতে সম্মত হন, তাহলে আমি আপনাদেরকে আমার আত্মজীবনী দিতে পারি। তারা রাজি হলেন আমার শর্তে। তখন আর তাদের সেই তীব্র-আবেগী আবদার উপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই কলম হাতে নিলাম আমার জীবনের স্মৃতিচারণ কালির রঙে রাঙাতে।

জন্ম এবং শিক্ষা পর্ব

১৯৪৫ সালের পয়লা জুলাই সাবেক বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার (বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা) দামুড়হুদা থানার এক অজপাড়াগাঁয়ে আমার জন্ম। মা'র কাছে শুনেছি, আমার বয়স যখন দেড় বছর তখন তিনি স্বামী হারান। আমরা দু'ভাই এতিম হই। তারপর আমার বড় ভাই আবুল হোসেন (সাত বছর) এবং অভাগী মায়ের হাত ধরে একেবারে চলে আসি একই থানাধীন পাঁচ মাইল দূরে উজান একটি গাঁয়ে

(মজলিশপুর) **নানার** বাড়িতে। কারণ, নানা ওই অবস্থায় পিতৃকুলের হাতে আমাদের ছেড়ে দিতে ভরসা করতে পারেননি। যাহোক, পিতৃস্নেহ এবং আপন সংসারের স্বকীয় অধিকারবঞ্চিত হয়ে অনেক কষ্ট মনে পুষে তিল তিল করে বেড়ে উঠি, মাতৃকুলের সঙ্গে অনেকটা বাস্তুহারার মতো। **নানার** মহাপ্রয়াণের পর আমাদের একমাত্র মামার সংসারে স্বাভাবিক বৈষম্যের শিকার হয়ে তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লেখাপড়া চালিয়ে যাই। মামার কড়া শাসন না থাকলে আমার লেখাপড়া হতো না, এতই ডানপিটে ছিলাম আমি। যদিও শাসনের কারণে তখন মামাকে মনে মনে অনেক অভিশাপ দিতাম। যাহোক, এভাবে ডিঙি নৌকায় চেপে সমুদ্র যাত্রার মতো অনেক ভয়ে ভয়ে অনেক কষ্টে কুল কুল করে বেয়ে অবশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করি ১৯৬৭ সালে। তারপর, পেটের তাগিদে আবার শুরু হয় ভেসে চলা, চাকরি-ঘাটতির অকূল সাগরে, চাকরির অন্বেষণে।

কর্ম পর্ব

অবশেষে সেই কষ্টের ভেসে চলার সুখকর সমাপ্তি ঘটল একদিন। ১৯৬৮ সালের ১ এপ্রিল। ওই দিন তদানীন্তন ইউনাইটেড ব্যাংকে (এখন জনতা ব্যাংক) সরাসরি গ্রেড-২ অফিসার হিসেবে কাজে যোগদান করি। ব্যাংকের ওই সময়ের প্রাদেশিক কার্যালয়-সংশ্লিষ্ট ঢাকাস্থ মতিঝিল লোকাল অফিসে হয় ব্যাংকের কাজে আমার হাতেখড়ি। জীবনের প্রথম কাজে প্রথম দিনই কাস্টমারের চেকের বিপরীতে টোকেন ইস্যু করার পর টোকেন এবং চেক দুটোই পার্টির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এটা যে ভুল ছিল, তা বুঝতে পারি তখন, যখন ওই ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিহারি কর্মচারী বেশ রেগে উঠে আমাকে বলে, **ইয়ে, কিয়া কিয়া আপনে?** তারপর শেখানোর ভঙ্গিতে অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় আবারও বলেন, **চেক অন্দর রাহেগা; টোকেন বাহার যায়েগা।** তখন দারুণ লজ্জা পেয়েছিলাম, প্রথম দিনই এমন একটা silly ভুল করার জন্য। তবে সিরিয়াস হয়েছিলাম, যাতে অনুরূপ ভুল আর কখনও না হয়। তারপর আরও বেশ কয়েক দিন ওই টোকেন ইস্যুর ডেস্কেই কাজ করেছিলাম। তবে আর কোনো ভুল করিনি সেখানে।

এরপর কিছুদিন ব্যাংকের পুরান ঢাকার ঠাঁটারীবাজার শাখায় কাজ করে সেখান থেকে বেশ কয়েক মাসের জন্য ইউবিএল (United Bank Limited) স্টাফ কলেজ হতে ট্রেনিং নেয়ার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমাই আকাশ পথে। আড়াই ঘণ্টার ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর অবশেষে আমার সেই স্বপ্নিল করাচির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখি। উড়োজাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতা সেটাই আমার জীবনে প্রথম। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে অনেক উঁচু দিয়ে যখন

একটানা ভু-ভু শব্দ করে প্লেন উড়ে যেতে শুনতাম এবং অবাক হয়ে দেখতাম, তখন ভাবতাম কেমন করে ওড়ে? এতটুকু জায়গার মধ্যে মানুষ ওঠা-বসা করে কী করে? খাবার কোথায় পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ কত জিজ্ঞাসা ছিল আমার মনে। যাহোক, ওইদিন প্লেনে চেপে আমার শিশু মনের সব অবুঝ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম। ক'ঘণ্টার আকাশে ওড়া খুব উপভোগ করেছিলাম। এতটুকু ভয় পাইনি। কারণ, আমি তখন বেশ উৎফুল্ল ছিলাম; দুটি কারণে– এক. অনেক প্রতীক্ষার পর ভালো চাকরি পেয়েছি; আর, দুই. আন্তর্জাতিক রুটে লম্বা সময়ের জন্য উড়োজাহাজে চড়ে যোজন পাড়ি দিচ্ছি।

অনুপ্রেরণা এবং আরাধনা

Job Knowledge-এর প্রয়োজনে ইউবিএল (United Bank Limited) বেসিক টেনিংয়ে বাংলাদেশ (তখন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আমরা ২৫ জন গিয়েছিলাম এক ব্যাচে। যাওয়ার আগে অফিস থেকে আমাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে আগাম বেতন দিয়ে বলা হয়েছিল, হাফ ডজন শার্ট, হাফ ডজন প্যান্ট, হাফ ডজন টাই এবং হাফ ডজন জোড়া জুতা কিনে সঙ্গে নিতে। এখনকার ছেলে-মেয়েরা একথা শুনে হয়তো হাসবেন অথবা অবাক হবেন এই ভেবে যে, ৫০০ টাকায় কি অত জিনিস হয়? আসলে মুদ্রাস্ফীতির (Inflation; Bagfull of Money but Handfull of Goods) চাপ তখন অতটা ছিল না। বলা যায়, Deflation (Handfull of Money but Bagfull of Goods) ছিল। চাল ছিল ৬ আনা সের, সোনা ছিল ৪০ টাকা ভরি, আর সাধারণ চাকুরের বেতন ছিল মাসে ২০-৫০ টাকা। তাই ওই ৫০০ টাকার মধ্যেই প্রায় সব জিনিস কিনে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। অগ্রিম বেতন দিয়ে আমাদের আরও বলা হয়েছিল, এক কাপড় পুনরায় না ধুয়ে দ্বিতীয়বার পরা যাবে না। প্রতিদিন সু-পলিশ করাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সব সময় ধোয়া, ফ্রেশ কাপড়-চোপড় পরতে হবে। ঝকঝকে, চকচকে হয়ে স্মার্টলি চলতে হবে। আমাদেরকে তখন বলা হতো, **ইউবিএল**-এর **সিএসপি** (Civil Servant of Pakistan)| অর্থাৎ ওই সময় **CSS** (Central Superior Service) সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং দুর্লভ আকর্ষণীয় এবং উঁচু মানের সরকারি চাকরি ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিক মেধাবী এবং স্মার্ট ছেলেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য মাড়িয়ে তাদের ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মেধার জোরে ওই চাকরি ছিনিয়ে নিতে হতো। তারাই সরকারি প্রশাসনে উঠতি ড্রাইভিং ফোর্স হতো। যদিও তাদের (সিএসপিদের) বেতন ছিল মাসে ২৫০ টাকা, আমরা পেতাম মাসে ৪০০ টাকা। আবাসনের জন্য আমাদেরকে সুসজ্জিত বাসা দেওয়া হতো (থ্রি ব্যান্ড রেডিওসহ)। তখন

টেলিভিশন ছিল না। ভালো ক্লাবের বাধ্যতামূলক মেম্বরশিপের মাসিক চাঁদাও ব্যাংক থেকেই দেয়া হতো। সামগ্রিক ব্যাপারটা ছিল দারুণ গর্জিয়াস!

ইউবিএল (United Bank Limited) স্টাফ কলেজের ১৭তম ব্যাচের 'বেসিক ট্রেনিং' আমাদেরকে শুধু ব্যাংকার নয়, ব্যবসায়ীও বানিয়ে দিয়েছিল, যাতে আমরা গ্রাহকদের ব্যবসা ভালো করে বুঝতে পারি এবং আমাদেরকে তথা ব্যাংককে কেউ ঠকাতে না পারে। আমরাও প্রগ্রেসিভ ইউবিএল সদস্য হতে পেরে গর্বিত হয়েছিলাম। Sense of Belonging আমাদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে কাজ করতে শুরু করে সেই গোড়াপত্তন থেকেই।

চাকরিটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। তাই এটাকে পবিত্র আমানত হিসেবে, পরম ভক্তির সঙ্গে নিয়েছিলাম। কারণ চাকরিবিহীন হতাশ জীবনে চাকরি খোঁজার দিশেহারা কষ্টের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ৫০০ জনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে বিনা তদবিরে চাকরিটি পেয়েছিলাম। বেতনও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তখন মনে হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থেকে পড়ার সময় মাসে ৫০ থেকে ৬০ টাকায় চলতে হতো। আর এখন পাব মাসে ৪০০ টাকা। বিরাট ব্যাপার! তাই ব্রত নিলাম, চাকরিটা ধরে রাখতেই হবে। প্রথম দিন থেকেই নিবিড় মনোযোগ দিয়ে কাজে নিবিষ্ট হলাম এই কারণে যে, আমার ধরপাকড়ের কেউ ছিল না। চাকরি রক্ষার্থে প্রত্যয়ী হওয়া, পরিশ্রমী হওয়া এবং সৎ থাকা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না আমার কাছে। প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম, বেশি বেশি কাজ করে সবার মন জয় করব। জানতাম, ভুল করলে নিস্তার নেই। কারণ, আমি দেশের এমন একটি অখ্যাত এবং অনুন্নত এলাকার মানুষ, যেখান থেকে এখন পর্যন্ত দুইজন অর্থাৎ ডা. এম মালিক এবং নোয়াজেস আহমেদ ছাড়া আর কেউ মন্ত্রী হননি। আবার সেক্রেটারীর ক্ষেত্রেও 'সবে ধন নীলমনি' বা 'অন্ধের যোষ্ঠীর' মতো ২/৩ জনের বেশি নেই আমার জেলা থেকে। 'মানিকের খানিক ভালোর' মতো তারাই আমাদের গর্ব যদিও এলাকার জন্য তারা তেমন কিছুই করেননি। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাউকে চাকরি দিতে তেমন এগিয়ে আসেননি, আসতে পারেননি। কারণ, স্ব-স্ব চাকরিতে তারা নিজেরাই নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ছিলেন না, অসহায় ছিলেন, এতিমের মতো। তাই তাদেরও ভয় ছিল, দুর্ভাবনা ছিল, ভুল করলে বা নিয়মের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটালে (দুর্নীতি দূরের কথা) তাদেরকে রক্ষা করার জন্য পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই, দেশের অন্যান্য শিক্ষা-বর্ধিষ্ণু এবং উন্নত এলাকার মতো। তাদের বাধ্যতামূলক সততা এবং একাগ্রচিত্ত-কাজের অপরিহার্যতা তাদেরকে স্ব-স্ব কর্ম পরিসরে বেশ যশের প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। তদানীন্তন এই ভাবধারার মধ্যেই চাকরিতে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তাই তো আমাকেও নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য সচেতন এবং সক্রিয় থাকতে হয়েছে আজীবন।

উল্লেখ্য, এত সচেতন হয়ে এবং সিরিয়াসলি কাজ করার পরও চাকরিজীবনে পদোন্নতির প্রথম ধাপ পেরোতে আমার সময় লাগে সুদীর্ঘ ১৩ বছর, অর্থাৎ ১৯৬৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত। অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য। এমনটি হয়েছিল শুধু আমার একার নয়, সমসাময়িক সহকর্মীসহ সবার। কারণ, ঘাটতি আর সংকটের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্ম নেয়া আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে Settle হতে অনেক সময় লেগে যায়। তারপর তার ব্যাংকিং সেক্টরকে আত্মীকরণ বা জাতীয়করণ করার মতো জরুরি নতুন এবং অনভিজ্ঞ কাজের ব্যাপ্তি ও পরিসর এই সেক্টরের তৎকালীন কর্মীদের পদোন্নতি বিলম্বিত করেছিল। তার সরল সমীকরণ বুঝতে তখন অসুবিধা হয়নি আমাদের। তাই আমরা হতাশ হইনি, ভেঙেও পড়িনি। চাকরিটা তখন ধরে রাখাই ছিল আমাদের সবার কাছে মুখ্য বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশ না হলে অবাঙালিদের দুর্দান্ত দাপটে চাকরিটা কোনো রকমে তখন টিকিয়ে রাখতে পারলেও শেষ বয়সে এভিপির ওপরের র‍্যাংকে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না। তবে দেশ ভাগ হওয়ার ফলে মনে হয়েছিল, একদিন না একদিন ওপরে ওঠা যাবে। এমন প্রচ্ছন্ন অভয় প্রশান্তি এনে দিয়েছিল আমাদের দড় মনে। তাই আমাদের ধৈর্য এবং দূরদর্শিতাই পরবর্তীতে আমাদের কাউকে কাউকে ব্যাংকের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন করতে পেরেছিল; যোগ্যতার বলে না হলেও অন্তত জ্যেষ্ঠতার আশীর্বাদে। এ কারণে, সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে, কর্ণধার হিসেবে ব্যাংক চালাতে যতটুকু অবদান রাখতে পেরেছিলাম, তার জন্য বড়াই করি না। এ কারণেই এ ব্যাপারে আমার সচেতন স্ব-মূল্যায়নের কথা আগেই বলেছি, আত্মসমালোচনার নিরিখে।

এখন, **আত্মরক্ষার** প্রয়োজনে, যুক্তির খাতিরে বলতে হয়, এমডি হিসেবে আমরা খুব খারাপ করে থাকলে ওইসব ব্যাংক এতদিন খুঁড়িয়ে হলেও চলতে পারত না। নতুন বাংলাদেশের রূপান্তরিত ব্যাংকে প্রাথমিক পর্যায়ে তৎকালীন সবার অপুষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে সুনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে আবশ্যকীয় Cost Effective CLASS ব্যাংকিংয়ের পরিবর্তে MASS ব্যাংকিং করতে হয়েছিল আমাদেরকে। কারণ, ওই সময় পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন, অর্থাৎ Too many clients, but too few Banks; একালের চিকিৎসার মতো। আজকাল চিকিৎসকদের কাছে প্রতিদিন এত রোগী আসে যে, তারা সময় নিয়ে কোনো রোগীকেই ভালোভাবে দেখতে পারেন না। আবার ফিরিয়েও দিতে পারেন না। কারণ, রোগীরা দূর-দূরান্ত থেকে অনেক আশা ও বিশ্বাস নিয়ে কষ্ট করে আসেন তাদের কাছে। অবশ্য ওই চিকিৎসকদের প্রতি রোগীদের অঢেল বিশ্বাসের কারণে তাদের স্বল্প দেখায়ও অনেক সময় অনেক রোগী সুস্থ হয়ে যায়। তবে নিয়মিত চর্চা, গবেষণা এবং প্রয়োজনীয় পড়াশোনার অভাবে চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, ফলে দেশি চিকিৎসার মানও বাড়ে না। তাই তো সামর্থ্যবান রোগীরা ভালো চিকিৎসা পেতে ছুট দেয় বিদেশে। তাতে

স্ব-দেশের কষ্টার্জিত সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার ওপর অপরিহার্য চাপ পড়ে, যা জরুরি আমদানি ফান্ডে ঘাটতি ঘটায়। এছাড়াও এতে দেশের চিকিৎসা-শিল্প বিদেশনির্ভর হয়, দেশের মান বাড়ে না তাতে। চিকিৎসকদের অগণিত রোগী দেখার মতো, MASS ব্যাংকিংয়ের ধকল সামলাতে গিয়ে ব্যাংকাররা পর্যাপ্ত পড়াশোনা এবং গবেষণা না করতে পারার কারণে তাদের দক্ষতা তেমন বাড়েনি। দক্ষতা না বাড়ার আর একটা করুণ কারণ হচ্ছে ঘন ঘন মাইগ্রেশনের অশুভ প্রভাব। একালের অনেক অতি অভিলাষী ব্যাংকার লোভে মত্ত হয়ে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ৫ বছরে ৪-৫টি ব্যাংক বদলিয়ে ৫টি প্রমোশন বাগিয়ে নিয়ে ধাই ধাই করে ওপরে উঠে যাচ্ছে হফ স্টেপ জাম্পের মতো। এতে তাদের বেতন, সুবিধা, স্ট্যাটাস সবই বাড়ছে, কিন্তু দক্ষতা নয়। এটা একটা নিরেট ধ্বংসকারী বাস্তবতা। পর্যাপ্ত দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে বস হয়ে উপরে উঠে বসে তারা বিপদে পড়ছে, সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না, ভুল সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। নিচের কেউ খারাপ কিছু করলে তারা তা ধরতে পারছে না। আবার, নিচু স্তরের মধ্যে সৎ এবং দক্ষ কেউ থাকলে ক্যারিয়ারের ভয়ে তারাও নবাগত বসদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না। আবার সইতেও পারছে না। এছাড়া ক্ষতির জন্য কিছু কর্মীর অসততা এবং অনৈতিকতা তো আছেই। এসব কারণে ব্যাংক সংকটে পড়ছে। তাই, ইদানীং ব্যাংক-জালিয়াতির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। সবাই মনে করছে, ব্যাংক তো ভালোই চলছে, যথেষ্ট প্রফিট করছে। কিন্তু এটা তারা হিসাব করছে না যে, তাদের ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিপরীতে অর্জিত আয়ের হার যথাযথ আনুপাতিক কি-না।

অপরদিকে, এই সুযোগে স্থানীয় বিদেশি ব্যাংক, শুধু বাছা বাছা ভালো কাস্টমার নিয়ে নীরবে CLASS ব্যাংকিং করার মাধ্যমে অধিক মাত্রায় আয় করে, সেই আয়ের টাকা, মূল্যবান বৈদেশিক মূদ্রায়, স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছে, বৈধ পথে, যাকে বলা যায়, Legal FC Rackteering. প্রাসঙ্গিক বিধায় বলতে হয় যে, আলোচিত আত্মঘাতী-মাইগ্রেশন বন্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি অনুশাসন বা নীতিই যথেষ্ট। যাতে থাকবে, ওপরের গ্রেডে পদোন্নতি পেতে বা Lift নিতে হলে অন্য সব গুণাবলির সঙ্গে চলমান গ্রেডে এক বা একাধিক ব্যাংক মিলিয়ে ন্যূনতম ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকতে হবে। তবে Accelerated Promotion-এর বেলায় এই বাধা প্রযোজ্য হবে না, যা একটি স্বতন্ত্র এবং সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় চলবে। ব্যাংকিং সেক্টরের স্বার্থে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এরূপ ভূমিকা বর্তমান সময়ের জরুরি দাবি। কারণ, দেশের ব্যাংকিং অঙ্গনে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি না হলে নিয়ম-নীতি উপেক্ষিত হয়ে সেক্টরটি অধিক রোগাক্রান্ত হবে, যা সবার জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। অপরদিকে, নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের এরূপ নীতি অফিসার বা কর্মীদের মানবিক অধিকার হরণ করবে না।

বরং তাদের অধিকাংশই সেই অনুশাসন অবশেষে বরণ করে নেবে, প্রতিষ্ঠানে তাদের টিকে থাকার মহৌষধ বা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বাধ্যতামূলক সুযোগ হিসেবে। তার ফলে ব্যাংক এবং তার কর্মী উভয়ই সব দিক দিয়ে উপকৃত হবে, নিরাপদ থাকবে।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, শেখার আগ্রহের অভাব, কথিত ধ্বংসাত্মক মাইগ্রেশন, কর্ম-অনীহা, লোভী Un-ethical Banking Practice ইত্যাদি দুর্বলতার কারণে স্থানীয় ব্যাংকিং সেক্টরের দক্ষতায় এবং সার্ভিসে দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে। এর সংক্রামণ গোটা ব্যাংকিং সেক্টরকে আগের তুলনায় অধিক ব্যয়বহুল সংস্কারের পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ হতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

যাহোক, পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অভাবে ব্যাংক চালাতে সাবেক এমডিদের হয়তো কিছু ভুল হয়েছিল। তবে তাকে কোনো অবস্থাতেই দুর্নীতি বলা যাবে না। এ কারণেই, স্বাধীনতা উত্তর-কালের এমডিদের হয়তো সুশীল সমাজ নির্দয়ভাবে অপদার্থ বলবেন না। তাদের অকুণ্ঠ আন্তরিক অবদানকে ব্যর্থ বা অকার্যকর না ভেবে কিছুটা হলেও মূল্যায়ন করবেন। যেমন, পুলিশ কিছুই করে না, এরূপ ঢালাও অপবাদ মুছে যেতে পারে, যদি একদিন ঘোষণা দিয়ে কিছু সময়ের জন্য সব পুলিশকে ডিউটি থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। যাহোক, আমাদের অর্থাৎ সাবেক এমডিদের কর্মের মূল্যায়নের ভার ভবিষ্যৎ সময়ের ওপর এবং সুধীজনদের সুচিন্তিত ও নিরপেক্ষ বিচারের ওপর ছেড়ে দিলাম।

এখানে একটি কথা বলতে হয়, ভয়ে হোক আর ভক্তিতে হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমি সারা জীবনের চাকরিতে, EPISTOMOLOGY Theory মেনে কাজ করেছি। অর্থাৎ, How do you know, what you know– এই সূত্রের ব্যবহার আমাকে Greed, Ambition, Hunger & Power-এর মতো চারটি শক্তিশালী Vices-কে নিয়ন্ত্রণে রেখে নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য বলিষ্ঠ সহযোগিতা করেছে সব সময়। কাজে আমার কখনও ভুল হয়নি, একথা বলি না। তবে এটুকু বলতে পারি, ভুল হলেও তা ইচ্ছাকৃত নয়, অনিচ্ছাকৃত এবং ওই ভুলের বিষয়টি নিজের নোটিশে আসার পর কোনো অবস্থাতেই অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি আর কখনও ঘটতে দিইনি, এটাও ঠিক এবং তাতে Vital ঠিক থেকেছে।

কাজ শেখা

এরূপ অনমনীয় নৈতিক দৃঢ়তা নিয়েই পার হয়ে গেছে আমার সুদীর্ঘ চ্যালেঞ্জিং তথা সবল কর্মজীবন। যা মচকিয়েছে অনেক বার, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভাঙেনি একবারও। যাহোক, পরবর্তী প্রায় প্রত্যেকটি সময়মতো পদোন্নতির পুরস্কারের

সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া বৃহত্তর দায়িত্বের গুরুভার আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিরলস শ্রম দিয়ে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত করেছে, সাহস জুগিয়েছে সব সময়। ব্যাংকের সব বিভাগে, বিশেষ করে ব্যাংক-চাকরিতে সর্বজনবিদিত তথাকথিত আকর্ষণীয় ডিপার্টমেন্ট যথা ফরেন এক্সচেঞ্জ ও ক্রেডিট এ দুটি জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে যত্নসহকারে কাজ করে দক্ষতা বলব না, অনেক অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছি। 'জুতা-সেলাই' থেকে 'চণ্ডী পাঠ' পর্যন্ত ব্যাংকের হেন কাজ নেই, যা আমি কখনও নিজ হাতে করিনি। তারপরও কিছু কাজ যা অজানা ছিল, উঁচুতম অবস্থানে পদোন্নত হওয়ার পরও, সেখান থেকে নিচুতম অবস্থানের লোকদের নিজের অফিসে সঙ্গোপনে ডেকে নয় বরং খোলাখুলিভাবে তাদের টেবিলে সরাসরি গিয়ে সেইসব কাজ তাদের কাছ থেকে অকপটে শিখে নিতে হীন-সংকোচ বা লজ্জা বোধ করিনি কখনও। শেখার সীমাহীন আগ্রহই ওই নমনীয় বোধোদয় এনে দিয়েছিল আমার মধ্যে। তাই, সেই শেখা সব পরিস্থিতিতে যে কোনো কঠিন কাজ সহজে করে ফেলতে আমাকে দারুণভাবে সহায়তা করেছে। পূর্ণ সিলেবাস পড়ে পরীক্ষা দেয়ার মতো; কোচিংয়ে সীমিত প্রশ্নের উত্তর পড়ে দেওয়ার মতো নয়।

আমি লম্বায় খাটো (৫´-৩´´), ব্যাড়ে আঁটো, মেদ-ভুঁড়িহীন একজন সুঠাম মানুষ। না নাদুস-নুদুস না হ্যাংলা। আমি Manly বা স্টেজ ফিটিং নই কখনই। তবে আমার নির্লোভ প্রত্যয় এবং কঠোর শ্রম (Commitment & Hardwork) ওই দৈহিক ঘাটতি পূরণ করে সফলভাবে কাজ করার জন্য আমাকে সব সময় সব জায়গায় ফিট করে দিয়েছে। তাই তো একাধিক ব্যাংকে, নতুন অবস্থায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অপ্রস্তুত হতে হয়নি কখনও। যদিও প্রায় সব জায়গায়ই প্রাথমিক হোঁচট খেতে হয়েছে। এ বিষয়ে সব কর্মস্থলের কাহিনী বলতে গেলে লেখা দীর্ঘ হবে; আপনারা ধৈর্য হারাবেন পড়তে। তাছাড়া আমাকে আবার লেখার পরিসরের সীমানা বেঁধে দেয়া হয়েছে, যা ইতিমধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। তাই লেখা খাটো করার দিকে খেয়াল না দিয়ে পারা গেল না।

আসলে, Commitment & Hardwork, অর্থাৎ, 'প্রত্যয়' এবং 'কঠোর শ্রম' সফল কাজের সচল হাতিয়ার। তবে এ দুটোর ধারণ এবং পরিচালন খুবই কষ্টের। কারণ, এতে ভোগের লালসা এবং লোভের তীব্র তাড়না ত্যাগ করতে হয়। কোনো ফটকাবাজি, ধাপ্পাবাজি চলে না সেখানে। কোনো জাঁকজমক বা আড়ম্বর থাকে না, থাকে না কোনো আকর্ষণ। তদবির-তোয়াজও চলে না। এজন্যই এই রাস্তায় মানুষ সহজে হাঁটতে চায় না। অপরদিকে, তোষামোদ করে, পয়সা দিয়ে হয়তো দক্ষতার সনদ কেনা যায়, তবে তা নিরাপদ এবং স্বস্তিদায়ক হয় না। এসব বুঝেই আমি মেকি দক্ষতার সুনাম জোগাড় করার অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল পথ ছেড়ে এই নিখরচার তথা কষ্টকর ত্যাগের রাস্তায় পা বাড়িয়েছিলাম। কারণ, আমি জানতাম, **ভোগে সুখ নেই, ত্যাগে সুখ।** এই দর্শন আমার কাছে প্রমাণিতও বটে।

মহান আল্লাহ্ পাক আমাকে দিয়ে নিরপেক্ষতার সঙ্গে Law of the Land, Rules of the Bank, Procedure of the Bank অনুসরণ করিয়ে এবং Ordinary Prudence বা Bankers' Wisdom প্রয়োগ করিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন এবং এতে আমার নিরাপত্তা বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে, সঠিক কাজ করার সৎ সাহসও বেড়েছে। এ সবই শক্তি হিসেবে বলিষ্ঠভাবে কাজ করেছে আমার মধ্যে সব সময়। জীবনে Knowledge is Power এই প্রবাদের যথার্থতার প্রমাণ পেয়েছি, অনেক। তাই ভালো কর্মীর পরিচয়ে বাঁচতে চাই। দক্ষতার দাবি করি না; পাছে কথিত দাম্ভিক-দক্ষ লোকদের রোষানলে পড়ে যাই এই ভয়ে। মনে করি, Low Profile বা মধ্যম পন্থায় চলাই উত্তম। তাই তো একটি কবিতা বলে **উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।**

বদলির উপকারিতা

চাকরি-জীবনে বদলি কখনও চেয়ে নিইনি। বরং আমার অজ্ঞাত এবং পূর্ব নোটিশ ব্যতীত সব বদলিই মান্য করেছি অম্লান বদনে। খুশি হয়ে হাসি মুখে সব সময়ই কর্তৃপক্ষের বদলির আদেশ শিরোধার্য করে সময়মতো দৌড় দিয়েছি নতুন কর্মস্থলে। তাই তো অনেক বেশি সংখ্যক পরিবেশে পরিসরে এবং পরিস্থিতিতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। তবে বদলি হয়েছি কম। কারণ, যেখানেই গিয়েছি, আমাকে তারা ছাড়তে চায়নি। অজানা পরিবেশে বদলির কারণে বেশি করে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরেছি। ফলে ক্রস-ভ্যারাইটি সমস্যা সমাধানের কৌশল শিখেছি, অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, যা অসীম শক্তি হয়ে আমাকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে **'৬ কে ৯ নয়' '৬ কে ৬** ধরেই'। এ কারণে আমার জীবনের কাছে, জীবন-পরিমণ্ডলের সবার কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

চাকরিজীবনের প্রতিটি ধাপের অনেক অপ্রিয়, কষ্টকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিকূলতার মধ্যেও নিরপেক্ষ থেকে, কিছু না কিছু স্মরণীয় কাজের স্পষ্ট নিদর্শন প্রায় সব কর্মস্থলেই রেখে আসতে সক্ষম হয়েছি। তবে ওইসব কাজে নিজের কৃতিত্ব দাবি করি না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, সব কৃতিত্বই মহান সৃষ্টিকর্তার এবং ওইসব স্থানের মেধাবী ও ত্যাগী সহকর্মীদের, যাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাকে সহায়তা করেছে ভালো করতে। আসলে মহান আল্লাহ্ পাক আমাকে দিয়ে ওইসব কাজ করিয়েছেন। **তার হুকুম ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না, পড়েও না।** এছাড়া, তিনি আমাকে বিশ্বাস করিয়েছেন, কাউকে তিনি ওপরে টেনে ওঠাতে চাইলে তার মাথার একটি চুল ধরে ওপরে টানবেন, অপরদিকে লাখো মানুষ তাকে নিচের দিকে টেনে ধরলেও তার ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারবে না।

কর্মকাল

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বর্ণনা সংক্ষেপে দিতে গেলে বলতে হয়, ১৯৬৮ সালের সেই ১লা এপ্রিলের সকালে ব্যাংকিং জগতে আমার যাত্রা শুরু থেকে জিএম হিসেবে দুই বছরসহ ২৬ বছর, অর্থাৎ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত, **জনতা ব্যাংকে; বিকেবি**-তে ১ বছর ৩ মাস, **সোনালী ব্যাংক; লন্ডনের** ইউকে অপারেশনের সিইও পদে জিএম হিসেবে প্রায় দু'বছর; **অগ্রণী ব্যাংকের** প্রধান কার্যালয়ে জ্যেষ্ঠতম জিএম হিসেবে প্রায় এক বছর (এক মাস এমডির অতিরিক্ত দায়িত্বসহ); **শিল্প ব্যাংকের** এমডি-র দায়িত্বে প্রায় ১৫ মাস; **রূপালী ব্যাংকে** এমডি হিসেবে প্রায় ১২ মাস এবং সর্বশেষ সোনালী ব্যাংকে এমডি হিসেবে প্রায় তিন বছর (দুই বছর একসঙ্গে এক্সটেনশন সহ) কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। বর্তমান পর্যন্ত সময় হিসেবে নিয়ে আমার প্রায় ৪৫ বছরের কর্মজীবনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দুটি ঘটনার বিশেষ স্মৃতি এই উপাখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। তাই তার উল্লেখ না করে পারা গেল না।

প্রথম ঘটনা, ১৯৯৩ সালে ব্যাংকিং সেক্টরের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলির সমন্বিত প্রক্রিয়ার আওতায় জিএম হিসেবে আমার পদোন্নতি। ৯-১০টি সরকারি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ৭২ জন যোগ্য ডিজিএমের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, অর্থাৎ, ৭২তম বা ওই তালিকার শেষ ব্যক্তি হয়েও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানীন্তন গভর্নর-প্রধানের প্রমোশন কমিটির মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে জনতা ব্যাংকের ইতিহাসে এক বিরল এবং Unbroken রেকর্ড সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় ঘটনা, ১৯৯৬ সালে ৫০ জন জিএমের থেকে শর্ট-লিস্টিং পরবর্তী ৪ জনের মধ্যে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী-প্রধানের নির্বাচন কমিটির মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে লন্ডন সোনালী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বা সিইও হিসেবে পদায়ন পাওয়া।

লন্ডন ট্র্যাজেডি

ওপরের দুটি স্মরণীয় বিরল ঘটনা আমাকে দুর্দান্ত সাহসী হয়ে আরও বেশি কাজ করার জন্য যারপরনাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তবে লন্ডনের অবস্থান আমার জন্য আদৌ সুখকর হয়নি। কারণ, সোনালী ব্যাংকের ইউকে অপারেশনের আবহমান লোকসানের কারণে তথাস্থ সেন্ট্রাল ব্যাংকের (ব্যাংক অব ইংল্যান্ড) সিদ্ধান্ত এবং তার সপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে প্রয়োজনীয় অপরিহার্য সংস্কারের ৮টি কাজের মধ্যে ২টি বিশেষ স্পর্শকাতর কাজ {যথা-১. ওখানকার

তৎকালীন সব অর্থাৎ ৭০ জনের বেশি লোকাল-বেইজড বাংলাদেশি কর্মী বাহিনীকে স্থানীয়দের দিয়ে Replace করা এবং ২. লন্ডনস্থ বাংলাদেশি ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডের সমুদয় খেলাপি ঋণ (সম্পূর্ণ ঋণের ৯৩.৭%) অনূর্ধ্ব এক বছরের মধ্যে আদায় করা অথবা ওই দায় বাংলাদেশে ট্রান্সফার করে সোনালী ব্যাংক ইউকের ব্যালান্স শিট ক্লিন করা} আমাকে ওই দুই গ্রুপের সম্মিলিত-স্বার্থান্বেষী রোষানলে ফেলে দিয়েছিল। তাদের চাপা অথচ বলিষ্ঠ সমন্বিত আন্দোলন শেষমেশ আমাকে অপদস্থ করে মেয়াদ-পূর্তির আগেই লন্ডন থেকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছিল।

বাল্যকালে বাবা হারিয়ে মায়ের বাবার বাড়িতে ফেরত আসার ধাক্কা ধীরে ধীরে সামলাতে পারলেও, পরিণত বয়সে নিজ কর্মকালে স্ব-অর্জিত সম্মান এবং স্ব-লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গর্ব ভরা অস্তিত্ব হারিয়ে দেশে ফিরে আসার চরম ব্যথা আমাকে নতুন করে আঘাত করে আরও গভীরভাবে। সেই বড় ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসার পর, লাইফ-সাপোর্ট নিয়ে, সাময়িকভাবে বেঁচে থাকার মতো, আমাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুখ লুকিয়ে কাজ করতে হয়েছে বেশ কিছুদিন।

সেখানে থাকতে দেখেছি, আমার জুনিয়ররা আমাকে ডিঙিয়ে পদোন্নতি নিয়ে হাসতে হাসতে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে আমার সামনে দিয়ে। তখন বুকটা ফেটে গেছে। এভাবে প্রায় বছরখানেক যাওয়ার পর আমার লাইফ সাপোর্ট শেষবারের মতো খুলে নেয়ার কৌশল হিসেবে আমাকে ডিএমডি বানিয়ে এমডির কারেন্ট-চার্জে দায়িত্ব দেয়া হয় শিল্প ব্যাংকের সর্বজনস্বীকৃত প্রায়-অসম্ভব সংস্কারের কাজ করার জন্য। শর্তযুক্ত প্রমোশনের ওই আদেশ তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল, ফাঁসির আসামিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ দিয়ে বিদ্রূপাত্মক করুণা করার মতো। তখন প্রমাদ গুনেছিলাম, কখন আমার কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হবে।

যাহোক, আমার মরণ-পণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভাগ্যক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে ওই ব্যাংকের দুরারোগ্য Nose-Down অবস্থা U-Turn নিতে শুরু করে। তারই পুরস্কার হিসেবে হয়তো আমাকে শিল্প ব্যাংকের এমডি হিসেবে Confirm করা হয়। পরবর্তীতে অপেক্ষাকৃত বড় অর্থাৎ রূপালী ব্যাংকে এবং তার কিছুদিন পর আরও বড় অর্থাৎ দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক সোনালী ব্যাংকে এমডির চেয়ারে বসানো হয়। পরম করুণাময়ের অপার কৃপায় আমার চাকরিজীবন অকাল-মৃত্যুর নিশ্চিত ভয়াবহ আশঙ্কা কাটিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থতা ফিরে পায়। এভাবে প্রায় দু'বছর কাটার পর অলৌকিকভাবে সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসেবেই অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ওই ব্যাংকের ইউকে অপারেশনের (আমার ছেড়ে আসা) সংস্কার-উত্তর সোনালী এক্সচেঞ্জ ইউকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রধান অতিথি হিসেবে লন্ডনে উপস্থিত

থাকার সুযোগ হয়। **There is always a light at the end of Tunnel**– এই চিরন্তন প্রবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয় আমার জীবনে নতুন করে। তাই তো বিশ্বাস না করে পারা যায় না যে, **আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।**

জিন্দা-লাশ জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গোটা কর্মজীবনে একাধিক ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের অনেক প্রিয় সহকর্মীদের মনে যৎসামান্য হলেও যে কিছুটা জায়গা করে নিতে পেরেছিলাম, তার প্রমাণ মেলে, যখন আমি হঠাৎ করে তাদের সামনে গিয়ে পড়ি। তাদের চোখের মুগ্ধতা নির্মল বিশ্বাস দেয় যে, তারা আমাকে পছন্দ করে। আবার কখনও নিজের প্রয়োজনে পূর্বপরিচিত বর্তমান ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে তাদের নবীনদের অর্থাৎ ব্যক্তিগত সহকারীদের মাধ্যমে ফোনে কথা বলতে চাইলে তারা (নতুনরা) আমার পরিচয় শুনে বলে, 'স্যার, আপনার কথা অনেক শুনেছি, বেশ ভালো বলে সবাই।' এতে মনে হয়, আমার ছেড়ে আসা কর্মস্থলগুলোর সহকর্মীরা আমাকে এখনও যে ভক্তি দেখায় তা ভান নয়, ভণ্ডামি নয়, কৃপণতা নয়, করুণাও নয়। বরং তা নির্ভেজাল, আন্তরিক। তখন মনটা জুড়িয়ে যায়, পরম শান্তিতে। তবে, এর ব্যতিক্রম নেই ভেবে কখনও অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করি না মনে।

চলতি অবস্থা

এরপর বলতে হয় যে সোনালী ব্যাংক থেকে অবসর নেয়ার পর বর্তমানে আমি তৃতীয় প্রজন্মের একটি ভালো ব্যাংক, অর্থাৎ, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি। আমার জানামতে, এটা কমপ্লায়েন্ট ব্যাংক। সোনালী ব্যাংক হতে অবসরে যাওয়ার পরপরই, এই ব্যাংকের এমডি পদের জন্য চাকরির অফার আমার কাছে এলেও আমি তখন অনিবার্য ব্যক্তিগত কারণে তা গ্রহণ করতে পারিনি। তবে পরবর্তীতে এই ব্যাংক আমাকে **কনসালটান্ট** হিসেবে নিয়োগ দেয়। ওই সময়ে অবসরে থাকা এমডিদের অনেকেই আমার মতো কনসালট্যান্ট বা অ্যাডভাইজার হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োজিত ছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের মধ্যে দু'একজনের অদূরদর্শী অহম এবং স্বার্থপর কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক তখন পাইকারি হারে সব ব্যাংকের তৎকালীন অ্যাডভাইজার এবং কনসালট্যান্টকে 'ইনসালট্যান্ট' বানিয়ে প্রস্থান করিয়ে দেয়ার নির্দেশনামা জারি করতে বাধ্য হয়েছিল। মাফ করবেন, ইনসালট্যান্ট শব্দটি হয়তো পুরোপুরি ব্যাকরণ শুদ্ধ নয়। তথাপি আমি এটা ব্যবহার করেছি, নিরীহ ভুক্তভোগী হিসেবে আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া সেই নির্মম কশাঘাতের তীব্র কষ্ট কাব্যিক সুরে শব্দে ও ছন্দে মিলিয়ে কিছুটা হালকা

করে বোঝানোর জন্য। মনে হয়, আমার মতো অপর সবাই তখন অনুরূপ কষ্ট পেয়েছিলেন। এখন অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক অপেক্ষাকৃত উদার হয়ে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে কনসালটয়ান্ট এবং অ্যাডভাইজার হিসাবে, বিভিন্ন ব্যাংকে নিয়োগের অনুমতি দিচ্ছে। ভালোই করছে। কারণ, **Old is Gold**।

বলাবাহুল্য, মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অফিসারদের Get-up, কাজের মান, দক্ষতা এবং সর্বোপরি নৈতিকতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ট্রেনিং-কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে আমি বিবেকের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। আমি চাচ্ছি, সারা জীবন দেশ-বিদেশ ঘুরে হাতে-নাতে কাজ করে যা শিখেছি তা এই প্রজন্মকে দিয়ে যেতে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, পড়ার এবং শেখার প্রতি জাতীয় অনাগ্রহের প্রবল ঢেউ আমার ভালো করার এই আপ্রাণ প্রয়াস এবং চাওয়ার বলিষ্ঠ উদ্যমকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্যান্ডি বা সিডর হয়ে। ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে দেশের সব ব্যাংকের অবস্থাই হয়তো এক এবং অভিন্ন। আসলে দোষ কারও নয়। দোষ হয় পরিবর্তন গ্রহণের জাগতিক অনীহ-মানসিকতার, না হয় আমাদের পরিবেশের, না হয় অদৃষ্টের অথবা সম্মিলিত সবার। এই দোষের অভিশাপ মোচনের দায়িত্ব আমাদেরই।

ট্রেনিংয়ের মূল্যায়ন

ট্রেনিংকে আমাদের দেশে কথায় এবং কিতাবে **মহা কাজ,** কিন্তু বাস্তবে এবং মূল্যায়নে **অকাজ** ভাবা হয়। তাই তো আমরা ট্রেনিং দিতে চাই না, নিতেও না। অবশ্য বিদেশি ট্রেনিং হলে লাফ দিয়ে পড়ি, অনেক সময় জুনিয়রদের বঞ্চিত করে। তবে কখনও কখনও ট্রেনিংয়ের জন্য লোক পাঠানোর চাপ এড়াতে না পেরে অথবা ট্রেনিংয়ের সঙ্গে অসহযোগিতার অভিযোগ এড়াতে অপেক্ষাকৃত অনীহ এবং অনুপযোগী লোকদের নাম বার বার পাঠাই। কিন্তু ট্রেনিংয়ের দিন তাকে ছাড়ি না। অবার কখনও কখনও ওই লোককে বাদ দিয়ে অন্য লোককে পাঠাই এই যুক্তিতে যে, তাকে ছাড়লে ব্যাংক অচল হয়ে যাবে। আবার ওই কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটি না দিয়েও পারি না। তখন ব্যাংকের অচল অবস্থা ম্যানেজ করতে পারি কিন্তু ট্রেনিং-ভ্যাকান্সির সময় নয়। এটা একবার ভেবে দেখা দরকার। ট্রেনিং কি এতই কম গুরুত্বপূর্ণ?

অপরদিকে, প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত-অফিসারদের মধ্য থেকে কাউকে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পোস্টিং দিতে গেলে (ফ্যাকাল্টি বা সেক্রেটারিয়াল অবস্থানে) তাদের পক্ষ থেকে চাকরি ছাড়ার হুমকি আসে। এসব ঘটনাই ট্রেনিংকে অবজ্ঞা করার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি কী দাঁড়াচ্ছে? পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে অধিক সংখ্যক জনবলকে কর্মশক্তিতে পরিণত করে ব্যাংকে নিরাপত্তা

বলয় (Defense Line) সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। ফলে মাঠ পর্যায়ে অফিসারদের একই ডেস্কে দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রেখে তাদেরকে অপরিহার্য (Indispensible) হিসেবে গড়ে উঠতে সুযোগ দেয়া হচ্ছে যা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। ওই Indispensible অফিসাররা ভেতরে ভেতরে দুঃসাহসী হয়ে উঠছে এবং তাদের সেই দুঃসাহসই তাদেরকে লোভী বানিয়ে ব্যাংককে জিম্মি করে ফেলছে। এ কারণেই তাদের দ্বারা ব্যাংকে জাল-জালিয়াতি সংঘটিত হচ্ছে। এটা একটা অশুভ চক্রবন্ধী প্রক্রিয়া। একে যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা না গেলে ব্যাংকিং সেক্টরের বিপদ দিন দিন বাড়বে, সন্দেহ নেই। যাহোক, উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে ট্রেনিংয়ের পর ওইসব অফিসারকে Post-Training-Utilization এবং Job-Rotation-এর মাধ্যমে পাকাপোক্ত করে, ভালো কর্মী হিসেবে তৈরি করতে না পারলে এবং তাদেরকে স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার অঙ্গনে ঘন ঘন বদলির ব্যবস্থা (Right Man in the Right Place) না করলে ব্যাংকের এই আবহ-ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা কাটবে না। বরং তাতে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর দায়-দায়িত্ব ব্যাংকাররা এড়াতে পারবেন না।

হলমার্ক, ডেসটিনির মতো দুর্ঘটনা ঘটবে এবং তাতে শুধু ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি নয়, মূল্যবান ভাবমূর্তির সমূহ ক্ষতি হবে এবং ব্যাংকারদের মর্যাদাহানি হবে। সুতরাং, বর্তমান প্রজন্মের জন্য সব ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, ব্যাংকের এই ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার গতিকে শক্ত হাতে প্রতিহত এবং প্রতিরোধ করা। প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগকেই এই গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। যে ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগ যত বেশি করিতকর্মা এবং দক্ষ হবে সেই ব্যাংক তত ভালো করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, Manpower-এর Efficiency এবং তাদের Involvement-এ ঘাটতি একটা বড় এবং মারাত্মক সমস্যা, যাকে System Loss বলা যায়। তাই এটাকে প্রতিরোধ করতেই হবে।

যাহোক, Indispensibility বা একক কোনো অফিসারের কোনো কাজের অপরিহার্যতা ভাঙার প্রয়োজনে, কথিত Defense Line (প্রতিরক্ষা বলয়) সৃষ্টির কাজ করতে কঠোর হতে গেলে চাকরি হারাতে হবে এমন অহেতুক ভয় পাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। কারণ, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী **ব্যাংকার ছাড়া কেউ ব্যাংকের এমডি হবে না,** এটা যেমন ঠিক; আবার **প্রফেশনাল ব্যাংকার ছাড়া ব্যাংক রক্ষা পাবে না,** এটাও তেমনি ঠিক। এছাড়াও মনে রাখতে হবে, ব্যাংকের মালিকরা ব্যাংক খুলেছেন তা বন্ধ করতে নয়, বরং টিকিয়ে রাখতে এবং তাকে উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে। এ কারণেই ব্যাংকারদের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে। তাই ব্যাংকের প্রশাসনিক কর্ণধাররা দক্ষ ও শক্ত হলে তাদের চাকরি পোক্ত হবে, ব্যাংকের অবস্থানও মজবুত হবে। নবীন ব্যাংকাররা নিজেদের চরিত্রকে সুগঠিত করার মাধ্যমে ব্যাংককে ঝুঁকিমুক্ত করে এগিয়ে নিতে পারবে

তার ফলে এখনকার শীর্ষ ব্যাংকারদের আত্মজীবনী, তাদের অনুজদের কাছে আমাদের অর্থাৎ আলোচিত প্রবীণ এমডিদের আত্মজীবনীর মতো বিতর্কিত হবে না, বরং আকর্ষণীয় হয়ে ওই সময়ের প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে আগ্রহ ভরে তা পড়তে এবং সেইসব আত্মজীবনীর নায়কদের আদর্শ হিসেবে মানতে। তাই ব্যাংকারদের প্রফেশনাল হতে হবে, সচেতন হতে হবে, অধিক ত্যাগী এবং প্রত্যয়ী হতে হবে।

অপর্যাপ্ত হলেও ট্রেনিং Value Add করছে, তা বোঝা যায়, ব্যাংকের অফিসারদের উন্নততর গেট-আপ দেখে এবং মাঠ পর্যায়ের ক্রমবর্ধমান সমস্যা সংবলিত কাজের ওপর অডিট আপত্তির নিম্নমুখী সংখ্যা দেখে।

লেখা এখানেই শেষ করব ভেবেছিলাম। হঠাৎ মনে হয়ে গেল, এই লেখায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গেছে। যার একটা হচ্ছে, রূপালী ব্যাংকে আমার কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের কিছুটা হলেও আলোকপাত করা; এবং অপরটি হচ্ছে, আমার পরিবার পরিচিতির আভাস টানা। কিন্তু আগেই বলেছি, লেখার জন্য আমাকে বেঁধে দেয়া পরিধির গণ্ডি ইতোমধ্যেই পার হয়ে গেছে। তবুও এখানে চুপ হয়ে গেলে আত্মজীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ভেবে সংক্ষেপে হলেও তা বলতেই হচ্ছে। আশা করি, পাঠকরা ধৈর্য হারাবেন না, অনুগ্রহ করে।

বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা

রূপালী ব্যাংকের সূত্রে এই লেখার সূচনা বলেই বলি, সেখানে আমার কর্মকালে, অর্থাৎ ০১.০১.০১ থেকে ১১.১২.০১ পর্যন্ত সময়ে, অনেকগুলোর মধ্যে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার যথার্থতা প্রমাণের সহায়ক হিসেবে, অন্য একাধিক ব্যাংকের অনুরূপ অভিজ্ঞতার কিছুটা আলোকপাত এখানে করা দরকার।

রাষ্ট্রায়াত্ত এবং বিশেষায়িত ছয়টি ব্যাংকে কাজের অভিজ্ঞতায় কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও একটি অভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিল এই যে, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং শক্ত নৈতিকতার সামনে কোনো সমস্যাই অনড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। সর্বজনস্বীকৃতভাবে সব ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানেই বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন এবং তা হচ্ছে, ব্যাংকের ভালো করা। উভয়ের লক্ষ্য এক হলে এবং সেই অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা সম্মিলিতভাবে একনিষ্ঠ হলে তা অর্জিত হতে বাধ্য। যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও গলদ আছে।

আসলে গলদ কোথায় তা এই মর্মবাণীই বলে দেয়। যেমন, **ডাকার মতো ডাকলে পরে কেন দেখা দিবে না, খোদা তোমায় ডাকতে জানি না**। অর্থাৎ,

আমরা একনিষ্ঠ হতে পারি না। কথায় ও কাজে মিল রাখতে পারি না। বলি একটা করি অন্যটা। 3D (মানে Disharmony in Deed & Dialogue)-এর প্রকোপ রোধ করতে পারি না। কাজে গভীর মগ্নতা, একাত্মতা এবং নিরপেক্ষতা না থাকলে এমন হয়, যা লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, হচ্ছেও তাই।

এই মতবাদের সমর্থনে বলতে হয়, আমি এমডি হিসেবে কাজ করা প্রায় সব ক'টি ব্যাংকেই বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কখনও কখনও কিছু না কিছু বিষয়ে মতানৈক্য লক্ষ্য করেছি। তবে ওইসব মতানৈক্য তৎকালীন নীতিমালার আওতায় নিরপেক্ষ যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়ে বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করার পর তা নিরসন হয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসা যাক এবার রূপালী ব্যাংকের প্রসঙ্গে। সেখানে পা দিয়েই দেখলাম ব্যাংকের A-D RATIO অর্থাৎ Advance-Deposit Ratio, বেশ Adverse হয়ে আছে। কলমানি নিয়ে এবং REPO বা Reverse REPO করেও সামলানো যাচ্ছে না। ফলে SLR ঘাটতিতে ভুগে ব্যাংককে কখনও কখনও জরিমানা গুনতে হচ্ছে। অথচ বড় বড় ঋণ অনুমোদনের প্রবল ঢেউ ব্যাংকের কূলে এসে অবিরাম ধাক্কা মেরে ভেঙে দিচ্ছে তার পাড়। নির্মম নদী শিকস্তির মতো। আমার মৌখিক বাধার বোল্ডার নির্বিকারে তলিয়ে যাচ্ছে ওই ঢেউয়ে। স্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে রোধ করতে পারছে না সেই ভাঙন। এমডির দায়িত্ব এবং কর্তব্য উপলব্ধি করে তখন বোর্ডে একটা মেমো নিলাম। মেমোর মধ্যে কথিত Mismatch-এর Impact & Consequence পরিষ্কার করে তুলে ধরলাম। বোর্ডকে এও জানানো হলো যে, ব্যাংকে তারল্য ঘাটতির কারণে অনুমোদনপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতারা QUEUE দিয়ে অপেক্ষায় থেকে ডিপোজিট সংগ্রহের মাধ্যমে ফান্ড জমা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কখনও কখনও সিরিয়াল ভেঙে, অপর্যাপ্ত হলেও কিছু ড্রয়িং নিয়ে বর্তে যাচ্ছে। ফলে অনুমোদিত ঋণসীমার আওতায় নির্ধারিত পর্যাপ্ত ফান্ড সময়মতো না পাওয়ার কারণে তাদের প্রজেক্ট ফেল করে, ওইসব ঋণ অনড়-বোঝার চাপ হয়ে ব্যাংকের ঘাড়ে চেপে বসার হুমকি দিচ্ছে। এতে ফান্ড সাইফুন হওয়ারও সুযোগ বাড়ছে। কথিত বোর্ড মেমোতে নতুন ঋণ দেওয়া যাবে না এমন কথা বলা ছিল না। শুধু তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির ওপর যৌক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরে অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য বোর্ডের সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল মাত্র।

দেখলাম, আমার ওই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বিচক্ষণ বোর্ডের তীক্ষ্ণ উপলব্ধিকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। বোর্ড-মেমোটি অনুমোদিত হল। এতে অনুপ্রাণিত হলাম। বোর্ডের প্রতি আমার শ্রদ্ধাও বেড়ে গেল অনেক।

কৌশলগত ভূমিকা

এরপর একদিকে বিশেষ **ডিপোজিট ক্যাম্পেইন** করে এবং অপরদিকে **রিকভারি ড্রাইভ** দিয়ে ফান্ড সংগ্রহের ফলে কথিত বেসামাল অবস্থার কালো মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল রূপালীর তিমিরাচ্ছন্ন আকাশ থেকে। অতঃপর জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়োজনে Proportionate Distribution of Resources in the Society-এর অগ্রাধিকারকে মাথায় রেখে **কর্পোরেট** এবং **রিটেইল ব্যাংকিংয়ের** ওপর **পৃথক সময়োপযোগী বাজেটসহ বিজনেস প্ল্যানের** আওতায় **নিয়ন্ত্রিত ইনভেস্টমেন্ট** করার জন্য **অ্যাকশন প্লান** তৈরি করা হলো। এটা সবাই লুফে নিল। যেমনটি নিয়েছিল আমার অনুরূপ একটি প্ল্যান, শিল্প ব্যাংকের বিচক্ষণ অফিসাররা। লুফে নেয়ার কারণ হিসেবে দ্বিধাহীনভাবে বলতে হয়, রূপালী ব্যাংকের তৎকালীন জনবলের অধিকাংশই ছিল বেশ অভিজ্ঞ এবং করিতকর্মা। বোর্ডও ছিল তথৈবচ। তারা বুঝেছিল, ওই প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে পারলে ব্যাংকের তৎকালীন সংকটের উত্তরণ ঘটবে। তাই অধিক কাজ করার গর্বিত অনুপ্রেরণা, সবাইকে উদ্বেলিত করল। কিন্তু বিধি বাম হলো। ঠিক ওই সময় সরকার আমাকে ওখান থেকে উঠিয়ে বৃহত্তম দায়িত্বে দিল সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসেবে। আমি চলে গেলাম। আমার সেই প্ল্যান আর এগোল কি-না, কাজের চাপে, সেখান থেকে পরে আর তার খোঁজ নিতে পারিনি। এগোলে হয়তো পরবর্তীতে সৌদি প্রিন্সের কাছে ওই ব্যাংক বিক্রি করার খবর পত্রিকায় দেখা যেত না। যাহোক, রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের 'পাঠকের মৃত্যু'র মতো দশা হলো আমার। এমডি হিসেবে এমন অতৃপ্তির স্বাদ আমি পেয়েছিলাম আরও দু'একবার। জীবনের ওই সব অমর কাহিনী এখন নির্বাক উপহার হয়ে শোভা দিচ্ছে আমার মনের শো-কেইসে। কারণ, মর্মবাণী বলে, **Past is past but never dead.**

ওই ঘটনা কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা দেয়, **চাকরিতে প্রফেশনালিজম, চরিত্রে দৃঢ়তা** এবং **বিবেচনায় অনমনীয় নিরপেক্ষতা** থাকলে তা সব সময়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান দিতে সমর্থ হতে পারে। আমিও তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তবে এটা সহজ কাজ নয়। অনেক ত্যাগ, কষ্ট এবং ধৈর্যের কাট-খড় পোড়াতে হয় সেখানে।

এবার আপনাদের নিয়ে যাই অপর একটি দৃশ্যপটে অর্থাৎ আমার পরিবার অঙ্গনে।

পরিবার বৃত্তান্ত

সংক্ষেপে বলতে হয়, আমার **স্ত্রী** ৪৩ বছর ধরে আমার সঙ্গেই আছেন। জীবনানন্দ দাসের কবিতার নয়, তিনি আমার 'বনলতা সেন'। নাটোরের একটি বিলুপ্ত জমিদারির একচ্ছত্র অধিপতি, বনেদি খান চৌধুরী পরিবারের এক নির্লোভ, নিরহংকার দুহিতা তিনি। আমার সংসার-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বা হোম মিনিস্টার। তাকে পর্যাপ্ত ডেলিগেশন অব পাওয়ার দেয়া আছে তার State ম্যানেজ করার জন্য। আমাদের সংসারের বার্ষিক বাজেট আমরা আলোচনা করে করি। তাতে সবাইর মৌলিক চাহিদা পর্যাপ্ত প্রাধান্য পায়। বাজেটের আওতায় খরচ মেটানোর জন্য মাসিক প্রয়োজনীয় ফান্ডের নিয়মিত জোগান যায়, ফেডারেল অর্থাৎ একমাত্র আমার আয়ের সংস্থান থেকেই। এডিপির মতো খরচ-ভিত্তিক ডেফিসিট বাজেট করি না কখনও। **থাকলে খাই, না থাকলে নাই** থিওরি মেনে চলি। আমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই, তেমন বিতণ্ডাও হয় না কখনও।

আমাদের **সন্তান দুটি**। একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে। **ছেলে** আমেরিকার স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন এবং এমবিএ করে বর্তমানে আমেরিকার BIG-4-এর KPMG-এর নিউইয়র্কস্থ ম্যানহাটন অফিসে কর্মরত। এর আগে সে কাজ করত একই শহরে অপর একটি BIG-4 কোম্পানি অর্থাৎ PWC-তে। সেখান থেকে USA-এর Goldman Sacks-এর মতো Giant Client-এর কাজও করেছে সে। তার কাজ বড় চ্যালেঞ্জিং। ওইসব কোম্পানিতে সব অফিসারকেই Councelling-এর মাধ্যমে Client সংগ্রহ করে একটার পর একটা নতুন কাজের জোগানের ধারাবাহিকতা সচল রাখতে হয়। যাকে ব্যাংকে Development Work বলে। সব কাজে Cost-Effective Benefit করিয়ে দিয়ে প্রত্যেক গ্রাহককে খুশি রাখতে হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে চাকরি টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে যায়। অর্থাৎ তার চাকরিটা Client বা ব্যবসা Base. এ কারণেই তার কাজ দিনে প্রায় ২৪ ঘণ্টার। মোবাইল বা ই-মেইলে, অন-কলে থাকতে হয় সারাক্ষণ। বিরাম নেয়ারও ফুরসত নেই। দূরবর্তী অন্য কোনো স্টেটে কাজ পেলে তাকে দেড় ও আড়াই বছরের দুটি মায়াবী শিশু মেয়েকে নিষ্ঠুরভাবে স্ত্রীর কাছে ফেলে রেখে সপ্তাহের ছয় দিনই থাকতে হয় সেখানে গিয়ে। তাই সন্তানদের দেখাশোনা করার জন্য তার স্ত্রীকে আমেরিকারই অপর একটি বড় মার্কেটিং কোম্পানির বেশ ভালো চাকরি ছাড়তে হয়েছে। Big Four-সহ আমেরিকার কোম্পানিগুলো তাদের কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় চুলচেরা হিসাব করে। তারা নিয়মিত পর্যালোচনা করে, কোন কোন অফিসার দৈনিক গ্রাহকের কাজ করে সেখান থেকে ঘণ্টা হিসাবে বিল করে বেতন নিচ্ছে আর কোন অফিসার প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন নিচ্ছে। এভাবে একনাগাড়ে বড়জোর একবছর যারা প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন নেয় অর্থাৎ নতুন কাজ জোগাড়

করে আনতে পারে না, কোম্পানি তাদেরকে সব পাওনা মিটিয়ে দিয়ে কয়েক দিনের নোটিশে গুড বাই বলে দেয়। তারপর আর কোনো ওজর-আপত্তি চলে না।

ওই তুলনায়, আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে, স্বদেশে সৌভাগ্যবান আমরা, এখনও অনেক ভালো আছি, বলা যায় জামাই আদরে। তবে এ ভালো ভালো নয়। কারণ ইদানীং জামাই হিসেবে ব্যাংকারদের চাহিদা এবং কদর কমে গেছে, ব্যাংকিং সমাজের কতিপয় দুর্মুখ লোকের দুষ্কর্মের মুখোশ জাতীয় প্রচারমাধ্যমে ফলাও হয়ে বার বার খুলে যাওয়ার কারণে গোটা ব্যাংকিং সমাজের ইজ্জত আজ ধুলায় মিশে গেছে। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। শুভবুদ্ধির উদয় হোক আমাদের মধ্যে। আসুন, কাজে পোক্ত হই, পর্যাপ্ত ঘাম দিয়ে কাজ করে পরিমিত দাম নেই। ফাঁকির বাজিমাত না করি।

মেয়েটি, ঢাকাস্থ উত্তরার স্কলাস্টিকা থেকে এ লেভেল এবং বসুন্ধরার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনোমিকস এবং বিজনেস ফাইন্যান্স বিষয়ে অনার্স করে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে এ বছরই (২০১২ সাল) এমএস শেষ করেছে।

আমরা বুড়োবুড়ি, মেয়েকে নিয়ে এখন তিনজন ঢাকায়। আত্মীয়-স্বজনসহ ধানমণ্ডি এলাকায় একটি কেনা অ্যাপার্টমেন্টে থাকছি। এখন আর আগের মতো দৈনিক ফ্রেশ কাপড় পরতে পারি না। খরচ সাশ্রয়ের জন্য স্যুট পরার স্টাইলে এক কাপড় দিন ভাড়িয়ে পরতে হয় কখনও কখনও। কারণ লন্ড্রি খরচাও অনেক বেড়ে গেছে আজকাল। খাওয়ার ব্যাপারে বাধ্য হয়ে সচেতন থাকি, তবে ডায়েটিং করি না। যা খেলে অসুবিধা হয় তা এড়িয়ে চলি। ওই যে কথায় বলে না, Patient is the best Doctor for himself। এভাবে চলার কারণেই হয়তো সুস্থ থাকছি।

তেমন অসুখ-বিসুখ আমাদের নেই। তবে দু'জনকেই প্রেশারের ওষুধ খেতে হয়। কাজের ঝামেলায় আমার হাঁটা হয় না। তবে নিয়মিত যোগ-ব্যায়াম করি। বর্তমান কাজে নিজেকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সপ্তাহে ছয় দিন ব্যস্ত রাখি। বিছানায় গেলেই ঘুমিয়ে পড়ি। দিন-জামানার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে-সম্পত্তি বাড়ালে অশান্তি বাড়ত। তাই তা বাড়ানোর দিকে মন না দিয়ে মন্দ করিনি। কেননা, প্রবাদ বলে, **যত সম্পত্তি তত বিপত্তি।** যেটুকু আছে তা নিয়ে অহংকার করি না। কারণ আমি মানি, দুনিয়ার কোনো জিনিসই আমার নয়। এমনকি অহরহ যা ব্যবহার করছি তাও না, বাড়িটিও নয়। সবকিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র। সময় হলেই যে কোনো অসুখ-বিসুখ বা দুর্ঘটনার ওছিলায় তার সব জিনিস, দুনিয়াতে অর্থাৎ তারই বাড়িতে রেখে হঠাৎ প্রস্থান করতে হবে; কোনো মাফ নেই। তাই তো অহংকারকে অলংকার ভাবিনি কখনও, একটি দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে যে, Pride is tolerable but arrogance not. So, one should have the Pride of

Craft & not the Craft for Pride. বাড়তি সম্পদের বিড়ম্বনা-মুক্ত আমি। মনে হয়, শেষ বিদায়ের সময় এই দুনিয়া, যৎ-কিঞ্চিৎ সম্পদ এবং পার্থিব সুখের মোহ ছেড়ে যেতে কষ্ট পাব না। সন্তানদেরকে শিক্ষা-সম্পদ দিয়ে বিত্তশালী করার চেষ্টা করেছি। বাকিটা তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং অদৃষ্ট।

এখন মোটামুটি দিন চলে যাচ্ছে **অভাব অসীম, সম্পদ সীমিত** অর্থনীতির এই চিরন্তন সূত্রের ব্যত্যয় ঘটিয়ে। জিন্দা-লাশ হয়ে প্রায় সবই ছেড়ে চলছি। টেনশনও ছেড়ে চলতে চাই। কারণ, জানি, Tension or worrries achieve nothing, but despair & distress.

প্রতিবেশী জিন্দা-লাশ

এসব কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার ছেলেবেলার গ্রামে পাশের বাড়ির এক অশীতিপর জরাগ্রস্ত অসহায় বৃদ্ধের নিয়ত করুণ কাতরানির কথা। ওই বৃদ্ধ বাবা-মা কষ্ট করে যে একমাত্র সন্তানকে বড় করেছেন, সেই সন্তান বাবার সম্পত্তি হস্তগত করে উপার্জনক্ষম হওয়ার পর বেপরোয়া উদাসীনতায় এবং দুর্নীতিতে গা ভাসিয়ে জীবন উপভোগ করছে। বাবাকে জিন্দা-লাশ বানিয়ে (মা আগেই মারা গেছেন) তাদের প্রিয় ঘরটি দখল করে তাকে বারান্দায় পার করে দিয়েছে। ওই ঘরটির সঙ্গে বাবা-মায়ের জীবন-যৌবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি যে জড়িত, সে খেয়াল ওই নির্দয় ছেলে করেনি একবারও। শুধু তা-ই নয়, শীতের সময় বাবার শীতবস্ত্র নেই, গরমের সময় ফ্যানের ব্যবস্থা আছে কি-না, সেদিকে ছেলের কোনো খেয়াল নেই। অথচ ছেলে বাবার কাছ থেকে দখল করে নেয়া সেই ঘরে আরামে ঘুমাচ্ছে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে। এদিকে কষ্ট সইতে সইতে জরাগ্রস্ত অসহায় বৃদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তিলে তিলে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। শুনেছি সেই বৃদ্ধের ওই ছেলেও পরে তার শেষ-জীবনে, একইভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তার ছেলের কাছে। সৃষ্টিকর্তার কি অমোঘ বিচার। এসব চিন্তার এলোমেলো ঢেউ এবং ঝাপটা বাতাসে আমার সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। ভয় হলো, যদি এমন হয় আমাদের জীবনে, তাহলে কী হবে? উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে Social Security-এর Protection আছে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একটু বেশি। এদেশে তো তা নেই। এ কারণেই হয়তো, আমার জীবন সঙ্গিনী প্রায়ই বলে থাকেন, না হয় শেষমেশ আমরা বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাব। কিন্তু রেফারেন্স না থাকলে তো সেখানেও চান্স পাওয়া যাবে না।

অন্তিম আকুতি

এবার যাওয়া যাক উপসংহারে। জিন্দা-লাশের এই মন্দা কাহিনী পাঠকদের কেমন লেগেছে, তা আমি জানি না। তবে বলতেই হয়, ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারাকে নিরাপদ এবং সময়োপযোগী করে সুষ্ঠুভাবে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে, এর ক্রমাবনত ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার বিপরীতে, জরুরি অত্যাবশ্যক প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের সপক্ষে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা এবং পরামর্শগুলো বিনয়ের সঙ্গে এই লেখার মাধ্যমে বয়ান করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আমার বিশ্বাস, **উপযুক্ত সরকারি সমর্থন এবং পর্যাপ্ত সহযোগিতা সঠিকভাবে পাওয়া গেলে** আমাদের দেশে এখনও অনেক অভিজ্ঞ এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যাংকার আছেন, যারা ন্যূনতম খরচে ব্যাংকিং সেক্টরের চলমান গতির মোড় ঘুরিয়ে তা সহজতর অথচ নিরাপদ করতে পারঙ্গম এবং তাতে নিঃসন্দেহে দেশের অতি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হতে পারে। এবং ব্যাংকিং সেক্টরও ওইসব দেশি বিশেষজ্ঞ-ব্যাংকারদের সঠিক চিকিৎসায় রোগমুক্তি পেয়ে দুর্বলতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে ভর করে।

আমরা সবাই জানি, একটি দেশের অর্থনীতি ঠিক থাকলে সব ঠিক। তাই যে কোনো মূল্যে, সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে হলেও, ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে অমিত সম্ভাবনার প্রিয় বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল এবং মতনির্বিশেষে সবাইকে– অর্থাৎ ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, এমনকি আপামর জনসাধারণ এবং সরকারকে, মনের সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে, একাত্ম হয়ে অনুশীলন করে দেখিয়ে দিতে হবে, আন্তরিকতা থাকলে সবকিছু করা সম্ভব এবং তা করতে বিখ্যাত কবি লর্ড টেনিসনের আমলের মতো Obey My Order নয়, বরং এখন 'Follow Me' Theory প্রয়োগ করতে হবে। বস্ ম্যানেজার হয়ে শুধু ঝাড়ি না মেরে লিডার ম্যানেজার হয়ে সবকিছু হাতেনাতে করে দেখিয়ে সবাই মিলে শতদল হয়ে ফুটে উঠব। তবেই ব্যাংকিং সমাজ বাঁচবে, দেশও বাঁচবে সবলভাবে।

মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার কাছে দুনিয়ার সব সমস্যা হার মানতে বাধ্য। তাই আমাদেরকে সাহসী মনোবল নিয়ে এগোতে হবে সমস্যার সুদীপ্ত শিখাকে যে কোনোভাবে নেভাতে, এবং আমরা তা করবই– এই হোক আমাদের আজকের শপথ। জিন্দা-লাশ হিসেবে এটাই আমার অন্তিম আকুতি।

এই লেখা কাউকে ছোট করা বা হেয় করার জন্য নয়। এর কোনো অংশ কারও জীবনের সঙ্গে মিলে গেলে বা কাউকে আঘাত করলে লেখক দায়ী নয়। ভুলত্রুটির জন্য দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদেরকে অর্থাৎ বুড়োবুড়িকে দোয়া করবেন। যাতে সুস্থ শরীরে দু'জন একসঙ্গে হুট করে আপন নিবাসের ট্রেনে চাপার জন্য **প্যাক-আপ** করতে পারি, কাউকে কষ্ট না দিয়ে, কারও গলগ্রহ না হয়ে।

মতামত বা পরামর্শ জানালে অনুপ্রাণিত হব।

Cell : +88- 017-1304-4844

E-mail: rabiulhussain45@ gmail.com

লেখক পরিচিতি

আপাতদৃষ্টিতে, 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়ার মতো মনে হলেও লেখক সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, লেখক হওয়ার Criteria তিনি পূরণ করেন কিনা। এই বইয়ের প্রাক-কথনে অকপটে বলা হয়েছে, তিনি লেখক নন। তাহলে কী হিসেবে তাকে পাঠক কূলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব? যদি তিনি লেখক না হন, তাহলে কীভাবে এই বই লিখলেন? তবে কি বাংলা গানের কিংবদন্তি কিশোর কুমারের একটি স্মরণীয় গানের কলির মতো হয়েছে?,

'অনেক দেখা ও শোনা ঘটনা,

কী করে বই হলো জানি না।'

আসলে অবাক হওয়ারই কথা। কারণ, যারাই বইটির কিছু অংশ পড়ছেন বা শুনছেন তারাই ভালো বলছেন। ব্যাপারটা কী? এমন তো নয় যে, মুখের সামনে খারাপ বলা যায় না, তাই তারা ভালো বলছেন। ঐসব সুইং বা ভাসমান মতামত অনুযায়ী লেখা যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে এমন লেখা কী করে সম্ভব হলো তার পক্ষে? তিনি তো আগে কখনও লিখেছেন বলে শুনিনি বা দেখিনি। তাই পাঠককূল, এই লেখার আলোকে কীভাবে তাকে নেবেন জানি না।

অনেকেই জানেন তিনি আজীবন কাজ করেছেন ব্যাংকে। তাহলে কী তাকে ব্যাংকার বলা হবে? আভিধানিক অর্থে ব্যাংকার মানে, ব্যবসায়ী বা মহাজন। ব্যাংক-ব্যবসার প্রকৃত মালিক তো ব্যাংকের উদ্যোক্তারা। তাহলে কি তারাই ব্যাংকার? তবে মানুষ যে আবার যারা ব্যাংকে চাকরি করে তাদেরকে ব্যাংকার বলে?

সত্যিকার অর্থে হয়তো ব্যাংক-প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করে কাজ করলে নিজেকে ব্যাংকার হিসেবে ভাবা যায়। কারণ সবাই স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভেবে, নিবিষ্ট মনে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি কম হয়ে লাভ বেশি হবে এবং সেই লাভের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছেই যাবে। তা-ই প্রতিষ্ঠানকে মনেপ্রাণে, নিজের ভাবতে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু নিজের টাকা অন্যকে ধার দিতে এবং নিজের জন্য জমি বা ফ্ল্যাট/বাড়ি কিনতে আমরা যতটুকু সতর্ক বা সাবধান হই, ব্যাংকের চাকরিতে ততটুকু হলেই ব্যাংকে অনড় ঋণের চাপ সীমার বাইরে যাবে না এবং

Malpractice-ও কমে যাবে। কারণ নিজের ক্ষতি সহজে কেউ করতে চায় না। যাহোক, লেখক বা ব্যাংকার যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তাতে অলোচিত ব্যক্তির কোনো অসুবিধা নেই। কারণ নাম তো শনাক্তকরণের চিহ্ন মাত্র। কাউকে নির্দিষ্ট করে খুঁজে বের করতে নাম লাগে; তাকে প্রকৃতভাবে চিনতে ও জানতে নয়। নাম দিয়ে মানুষের ভালো-মন্দ বিচার হয় না, হয় তার কাজ দিয়ে। তাই দোয়া করবেন এই মানুষটাকে যাতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ন্যায় পথে থেকে সঠিক কাজ করে যেতে পারেন।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, **জীবন ও মানুষ, ব্যাংক ও ব্যাংকিং** নামের এই বইটিতে তিনি অর্থাৎ এই **লেখক-ব্যাংকার** 'জীবনের সঙ্গে মানুষের' এবং 'মানুষের সঙ্গে কাজের' ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন। শুধু ভাষার চমৎকারিত্ব দিয়েই নয়, ভাবের গভীরতা দিয়ে এবং সঠিক শব্দের জাদুকরি প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি অনেক মেসেজ দিয়েছেন, এই বইয়ের মধ্যে যা সমাজের উপকারে আসতে পারে।

এই বইয়ের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ 'জিন্দা-লাশের আত্মকাহিনী' নামক Episode-এ একটি মানব জীবন এবং তার কর্মধারার নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া আছে, যা লেখক পরিচিতির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে পারে। তাই এখানে আর তার পুনঃ অবতারণা করা হল না। মাফ করবেন, এই আসল কথাটা বলতে আপনাদের প্রতীক্ষাকে কষ্ট দিয়ে এতদূর টেনে আনার জন্য।

মূল বইয়ের ইনার- ফ্ল্যাপে লেখক প্রসঙ্গ

জীবন ও মানুষ, ব্যাংক ও ব্যাংকিং গ্রন্থের রচয়িতা জনাব রবিউল হোসেন একজন আজীবন সংগ্রামী ব্যাংকার। Sense of Belonging নিয়ে কাজ শেখার এবং করার প্রতিজ্ঞায় অবিচল থেকে মনে প্রাণে কাজ করে তিনি ব্যাংকিং কার্যক্রমের উপর বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে এ অঙ্গনে সুপরিচিতি লাভ করেন। এ অভিজ্ঞতা অনুজদেরকে শেখানোর জন্য উদগ্র উদ্যম নিয়ে তিনি বর্তমানে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে চলেছেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল হিসেবে।

কাজকে সারাজীবন তিনি নিয়েছেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংমিশ্রন ঘটিয়ে স্বদেশের প্রশিক্ষণের সনাতন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে এ ব্যাংকের সর্বস্তরের ট্রেনিংকে সময়োপযোগী করে অবিচলভাবে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন নতুন ধারায়।

এ বইয়ের প্রণেতা রবিউল হোসেন ১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই চুয়ডাংগা জেলার দামুড়হুদা থানাধীন হোগলডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মে দেড় বছর বয়সে এতিম হয়ে মজলিশপুর গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়ে ওঠেন। ১৯৫৫ সালে ঐ গ্রামের প্রাইমারী স্কুল শেষ করে ১৯৬১ সালে গোকুলখালি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক অর্থাৎ মেট্রিক পাশ করেন। এরপর ১৯৬১ হতে ১৯৬৪ পর্যন্ত সময়ে নাটোর নবাব সিরাজ উদ্ দৌলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। অবশেষে তিনি ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ম্যানেজমেন্টে মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন ইউনাইটেড ব্যাংকে চাকুরীতে যোগদান করে ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (IBB) হতে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পাশ করার সাথে সাথে IBB-র ডিপ্লোমা পরীক্ষার Foreign Exchange & Foreign Trade বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

রবিউল হোসেন এক নাগাড়ে ৫ টি ব্যাংকে ৩৬ বছর চাকরী করে সোনালী ব্যাংকের এমডি হিসেবে ২০০৪ সালের জুন মাসে অবসর গ্রহন করেন। এরপর তিনি বেশ কিছু সময়ের জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংকে কনসালট্যান্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং এখনও পর্যন্ত একই ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কর্ণধার হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর বৈবাহিক জীবন শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। তিনি দুই সন্তানের জনক। ১ম সন্তান, ছেলের জন্ম ১৯৭০ সালে। ছেলে এখন আমেরিকার BIG-4 KPMG তে কর্মরত। ২য় সন্তান মেয়েটি তার ভাইয়ের ১৬ বছর পর ১৯৮৬ সালে জন্মে O Level, Scholastica থেকে A Level, নর্থ সাউথ থেকে গ্রাজুয়েশন এবং যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টার ইউনিভার্সিটি থেকে Economics & Business Finance এ MS করে সদ্য দেশে ফিরেছে।

একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি স্মরণীয় এবং অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত রেখে এসেছেন। তাঁর সারা জীবনের কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্তমানে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অফিসারদেরকে সব দিক দিয়ে চৌকস কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার কঠিন কাজটি তিনি উপভোগ করছেন দারুনভাবে। ফলে অফিসারদের উন্নততর গেট-আপ এবং সন্তোষজনক কাষ্টমার সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত ক্রমবর্ধমান আউটপুট নিয়ে ব্যাংক বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি এই বয়সেও সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত সপ্তাহে ৬ দিন নিরলস কাজ করে চলেছেন।
তাঁর মতে মার্কেন্টাইল ব্যাংক তাঁর প্রশিক্ষিত কর্মী দিয়ে এভাবে এগুতে পারলে অচিরেই বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হবে-যা তাঁর কাছে হবে একটি পরম তৃপ্তির বিষয়।

লেখকের সারা জীবনের দেখা এবং অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে রচিত এ বইটি তাঁর কাছে বই নয়, বরং বিশ্বাস যেখানে ভাবাবেগ আদৌ স্থান পায়নি। এ বইয়ের অনুশীলন সকলকে উপকৃত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।